প্রধান লক্ষ্য করিয়া। আমরা এইক্ষণ ইংরেজের শিষ্য, সুতরাং আমরা টাকা লক্ষ্য করিয়াই বড় হইতে চাই। টাকাকেই জীবনের সার সর্ব্বস্ব মনে করি। কেন? আর কি কোন লক্ষ্য নাই? আমাদের যেমন অপ-রিমিত অর্থ বল নাই, তেমন অপর কোন বিষয়ে মনোনিবেশ পূর্ব্বক জাতীয় উন্নতি সাধনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলে হানি কি? সংসারে কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প প্রভৃতি কত২ বিষয় পরম্পরা রহিয়াছে। সে সকল আমরা চক্ষে বড় দেখি না। তন্মধ্যে যেটী অতি সহজ, সেইটী অবলম্বন করিয়া জাতীয় উন্নতি সাধনের চেষ্টা করাই বাঙ্গালির সর্ব্ব প্রধান কর্ত্তব্য। আমাদের এইক্ষণ ইহাই দৃঢ় প্রতীতি হইতেছে, যদি এই বিস্তীর্ণ ভারত-বাসীগণ সকলেই একাগ্রতা সহকারে এক মাত্র কৃষি শাস্ত্রকেই লক্ষ্য করিয়া, জাতীয় জীবন সংস্থাপন জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প হয়েন, তাহা হইলে অবশ্যই এক দিন ভারতের দুরাবস্থা বিমোচন হইবেক। এক দিনে কিছুই হইবেক না। তজ্জন্য তাহাতে নিরুৎসাহ থাকা বিধেয় নহে। যত দিনেই হউক বা যত কালেই হউক, যদি প্রত্যেক ভারতবাসী একমাত্র কৃষি প্রধান লক্ষ্য করিয়া উহার বহুল প্রচার ও সর্ব্বত্র প্রচলন করিতে পারেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ভারতের মঙ্গল সম্ভাবনা। জাতীয় উন্নতি অবনতি, জাতীয় একাগ্রতার উপর নির্ভর করে। ভারত এইক্ষণ নির্ধন, সুতরাং ব্যবসায় বাণিজ্য লক্ষ্য থাকিলে কিছু হইবে না। কাজেই কৃষি বিদ্যার ভূরি প্রচলন ব্যতীত আর উপা-য়ান্তর নাই। অনেকে একত্রিত হইয়া কোন একটী কার্য্য সংসাধনে মনো-নিবেশ করিলেই, পরস্পর সহানুভূতি জন্মে। সুতরাং অনায়াসেই জাতীয় জীবন সংস্থাপিত হওয়ার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। এবং অবশেষে ক্রমে২ জাতীয় উন্নতিরও পন্থা আবিষ্কৃত হইতে পারিবেক। তাই বলিতেছি—হে ভারত-বাসীগণ! এইক্ষণ হইতে সকলেই পর-পদ-সেবার জন্য অযথা সময় ক্ষেপণ না করিয়া একমাত্র কৃষির উন্নতি সাধন জন্য বদ্ধপরিকর হও। তাহা হইলে নির্ব্বিবাদে সুখ স্বচ্ছন্দে জীবন অতিবাহিত করিতে পারিবে।

শ্রীতারিণীচরণ সেন।
বল্লভদী গ্রামে, নীলখী পোষ্ট আফিস,
ফরিদপুর।

ক্রমশঃ।

দাসত্ববৃত্তি ধন নহে, কৃষিই ধন।

এদেশের অনেকে টাকা কড়িকেই 'ধন' বলিয়া অভিহিত করেন; টাকা কড়ি যে অর্থ বা ধন নহে, এমন কথা আমরা বলিতেছি না, কিন্তু টাকা কড়ি গৌণরূপে ধনের কার্য্য করিলেও অর্থ ব্যবহার শাস্ত্রমতে কৃষি এবং বাণিজ্যই মুখ্য ও আদি ধন। আবার যাহাকে আমরা বাণিজ্য বলি, তাহার মূল একমাত্র কৃষি। কৃষি না থাকিলে বাণিজ্যের লোপ হয়,—ধন সমাগমের পথ বন্ধ হয়। অতএব স্পষ্টতঃ কৃষিকেই "ধন" বলা যাইতে পারে। কৃষি কিরূপে ধন পদ বাচ্য হইতে পারে, আমরা তাহা দেখাইতে বাধ্য হইলাম। কিন্তু সাধারণ পাঠকের সংস্কার এই যে, কৃষি ধনই নহে, দাসত্ববৃত্তিই ধন। এই সাত শত বৎসরের দাসত্ব প্লাবিত বাঙ্গালা দেশে এ কথা শুনিয়া যিনি আশ্চর্য্য হয়েন, তিনি বাস্তবিক বাঙ্গালীর প্রকৃতি বুঝেন নাই। যাহা হউক, আমরা প্রথমে কৃষি বাণিজ্যের সহিত হীন দাসত্ব বৃত্তির দোষ গুণের সমালোচনা করিতে চাই, তাহা হইলে, কৃষিই যে ধন, পাঠককে ইহা সহজে বুঝান যাইতে পারিবে।

আমাদের দেশের শতসহস্র হতভাগ্য লোকের কঠিন মনে একটি চিরসংস্কার বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে, দাসত্ব (চাকুরী) বিনা জীবিকা নির্ব্বাহের অন্যবিধ উপায় নাই। চাকুরীর উপর—পরের গোলামির উপর, এখনও যেরূপ আমাদের প্রগাঢ় ভক্তি রহিয়াছে, তাহাতে ভবিষ্যতে কল্যাণ হইবারতো কোন উপায়ই দেখিতেছি না। জনক জননী সন্তানের বিদ্যাশিক্ষার্থ যত্ন করিয়া অনেক অর্থ ব্যয় করিতেছেন, কেননা সন্তান দাসত্ব করিয়া, পরের নিকট দেহ মন বিক্রয় করিয়া, পরের গালি খাইয়া, জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হইবেন। লোকের মুখে "দাসত্ব" ভিন্ন আর কিছুই শুনা যায় না। দাসত্ব পদ প্রাপ্ত হইলে, পিতা মাতা সন্তুষ্ট, সন্তান সন্তুষ্ট, প্রতিবাসীগণ সন্তুষ্ট, বন্ধু বান্ধব সন্তুষ্ট, প্রিয়তমা প্রণয়িণী সন্তুষ্ট, এমন কি ভারত শুদ্ধ সকল লোকই সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। দাসত্ব যেন কিছু ইন্দ্রত্ব পদ এই রূপ সাধারণের ধারনা হায়রে! এদেশের লোক উমেদারি কার্য্যে যেরূপ মজবুত, যেরূপ তৎপর এবং যেরূপ অধ্যবসায়শীল, যে কোন কার্য্য হউক না কেন, সেইরূপ মনোযোগে

সহিত সম্পাদন করিলে, তিনি অবশ্যই প্রভূত ধনের অধিকারী হইতে পারেন। উমেদার স্তাবরা যেরূপ প্রগাঢ় ভক্তির সহিত বাবুদিগের মনোরঞ্জনার্থ আয়োজন করেন, যদি তাঁহারা সেইরূপ ঈশ্বর সম্বন্ধে করিতেন। তাহা হইলে বোধ হয় স্বয়ং জগদীশ্বর প্রত্যক্ষ চাক্ষুষ দর্শন না দিয়া থাকিতে পারিতেন না। কিন্তু বাঙ্গালীর অবস্থা বাস্তবিকই এতদূর শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে যে, সেই দাসত্ব ও তাহাদের যুটিতেছে না। সমাজে পরিচয় দিবার সময় যে ব্যক্তি বলেন "আমি চাকুরী করি না," লোকে তাঁহাকে ভাবে, বুঝি ইহার বিদ্যা বুদ্ধি নাই, নতুবা সাহেব ইহাকে চাকুরী দেয় না কেন। কেহ তাহাকে "বেকার," কেহ নিষ্কর্ম্মা," কেহ "নিমুকুদে" বলিয়া বিবেচনা করেন। অতএব তাহাদের মতে স্বাধীন ভাবে সুখ সেব্য ভোগ্য ভোজনের অপেক্ষা, পাঁচ টাকা বেতনে পাটের কলের সরকার (যিনি মোট বহিয়া মাথার টাক পড়াইয়াছেন, এবং কলিকাতায় দুই বেলা অতি কষ্টে বৃহতীর অর্দ্ধভাগ মাত্র দগ্ধ করিয়া কোন প্রকারে ছলে বলে অর্দ্ধান্ন প্রাপ্ত হয়েন, অথচ দেশে "বাবু মহাশয়" বলিয়া পরিচিত) মহাশয় ও উত্তম। আমরা জানিতাম, মথুরা, বৃন্দাবন, বেণারশ, প্রভৃতি আমাদের পূর্ব্ব পুরুষদিগের তীর্থ ক্ষেত্র ছিল, কিন্তু এক্ষণকার বাবুদের পক্ষে "শ্বেতাঙ্গ কর্ম্ম ক্ষেত্রং তীর্থং"। তাহার ফল এই যে—"মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে কৈফিয়তঞ্চ সসপেণ্ডঞ্চ দিনে দিনে; ডিশনিশনঞ্চ ফাইনশ্চ ভেলঞ্চ পদে পদে।" আর এই সকল লোকের মোক্ষ সমন্ধে বলা যায় যে—"দাসত্বং দেহিমে তূর্ণং ধবলাঙ্গ মহামতে।"

যাহা হউক, আজি কালি অনেকগুলি কৃতবিদ্য যুবা যে স্বাধীন বৃত্তির রসাস্বাদনকে সুখকর বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন, ইহা পরম মঙ্গলের বিষয়। বাস্তবিক চাকরী বৃত্ত—শ্ববৃত্তি, চণ্ডালের বৃত্তি! পরের গোলাম হইয়া থাকিলে মানসিক ভাব সকল স্ফুর্ত্তি লাভ করিতে পায় না। ক্রমশঃ হৃদয় ক্ষুদ্র হয়, দৃষ্টি কম হয়; বার মাস ভীষণ কারাগার স্বরূপ আফীশে ১০টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রমের সহিত কার্য্য করিলে, শরীরের রক্ত জল হইয়া যায় —রক্ত পিত্তির ব্যারাম আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং চল্লিশ বৎসর উত্তীর্ণ না হইতে হইতেই মানব লীলা সম্বরণ করিতে হয়। কেবল তাহাই নহে, জীবিতাবস্থায় মনুষ্যত্বকে মনুষত্ব বলিয়া বোধ হয় না। সুতরাং "চাকরে ও কুকুরে সমান" যে প্রবাদ তাহা বড় মিথ্যা নহে। কিন্তু কথায় অনেকে অনেক কথা

বলিতে পারে, কার্য্যের বেলায় সকলকেই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে দেখা যায়। কোন মহোদয় আপ্লিকেশন লইয়া গ্রেহেম কোম্পানির ভবনে পরিভ্রমণ করিতেছেন; কেহ মিউনিসিপ্যালে উপস্থিত; কেহ বা, হাই কোর্টে জজের সহিত কোন্ সময় সাক্ষাৎ হইতে পারে, এই চিন্তা করিতে করিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন; কেহ বা সুপারীশ পত্রের জন্য মনুষ্যের অগম্য স্থানেও গমন করিতেছেন; কোন মহাত্মা বা কেমনে একবার লাট সাহেবের সহিত দেখা হইতে পারে এই ভাবিয়া আকুল। কেহ চাকুরীর দায়ে, যাহা মনুষ্য করিতে পারে না, তাহাও করিতেছে; কেহ বা বাবুর রক্ষিতা অভিসারিণীর সুপারীশ জন্য রৌদ্রকে রৌদ্র, জলকে জল, শিশিরকে শিশির, এমন কি পবিত্রতাকে পবিত্রতা বলিয়া ভাবিতেছে না। কেহ বা কোন চোগা গায়ে বাবু দেখিয়াই নমস্কার করেন। ভাবেন ইনি বুঝি কোন হৌশের সর্দ্দার হইবেন। কেহ বা সাহেব দেখিলেই সেলাম করিতেছেন। কেননা একবার কোন সাহেবের নজরে পড়িতে পারিলে তিনি ইহ জীবন পরমসুখে অতিবাহিত করিবেন। কেহ বা, কি রূপে এক জন মুৎসুদ্দী মহাশয়কে হস্তগত করিবেন, তাহারই তদিবির করিতেছেন। চারিদিকেই এইরূপ বিপরীত ব্যাপার দৃষ্ট হইবে; ছোট, বড়, উত্তম, মধ্যম, অধম সকলেই চাকুরীর অন্বেষণে ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতেছেন। দেখিয়া শুনিয়া বোধ হইতেছে, যেন দাসত্ব ভিন্ন, হতভাগ্য বাঙ্গালী জাতির জীবিকা নির্ব্বাহের অপর কোনও উপায় নাই।

সত্য সত্যই আমাদের দেশের লোক, চাকুরী ব্যতীত অপর কি উপায়ে যে কালাতিপাত করিতে হয়, তাহা জ্ঞাত নহেন। গোলামী পাইলে যেন করতলে সুপক্ক কদলী প্রাপ্ত হয়েন। আর এক কথা—অবোধ দেশের লোক চাকুরী করাকেই সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবের কার্য্য মনে করেন। চাকুরী ব্যতীত অপর সকল কর্ম্মই ইতরের, ছোট লোকের কার্য্য বলিয়া বঙ্গ সমাজে বিবেচিত হয়। এক জন মাসিক এক শত টাকা বেতন ভোগী চাকুরে পুরুষের যেরূপ সম্মান, মাসিক দুই শত টাকা আয়বান ব্যবসায়ীর সমাজে সেরূপ মান সম্ভ্রম নাই। পোড়া সমাজের ত এই রূপ শোচনীয় অবস্থা! কৃষক ভায়াদের দোষের মধ্যে তাঁহারা কৃপা করিয়া আমাদের পেটের অন্নের উপায় করিয়া দেন। আমরা খাই এজন্য "বাবু", আর তারা অনুগ্রহ করিয়া দেয় এজন্য

"চাসা"। ইহাতে লোক ব্যবসা বা কৃষি কার্য্য করিতে যাইবে কেন? দোকানে বসিয়া খাতা লেখা, কিম্বা তুল দাঁড়ি ধরিতে শিখা, অথবা মাঠে বসিয়া কৃষিকার্য্য দেখা, এ সকল মহাপাপ!! মহা মহা ইতরের কার্য্য!! আর তুমি দেশের লোকের গলায় ছুরি দিয়া ঘড়ির চেইন ঝুলাইয়া বেড়াও এবং প্রভুর সর্ব্বনাশ করিয়া, তাঁহাকে ফেইল্ করিয়া দিয়া চাকুরী দ্বারা গাড়ী জুড়ী করিয়া বেড়াও, সুতরাং তুমি বড় লোক!! আমি ঘরের পয়সা খরচ করিয়া লেখা পড়া শিখিয়াছি, নিজের উদ্যানে সদতার উপরে কৃষিকার্য্য বা ব্যবসা করিয়া খাই, দেশের উন্নতি করি, সুতরাং ছোট লোক! আর তোমার উদরে ছয় সহস্র বার বিনামা আঘাত করিলেও হয়ত "ক খ" বাহির হয় না, সুতরাং তুমি পণ্ডিত ও মহাশয় লোক! যাহা হউক, এরূপ অবস্থায় তোমার অমন আপীশের সুবর্ণময়ী লেখনী হইতে আমার হলদিঘাট মাঠের প্রাচীন কাষ্ঠময় মলিন লাঙ্গল ও সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ। রামায়ণ পাঠ করিয়া দেখ, প্রাচীন কালে, এই দেশে ব্রাহ্মণেও হল চালনা করিতেন। তবু তাঁহারা পতিত হয়েন নাই, ইতর লোক বলিয়া পরিগণীত হয়েন নাই। ফলতঃ, এদেশে যত দিন কৃষকবর্গ এবং ব্যবসায়ী বৃন্দ গৌরবের পাত্র না হইতেছেন, তত দিন আমাদের কোন রূপ মঙ্গল দেখিতে পাইতেছি না। শাস্ত্রে বলে,

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী,
তদর্দ্ধং কৃষি কর্ম্মণি।
তদর্দ্ধং রাজ সেবায়াং,
ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ॥

কবিবর ভারতচন্দ্র রায়, ইহার এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন—

বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস,
তাহার অর্দ্ধেক চাস,
রাজসেবা কত খচ মচ।
গৃহস্থ আছয়ে যত,
সকলেরই এই মত,
ভিক্ষা মাগা নৈবচ নৈবচ॥

কিন্তু এই সুমহৎ বাক্যের গরিমা বঙ্গবাসী আজিও বুঝিতে সক্ষম হয়েন

নাই। কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প, তাঁহাদের চক্ষের শূল ; ভিক্ষা এবং রাজসেবা করিতেই সকলে পারদর্শী।

অনেক পণ্ডিত অভিমানী দূরদর্শী মহোদয় একটা আপত্য উত্থাপন করেন—ব্যবসা করিবার মূলধন কৈ ? চাস করিবার জমি কৈ ? বঙ্গদেশে চাস করিবার ভূমি নাই যিনি বলেন, তিনি (অধিক আর কি লিখিব) নিতান্ত বালক। তবে তাঁহার বাটীর দ্বারের সন্নিকটে কৃষি কর্ম্মের উপযুক্ত জমি না থাকিতে পারে। আর তোমার যা সঙ্গতি আছে, মান সম্ভ্রম আছে, তাহা লইয়া তাহার উপরেই ব্যবসা আরম্ভ কর না কেন ? ২০, টাকা মাহিনায় কেরানি-গিরি করা অপেক্ষা ৫০, টাকা মূলধন লইয়া হাঁড়ি কলশীর দোকান করাও সহস্রগুণে শ্রেয়স্কর। কিন্তু সে প্রবৃত্তি তো নাই, ব্যবসা করা কেবল অপমানের কার্য্য বলিয়া মনে হয়। সকলের মূলধন নাই, একথা স্বীকার্য্য ; কিন্তু সহস্র সহস্র লোক মূলধন থাকা সত্বেও চাকুরীর জন্য এত লালায়িত হয় কেন ? সে দিন খপরের কাগজে পড়িলাম, তিন লক্ষ টাকা জামীন দিয়া একজন হিন্দুস্থানী কোন ব্যাংকের ৭০০, টাকা বেতনের দেওয়ানী পদ পাইয়াছেন। আর এক কথা, মূলধন কিছু গাছে ফলে না—কিম্বা ভূগর্ভ হইতে উত্থিত হয় না। সামান্য পুঁজিতে ব্যবসা কি কৃষি আরম্ভ কর : ক্রমশঃ তোমার বুদ্ধি বিবেচনার বলে তুমিও একজন "কুবের" বলিয়া অভিহিত হইতে পারিবে। এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। এই যে, সাহেব ব্যবসায়ীগণ ক্রমে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি পদ্ম পদ্ম টাকা মূলধন করিয়াছে, তাহা কোথা হইতে হইয়াছে ? পরমেশ্বর কি গোলকধাম হইতে উহাদিগকে সংগোপনে মূলধন প্রেরণ করিয়াছিলেন ? না, ইংরেজ বণিকগণ পরেশ পাথর কুড়াইয়া পাইয়াছিল ? নিজের গুণে, যত্নে, অধ্যবসায়ে সকলই হয়। সাহেবেরা যখন এদেশে আসে, তখন ভাঙ্গা ছাতা, ফাটা ছড়ি, জীর্ণ কোট্‌ লইয়া আসে। আর ফিরিয়া যাইবার সময় হয়তঃ জাহাজে টাকা রাখিতে কুলায় না। কেবল তাহাই নহে, তখন মান সম্ভ্রমে তিনি এত বড় যে, হয়তঃ ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরলকেও তুচ্ছ করেন। তাই বলি, হে বাঙ্গালী ভ্রাতৃবৃন্দ, তোমাদের পায়ে ধরি, তোমরা দাসত্বে প্রবৃত্তি পরিত্যাগ কর। সাহেবদের ন্যায় চাস বাস করিয়া না হয় ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া, শান্তিতে, সুখে নিশ্চিন্ত মনে, দুরন্ত সংসারের

আয়েৰ লাভ কর। তিলে তিলে তিলোত্তমার জন্ম; বিন্দু বিন্দু বারিতে মেঘের জন্ম; বিন্দু বিন্দু মৃত্তিকায় প্রবাল-পর্ব্বতের জন্ম; তবে কি এই ছয় লক্ষ বাঙ্গালীর বিন্দু বিন্দু উৎসাহেও দেশের কিছুই উন্নতি হইবে না? যদি বল তাহা অসম্ভব, কিন্তু ভাবিয়া দেখ, যে প্রকাণ্ড অট্টালিকা শত শত মনুষ্যকর্ত্তৃক প্রবল সাবলের আঘাতেও ভাঙ্গে না, তাহা একটি সামান্য অশ্বত্থ বৃক্ষের চারা দ্বারা শত সহস্র ভাগে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়।

পাঠক! মূল বিষয় হইতে আমি অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। ক্ষমা করিবেন। দাসত্ব বৃত্তি যে ধন নহে ইহা স্বতঃসিদ্ধ। ইহা ক্ষণস্থায়ী, ইহা পুরুষাণিক নহে, ইহার বিনিময়ে অন্য দ্রব্য আইসে না। আর এতদ্দ্বারা যে অর্থ তাহা দেহের শোণিত ক্ষয়মাত্র, অথবা সততার বিনিময়ে কিম্বা সরলতার পরিবর্ত্তে কৌটিল্য ও শঠতা মাত্র। কৃষি দ্বারা ভূমির উৎপাদিকা শক্তি-বৃদ্ধি হয়, দেশের উন্নতি হয়, নিজের উন্নতি হয়, এবং তৎকর্ত্তৃক উৎপন্ন দ্রব্য বিনিময়ে বাণিজ্য হয় এবং অর্থ উপায়ের পথ সুগম হয়। মান, সম্ভ্রম, শান্তি, সুখ সকলই কৃষি দ্বারা হইয়া থাকে, সুতরাং কৃষিই সকলের মূল। কৃষি বিদ্যা না থাকিলে দেশ উন্নত ও সভ্য হয় না এবং দেশ কখনই ধনশালী হইতে পারে না। সুতরাং দাসত্ব নহে, কৃষিই একমাত্র ধন। কৃষকের ও কৃষি বিদ্যার যাহাতে সমাদর হয়, তাহাই সকলের চেষ্টা করা উচিত। নতুবা আমাদের উন্নতি সুকঠিন, সুদূরপরাহত, অসম্ভব—অধিক কি সম্পূর্ণ অসম্ভব। ইতি।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ দত্ত।

ভারতবর্ষীয় চা।

(INDIAN TEA.)

এ দেশে ইউরোপীয় শাসন প্রচার হইবার সঙ্গে সঙ্গে, এ দেশের লোকের আচার ব্যবহার ও অনেকাংশে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। চা খাওয়ার পদ্ধতি এ দেশে পূর্ব্বে ছিল না, ইউরোপীয় পুরুষদিগের অভ্যুদয়ের সঙ্গে২ এ দেশ বাসীরাও চা খাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। চা খাওয়া মন্দ নহে, ইহাতে স্বাস্থ্যের অনেক উপকার করে। ভারতের অনেক স্থলে চার আবাদ আরম্ভ হইয়াছে।

ইংরেজেরা বলিতেছেন, চীন দেশের চা অপেক্ষা ভারতবর্ষীয় চা ভাল। চীন জাত চা, ভারতবর্ষীয় চা অপেক্ষা একটু অধিক সৌগন্ধিযুক্ত হইলেও, গুণের তুলনায় অধিক আদরণীয় নহে। তিন চামিচা (three spoonfuls) চীনের চা যাহা না করিতে পারে, দুই চামিচা ভারতীয় চা তাহা করিয়া থাকে। এক্ষণে এ দেশ হইতে প্রতিবর্ষে ৪০ লক্ষ পৌণ্ড চা বিদেশে রপ্তানী হয়। অতএব আমাদের দেশের লোকেরা চার আবাদে যদি মনোযোগী হয়েন, তাহা হইলে কৃষি বিদ্যার উন্নতি হয়, এবং এ দেশের টাকা এ দেশেই থাকে, এবং তৎসঙ্গে কৃষকেরাও ধনী হইতে পারেন।

বাঙ্গালা দেশের মধ্যে আসাম প্রদেশ, দার্জ্জিলিং এবং হিড়োর নামক স্থান গুলি চার আবাদের জন্য প্রসিদ্ধ। ইহার আবাদে প্রতি বিঘায় প্রায় সাকল্যে ২৯্ টাকা লাভ থাকে। কৃষক যদি পরিশ্রমী হয় এবং তত্ত্বাবধায়ক শৈথিল্য না রাখেন তাহা হইলে, লাভ ইহা অপেক্ষাও অধিক হইতে পারে। ভাবিয়া দেখ, একটা সামান্য টিনের বাক্সে যে সামান্য চা থাকে, বাজারে তাহারই দর ২্ টাকা, ২৷৷০ টাকা। হিসাব করিয়া দেখিলে, সে বাক্সটীর সর্ব্ব সমেত মূল্য ৷৷/০ নয় আনার অধিক হয় না। অর্থাৎ চতুর্থ গুণ অপেক্ষাও অধিক লাভ। ইতি।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ দত্ত।

জাহানাবাদ অঞ্চলে

সোরগোঁজা ও নীলের আবাদ।

সম্পাদক মহাশয়,

বহু দিবস হইল জাহানাবাদ অঞ্চলে সোরগোঁজা ও নীল কি প্রকারে চাস হইয়া থাকে তদ্বিবরণ আপনকার নিকট প্রেরণ করিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলাম। কিন্তু সুবিধা অভাবে ঐ স্থান হইতে চাস প্রকরণ আনাইতে পারি নাই। এক্ষণেও নীল চাস সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিতে পারিলাম না এবং আমার বোধ হয় জাহানাবাদ অঞ্চলে যে প্রকারে নীল চাস হইয়া থাকে অন্যান্য স্থানেও সেইরূপ হয়। যাহা হউক নীল কিম্বা যে কোন ফসলের চাস জানিতে ইচ্ছা করিবেন আনাইয়া দিতে পারিব।

সোরগোঁজা মেটেল কিম্বা দোয়াসলা উভয় প্রকার মৃত্তিকায় উত্তমরূপ জন্মে। জাহানাবাদ অঞ্চলে দারকেশ্বর নদের 'মানায়' কিম্বা যে সকল জমি নদের বন্যায় প্লাবিত হয়, তাহায় উত্তমরূপ চাস হইয়া থাকে। আশ্বিনের শেষে কিম্বা কার্ত্তিকের প্রারম্ভে দুই বার চাস দিতে হয়। শুষ্ক জমিতে জল সেচন করতঃ 'বাত' উপস্থিত হইলে পুনরায় দুইটা চাস দিয়া জমির 'পাট' করিতে হয়। পরে মই দ্বারা 'বাত চাকিয়া' দুই দিবস রাখা যায়। তৃতীয় দিবসে একটি চাস দিয়া কিঞ্চিৎ সার কিম্বা অর্দ্ধমন খইল ছড়াইয়া পুনর্ব্বার চাস দিয়া মই দিতে হয়। তৎপরে এক চাস দিয়া বীজ বপন করতঃ সামান্যরূপ এক চাস দিয়া মই দ্বারা মৃত্তিকা সমান করা যায়, ও জল নির্গমন কারণ 'পাটী ধরাইতে' অর্থাৎ সামান্য প্রকার পয়ঃপ্রণালী প্রস্তুত করিতে হয়। বিঘা প্রতি বীজ প্রায় /২॥ সের হইলেই যথেষ্ট হয়। কলাই ও শর্ষপের ন্যায় ক্রমে বীজ অঙ্কুরিত হইয়া গাছ হয়। ফুল ধরিতে আরম্ভ হইলে অর্দ্ধমন খইল দিয়া একবার জল সেচন করা আবশ্যক। মৃত্তিকার তেজ অনুসারে গাছ শীঘ্র বলবান্ হয় এবং গাছের ডাঁটা সকল পুষ্টি প্রাপ্ত হয়। শর্ষপের ন্যায় মাঘ মাসে গোঁজা পাকিয়া থাকে। পরে তাহা কাটিয়া এক স্থানে 'গাদা' করিয়া রাখা যায়। ৪।৫ দিবস পরে রৌদ্রে শুকাইয়া গোঁজা বীজ ঝাড়িয়া লইলেই কার্য্য শেষ হইল। বিঘা প্রতি সচরাচর গোঁজা ২॥০ মন জন্মিয়া থাকে।

সোরগোঁজা শর্ষপের সহিত মাড়িয়া তৈল প্রস্তুত করে এবং ঐ তৈল লোকে রন্ধন, মৃক্ষণ প্রভৃতি আবশ্যক কার্য্যে ব্যবহার করে। বস্তুতঃ বলিতে হইলে ইহা শর্ষপের প্রতিনিধি স্বরূপ এবং চাস আবাদ সম্বন্ধেও শর্ষপের ন্যায়।

সোরগোঁজা চাসের এক প্রধান সুবিধা এই যে ইহার এক প্রকার তীব্র গন্ধের জন্য গো, ছাগ ইত্যাদি ভক্ষণ করে না। গ্রামে গো, ছাগ, বানর (হনুমান) ইত্যাদির উপদ্রবে অনেক ফসল হওয়া দুর্ঘট হইয়া থাকে। গোঁজা ফুল দেখিতে অতি মনোহর। যখন সমুদায় ক্ষেত্র হরিদ্বর্ণ পুষ্পরাজিতে বিভূষিত হয়, তখন মনে এক আশ্চর্য্য ভাবের উদয় হইয়া থাকে।

তিল চাসের ন্যায় নীলের চাস হইয়া থাকে। এবং অধিকাংশ সময়ে তিলের সহিত নীল বীজ বপন করা যায়। দোয়াসলা ও পলি মৃত্তিকায় নীল

উপযুক্তরূপ জন্মে। মাঘ মাসে জল সেচন করতঃ কিম্বা বৃষ্টি জলে বাত্ত হইলে তিন চারি চাস দিয়া জমির পাইট হইলে বীজ বপন করা যায়।

তদনন্তর চাস দিয়া মই দ্বারা মৃত্তিকা সমান করিয়া থাকে। যদি বৈশাখ মাসের শেষে কিম্বা জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমে বৃষ্টি না হয়, তবে জল সেচন করা আবশ্যক। তিল প্রায় নীল পাকিবার অগ্রে পক্কতা প্রাপ্ত হয়। এই জন্য তিল কাটিয়া লইয়া নীল গাছ সকল নীলকর মহাজনদিগের নিকট কৃষকেরা বিক্রয় করে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়,
হুগলী কালেজ, তৃতীয় বর্ষীয় ছাত্র।

উদ্যান কার্য্য।

উদ্যান কার্য্যে সচরাচর ত্রিবিধ সার ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পাতা-পচা, গোবর ও পলিমাটী। কার্য্যবিশেষে অল্প পরিমাণে খৈল ব্যবহার করা যায়।

পাতা পচা সার।

বাগানে যত প্রকার পাতা পড়ে, সেই সমস্ত মধ্যে২ সংগ্রহ করিয়া একটা গর্ত্তে ফেলিতে হয়। সেই সকল পাতা গর্ত্তে পচিয়া মাটী হইয়া যায়। এই মাটী সর্ব্ব প্রকার ফুল গাছে, বিশেষতঃ যে সকল গাছ টবে জন্মে, সেই সকল গাছে বিশেষ প্রয়োজনীয়।

গোবর।

টাট্‌কা গোবরে সারের কার্য্য করে না; কেবল আষাঢ় শ্রাবণ মাসের টাট্‌কা গোবর উদ্যান কার্য্যে ব্যবহার করা যাইতে পারে। তদ্ব্যতীত অন্য সময়ের গোবর উপরিউক্তরূপে গর্ত্তে ফেলিয়া পচাইতে হয়। গোবর পচিয়া মাটী হইয়া গেলে সেই মাটী উদ্যানে সাররূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোন গাছে অন্য সময়ের কাঁচা গোবরও ব্যবহার করা যাইতে পারে।

পলিমাটী।

নদী, খাল, বিল, পুষ্করিণী ইত্যাদির তলস্থ মৃত্তিকা মাঘ ফাল্গুণ মাসে তুলিয়া রাখিয়া উপযুক্ত সময়ে ব্যবহার করিতে হয়, ইহা ভিন্ন এই মৃত্তিকা সম্বন্ধে আর কিছুই করিতে হয় না।

খৈল।

উদ্যান কার্য্যে শুষ্ক খৈল প্রায় ব্যবহার করে না, ইহা মাটীর সহিত মিশাইয়া পচাইতে হয়। অনন্তর কার্য্যবিশেষে ব্যবহার করা যায়।

গোলাপ।

এ দেশে যে সকল উদ্যান পত্রিকা ও ক্যাটেলগ্ দেখা যায়, তাহাতে সচরাচর তিন চারি শত প্রকার গোলাপের নাম দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঐ সকল গোলাপের মধ্যে অনেক গুলি করিয়া এক২ জাতীয় হইলেও তাহাদের গঠন ও গন্ধাদি বিষয়ে কিছু২ ভিন্নতা আছে। আমরা ক্রমে তাহাদিগের প্রত্যেকের পৃথক্ বিবরণ প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিব। আপাততঃ গোলাপ পুষ্পের প্রতিপালন সম্বন্ধে কয়েকটী সাধারণ বিষয়ের উল্লেখ করা যাইবে।

জয় ঘণ্টিকা নামে এক জাতীয় গোলাপ আছে। তাহার ফুল লোহিত, ক্ষুদ্র ও গন্ধ বিহীন; কিন্তু তাহার গাছ অতিশয় তেজস্বী ও বৃদ্ধিশীল। আবার ফুল ও কলিকা সর্ব্বদা ভাঙ্গিয়া দিয়া ঐ গাছকে অধিকতর তেজস্বী করিয়া রাখিতে হয়। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে ছায়াযুক্ত স্থানে হাপোর প্রস্তুত করিয়া তাহাতে ঐ গাছের আধ হাত পরিমিত শাখা সকল রোপণ করিতে হয়। এই হাপোরে পত্রসার দিয়া মধ্যে২ জল দিতে হয়। এই শাখা কলম প্রস্তুত হইলে তাহার সহিত বস্রাই গোলাপ ভিন্ন আর যাবতীয় গোলাপের যোড় লাগাইতে হয়। এই যোড় সম্পন্ন হইলে শাখাকে গাছ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া যোড় কলম পৃথক্ স্থানে রোপণ করিতে হয়। এইরূপেই প্রায় যাবতীয় গোলাপ গাছের সৃষ্টি হইয়া থাকে। আশ্বিন হইতে পৌষ এই চারি মাসের মধ্যে গোলাপের পাইট্ করিতে হয়। গোলাপের সমস্ত শাখা কর্ত্তনপূর্ব্বক মূল খনন করিয়া তাহার প্রায় সমস্ত শিকড় বাহির করিয়া দিতে হয়। এই

অবস্থায় ১০। ১৫ দিন রাখিলে গাছ গুলি অতিশয় নিস্তেজ হইয়া আইসে। সেই সময়ে বড়২ গামলায় গোবর ফেলিয়া জলে গুলিতে হয়। গোবরকে তরল কর্দ্দমের ন্যায় করিয়া এবং তাহার মধ্যে যে সকল জঞ্জাল থাকে, তাহা ছাকিয়া ফেলিয়া সেই তরল গোময় গোলাপের খনিত মূলে ঢালিয়া দিতে হয়। তিন চারি দিন অনাবৃত অবস্থায় রাখিয়া তাহার উপর মাটী চাপা দেওয়া আবশ্যক। এইরূপে পাইট্ করিলে পূর্ব্বোক্ত কর্ত্তিত শাখা হইতে নূতন প্রশাখা সকল সতেজে বহির্গত হয় এবং তাহাতে যথা সময়ে উৎকৃষ্ট রূপে কুসুম জন্মিতে থাকে। প্রতি বৎসর এইরূপ পাইট একবার করিতে হয়। তদ্ভিন্ন বর্ষের মধ্যে মূল পরিষ্কার রাখা ব্যতিরেকে আর কিছুই করিতে হয় না।

কার্ত্তিক মাসে বসুাই গোলাপের শাখা কর্ত্তন করিয়া তাহার শাখাকলম প্রস্তুত করিতে হয়। এই শাখাকলম হইতে একেবারেই নূতন বসুাই গোলাপ গাছের সৃষ্টি করা যায়; তাহার যোড়কলম প্রস্তুত করিবার প্রয়োজন হয় না। এই গোলাপের পাইট্ও পূর্ব্বোক্তরূপে করিতে হয়; কিন্তু ইহার মূলে গোবরের পরিবর্ত্তে পাঁকমাটী দেওয়া আবশ্যক। গ্রীষ্মকালে সকল প্রকার গোলাপের মূলেই আলবাল প্রস্তুত করিয়া অপরাহ্নে জল সেচন করা আবশ্যক।

কলম।

কলম নানাবিধ। তন্মধ্যে সচরাচর শাখা কলম, যোড় কলম, গুটি কলম ও দাবা কলম এই চারি প্রকার কলমের দ্বারা উদ্যানের কার্য্য চলিয়া থাকে। আমরা সংক্ষেপে এই চারি প্রকার কলমের বিবরণ প্রকাশ করিতেছি, কিন্তু কলমের প্রকরণ অন্ততঃ একবার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ না করিলে কেবলমাত্র উহার বিবরণ পাঠে তাহা হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। ভিন্ন২ কলম ভিন্ন২ বৃক্ষাদির পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

শাখা কলম।

এই কলম দ্বারা সচরাচর বেল, মল্লিকা, জুঁই, গোলাপ, করবী, স্থলপদ্ম, জবা ইত্যাদির চারা উৎপন্ন করা যায়। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে উত্তমরূপে চৌকা

প্রস্তুত করিয়া তাহাতে উক্ত বৃক্ষাদির পরিপক্ক শাখা অর্দ্ধ হস্ত পরিমাণে কর্ত্তন করিয়া ঈষৎ হেলাইয়া রোপণ করিতে হয়; শাখা সকলের উভয় গ্রন্থির মধ্যস্থলে কর্ত্তন করা এবং তিন চারিটী গ্রন্থি মৃত্তিকার মধ্যে প্রোথিত করা আবশ্যক। শাখা কলমের চৌকায় অধিক রৌদ্র লাগা ভাল নহে এবং মধ্যে২ অল্প পরিমাণে জল সেচন করিতে হয়। চৌকা যাহাতে অনেক দিন ধরিয়া অধিক শুষ্ক কি অধিক আর্দ্র না থাকে, তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। চিক্কণ মৃত্তিকায় পত্র সার মিশ্রিত করিলেই চৌকার মাটী তৈয়ার হয়। যত শাখা রোপণ করা যায়, সমুদায় গুলি হইতেই নূতন চারা উৎপন্ন হয় না, কতক গুলি মরিয়া যায়। উই, শাখা কলমের একটী প্রধান উৎপাত। তদ্ভিন্ন শাখা কলমের গোড়ায় জল বসিলে কিম্বা তাহা নাড়া পাইলে শাখা কলম শুকাইয়া কিম্বা পচিয়া যায়। যে গুলির গ্রন্থি হইতে নূতন শাখা মুকুল নির্গত হইয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে, সেই গুলি যথা সময়ে সাবধানে তুলিয়া উপযুক্ত স্থানে রোপণ করিলেই নূতন গাছের সৃষ্টি হয়। কোন২ উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান্ বিদেশীয় উদ্ভিদের কলম করিতে হইলে তাহা কাচাবরণে ঢাকিয়া রাখিতে হয় এবং মধ্যে২ খুলিয়া দিয়া অল্প পরিমাণে জল সেচন করিতে হয়।

যোড় কলম।

এই কলম দ্বারা আম, জাম, লেবু, লিচু, পিচ্, গোলাপ ইত্যাদির চারা উৎপন্ন করা যায়। একটী বীজোৎপন্ন কিম্বা শাখা কলমোৎপন্ন চারার সহিত ঐ সকল বৃক্ষের শাখার যোড় লাগাইতে হয়। চারা ও শাখার কাণ্ড সমান স্থূল হওয়া আবশ্যক; বরং শাখাপেক্ষা চারার কাণ্ড কিঞ্চিৎ স্থূল হইলে ক্ষতি হয় না। অন্যূন দুই বৎসরের চারার সহিত যোড় কলম প্রস্তুত করা উচিত। যে সকল চারার সহিত যোড় কলম করিতে হয়, তাহা প্রথমতঃ টবে তৈয়ার করা উচিত। বৃক্ষের যে২ শাখায় যোড় লাগাইতে হইবে, তাহার নিকট মাচা বাঁধিয়া ঐ সকল টব স্থাপন করিতে হয়। চারা ও শাখার উভয় গ্রন্থির মধ্যস্থলে শাণিত ছুরিকা দ্বারা অতি সাবধানে কিয়দংশ কাষ্ঠের সহিত ত্বক্ কর্ত্তন করিতে হয়। এই উভয় কর্ত্তনস্থল ঠিক থাবলের ন্যায় হইবে এবং ঐ দুইটী কর্ত্তিত স্থানের আকার ও আয়তন এরূপ হওয়া উচিত যেন, একটীর উপর আর একটী স্থাপন করিলে সম্পূর্ণরূপে মিলিয়া যায়, কো

দিকে কিছু মাত্র ফাঁক না থাকে। প্রথমে চারা ও শাখাকে এইরূপে মিলাইয়া মিলন স্থলের উপর শক্ত রজ্জু দ্বারা দৃঢ়রূপে বন্ধন করা আবশ্যক। এইরূপে কয়েক মাস রাখিলেই চারা ও শাখায় স্বভাবতঃ যোড় লাগিয়া যায়। অনন্তর সংযুক্ত স্থল হইতে চারার উপরিভাগ ও শাখার নিম্ন ভাগ কাটিয়া দিলেই যোড়কলম প্রস্তুত হয়। কিন্তু এরূপ সতর্ক ও স্থিরভাবে কলম কাটিতে হয়, যেন কোন মতে যোড় নড়িয়া না যায়। যোড় নড়িয়া গেলে সে কলম নষ্ট হইয়া যায়। এই যোড় অগ্রহায়ণ পৌষ মাসে লাগাইয়া আষাঢ় শ্রাবণ মাসে কাটিতে হয়। কার্ত্তিক মাসেই, কলমের চারা ভূমিতে রোপণ করিবার প্রশস্ত সময়। এক জাতীয় বৃক্ষের শাখায় শাখায়ও এইরূপ যোড় লাগিতে পারে, কিন্তু সেরূপ কলম বিশেষ কার্য্যে আইসে না।

গুটি কলম।

যে সকল বৃক্ষের যোড় কলম করা যায়, প্রায় সে সমস্ত বৃক্ষেরই গুটি কলম করা যাইতে পারে। চৈত্র বৈশাখ মাসে গুটি কলম বাঁধিতে হয়; কিন্তু এই কলম বাঁধিবার প্রায় দুই মাস পূর্ব্ব হইতে উহার মাটী প্রস্তুত করিতে হয়। তিন ভাগ আটাল মাটী ও এক ভাগ খৈল জল দ্বারা তরল কর্দ্দমের ন্যায় করিয়া পচাইতে হয়। যে শাখায় গুটি কলম বাঁধিতে হইবে, চৈত্র ও বৈশাখ মাসের মধ্যে কোন সময়ে সে শাখায় চারি অঙ্গুলি পরিমিত স্থানের চতুর্দ্দিক হইতে কিঞ্চিৎ কাষ্ঠের সহিত ছাল কাটিয়া ফেলিতে হয়। এই কর্ত্তিত স্থানটী উভয় পত্রগ্রন্থির মধ্যে হওয়া উচিত। পরে পূর্ব্ব প্রস্তুত মৃত্তিকা ঐ কর্ত্তিত স্থানের চতুর্দ্দিকে উত্তমরূপে ধরাইয়া চট কিম্বা অন্যবিধ মোটা কাপড় দ্বারা বাঁধিতে হয়। অন্ততঃ যত দিন প্রবল বর্ষারম্ভ না হয়, তত দিন ঐ গুটির উপর জলের ঝরা দেওয়া আবশ্যক। এই রূপে তিন চারি মাস থাকিলেই ঐ কর্ত্তিত স্থানের উভয় প্রান্ত হইতে শিকড় নির্গত হয়। কার্ত্তিক মাসে ঐ গুটির নিম্ন ভাগে শাখাকে ছেদ করিয়া কলম নামাইতে পারা যায়।

দাবা কলম।

লেবু, পিচু, বেল, মল্লিকা, মাধবী ইত্যাদি বৃক্ষের দাবা কলম সহজেই প্রস্তুত করা যায়। কারণ ইহাদিগের শাখাকে একবারে ভূমিতে নত করা

এরারুট।

পীড়া নিবন্ধন এরারুটের পরিচয় বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। কয়েক বৎসর হইল বিদেশ হইতে আনীত হইয়া ইহার চাস দেশ মধ্যে অল্পে অল্পে আরম্ভ হইয়াছে। এরারুট অতি লঘু পথ্য, এজন্য চিকিৎসকেরা সাগুর ন্যায় ইহা রোগীদিগের পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। এরারুট গাছের মূলে উৎপন্ন হয়। হরিদ্রার ন্যায় ইহার চাস করিতে হয়। এরারুটের চাস অতি সহজ। এজন্য অনেক স্থানে ইহার আবাদ দেখিতে পাওয়া যায়। নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম বর্দ্ধমান প্রভৃতি কয়েকটী জেলায় এরারুটের চাস হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

এরারুট আদা জাতীয় বৃক্ষ; আদা ও হরিদ্রার মূলে যেমন গাছ জন্মে ইহার গাছও ঐ রূপে উৎপন্ন হয়। দোঁয়াশ মৃত্তিকায় পূর্ব্ব বৎসরের সার দিয়া জমি প্রস্তুত করিতে হয়, জমি তৈয়ার হইলে বার তের অঙ্গুল অন্তর আলি বাঁধিতে হয় এবং আলির উপর অর্দ্ধহস্ত ব্যবধান করিয়া মূল পুঁতিতে হয়। সচরাচর বৈশাখ হইতে আষাঢ় মাসের মধ্যেই এরারুটের চাস করিয়া থাকে। মূল হইতে চারা বাহির হইলে, আলির পার্শ্ব হইতে মৃত্তিকা লইয়া চারার গোড়া ঢাকিয়া দেওয়া আবশ্যক। এরারুটের ক্ষেত্রে জল দেওয়ার বিশেষ নিয়ম কিছুই নাই, যে ভূমি সরস থাকে গাছের অবস্থা উত্তম চারা সকল সতেজ তাহাতে জল না দিলে কোন ক্ষতি হয় না। নীরস ভূমিতে মধ্যে মধ্যে জল না দিলে গাছ মরিয়া যাইবার সম্ভাবনা। এরারুটের গাছে ফুল ধরে না। মাঘ বা ফাল্গুণ মাসে এরারুটের মূল তুলিতে হয়। যে নিয়মে এরারুটের পাল প্রস্তুত করিতে হয় তদ্‌সম্বন্ধে সি কে রাবিসন সাহেব যে রূপ লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

"মৃত্তিকা হইতে এরারুটের মূল তুলিয়া জলেতে উত্তমরূপ ধৌত করত ঢেঁকিতে কুটিয়া শাঁসের ন্যায় নরম করিতে হইবে। অনন্তর ঐ শাঁস একটা বড় টবের মধ্যে পরিষ্কার জলে ভিজাইয়া রাখিয়া, তাহাতে যে

ছিবড়া থাকে তাহা নিংড়িয়া ফেলিয়া দিবে। পরে ঐ শাঁস মিশান সাদা জল মোটা কাপড়ে ছাঁকিয়া স্থির হইতে দিবে। জল স্থির হইলে পর, তলস্থ শুভ্র সার জল হইতে পৃথক করিয়া পুনশ্চ তাহা জলে মিশায়া ছাঁকিতে হইবে। অবশেষে তাহা পাতের উপর রাখিয়া রৌদ্রে দিয়া শুষ্ক করিলে ব্যবহার যোগ্য এরারুটের পাল হইবে।

শণ।

ভারতবর্ষে বহুকাল হইতে শণের চাস হইয়া আসিতেছে। ভিন্ন ভিন্ন স্থানের কৃষকেরা ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী অনুসারে শণ প্রস্তুত করিয়া থাকে। অধুনা ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ অনেক অনুসন্ধান দ্বারা উহার উন্নতি সম্বন্ধে যে রূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, এস্থলে তাহা লিখিত হইল।

"সকল প্রকার মৃত্তিকাতেই শণ জন্মিতে পারে, মাটির প্রভেদে ফসলের ন্যূনাধিক্য হয় না কেবল গুণের বৈলক্ষণ্য হইয়া থাকে।

যে সকল ভূমিতে স্রোত দ্বারা মাটি জমে, তাহা শণ চাসের পক্ষে বড় ভাল। তদ্ভিন্ন যে জমীর মৃত্তিকা নরম অথবা যাহাতে পচা লতা পাতা কিম্বা পুরাতন ফসলের পচা গোড়া দ্বারা সার হয় এমত ভূমিও শণ চাসের উপযুক্ত; কিন্তু যে ভূমির মৃত্তিকা শক্ত কিম্বা কঙ্করময় অথবা শুকনা বালুকা থাকে এমত জমিতে এই ফসল ভাল হয় না। ফলতঃ ভূমির অবস্থা বড় ভাল অথবা বড় মন্দ হইলে তাহাতে শণ চাস করা উচিত নহে কেন না অত্যন্ত উর্ব্বর জমিতে চাস করিলে যথেষ্ট গাছ জন্মিয়া শণ মন্দ হয় আর মরা জমিতে চাস করিলে অত্যন্ত ক্ষীণ ও দুর্ব্বল গাছ হওয়াতে শণ ভাল হয় না।

কেহ কেহ অনুমান করেন যে ভূমির অত্যল্প নীচে জল থাকে, তাহা শণ চাসের পক্ষে বড় ভাল। ডবলিন নগরে এগ্রিকল্চার সোসাইটীতে এই বিষয়ে যে সকল চিঠি পত্র লেখা হয়, তাহাতেও নির্নীত হইয়াছে যে

ভিজা অথচ শক্ত মাটির জমিতে যত অধিক পরিমাণে শণ হয় ও তাহাতে যত উত্তম বীজ হয় হাল্‌কা মাটির জমিতে তত হয় না। মেং ডুহেমেল অনুমান করেন হাল্‌কা মাটির জমি অপেক্ষা শক্ত মাটির জমিতে প্রায় উত্তম শণ হয় না। মেং হজকিন্‌সন কহেন যে, যে সকল জমী হাল্‌কা অথচ উর্ব্বরা তাহাতে ধান্যাদির একটা ফসল হইয়া গেলে সেই ভূমিতে শণ চাস করিবে।

চাস——যে ভূমিতে শণ রোপণ করিবে তাহাতে অনেক বার নাঙ্গল দিবে এবং আল্‌গা করিয়া মই দিবে ও বাগানের জমির ন্যায় উত্তম রূপে প্রস্তুত করিবে, পরে ছয় ছয় ফিট চৌড়া করিয়া এক এক চৌকা করিবে এবং মধ্যে নালা করিয়া দিবে কিন্তু ঐ নালা ক্ষেত্রের দীর্ঘ পরিমাণ পর্য্যন্ত লম্বা রাখিতে হইবে, এরূপ নালা করিলে দুই প্রকার উপকার হইবে, এক এই যে বুনানির পর নিড়াইবার সুবিধা হইবে, দ্বিতীয় এই যে জমী যদি ভিজা কিম্বা অধিক জলে প্লাবিত হয় তবে ঐ নালা প্রশস্ত করিয়া তাহা দিয়া সহজে জল বাহির করা যাইতে পারিবে।

বীজ——বীজের গুণ দোষেই ফসল ভাল মন্দ হইয়া থাকে। অতএব বীজ পসন্দ করিবার সময় বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত। শণের বীজ বদল না করিয়া এক প্রকার বীজ বারম্বার রোপণ করিলে ভাল ফসল হয় না। শণের তিন প্রকার বীজ আছে। প্রথম প্রকারের বীজে লম্বা অথচ সরু ডাঁটার গাছ হয়, তাহাতে অত্যল্প ফুল ধরে, এবং অনেক বিলম্বে পাকে, কিন্তু ঐ প্রকার গাছের শণ অতিশয় লম্বা ও তাহাতে সরু সুতা হইয়া থাকে। দ্বিতীয় প্রকার বীজের গাছে যথেষ্ট ফুল হয়, যদি বীজ রাখার অভিপ্রায় থাকে, তাহা হইলে ঐ রূপ বীজ বপণ করা ভাল, কিন্তু ঐ প্রকার বীজের গাছ হইতে যে শণ হইবে তাহার সূতা ছোট ও মোটা হইবে। তৃতীয় প্রকার বীজ উক্ত দুই প্রকার বীজের মধ্যবর্ত্তী। উক্ত তিন প্রকার বীজে যে শণ গাছ হয়, তাহা ভিন্ন সময়ে পাকে, অতএব শণের বুনানির সময় সাবধান হইতে হইবে বীজ সকল যেন মিশান না হয়। অপর প্রথম বীজ ঘন করিয়া দ্বিতীয় প্রকার বীজ তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ অন্তর করিয়া তৃতীয় প্রকার বীজ তদপেক্ষাও অধিক তফাত করিয়া

বুনিবে। উজ্জ্বল কটা বর্ণ এবং স্পর্শে তৈলবৎ চিক্কণ ও ওজনে ভারি যে বীজ তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল।

বীজ বপণ——ভারতবর্ষে আশ্বিন কিম্বা কার্ত্তিক মাসে বীজ বোনা আবশ্যক। বুনানির সময় ঘন ঘন করিয়া বীজ বুনিবে, তাহা হইলে ডাঁটা সকল সরু হইবে, সরু ডাঁটার সূতা চোস্ত ও মিহি হইতে পারিবে এবং সকল শণ লম্বায় সমান হইবে। শণের প্রত্যেক কাটিতে সমান সংখ্যক সূতা থাকে সুতরাং মোটা ডাঁটার শণ অপেক্ষা সরু ডাঁটার শণ সূক্ষ্ম হয়। অপর ঘন করিয়া না পুঁতিলে আর এক অনিষ্ট হয় অর্থাৎ দূরে দূরে গাছ হইলে গাছে ডাল ফেলিতে পারে, তাহাতে সূতা নষ্ট হইয়া যায়। বাঙ্গালা এক বিঘা জমিতে আধ মোন বীজ হইলেই বুনানি হইতে পারে। যদি ফসল হইতে অধিক বীজ রাখিবার অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলে অধিক অন্তর করিয়া বীজ বুনন করিবে। কিন্তু তাহাতে ডাঁটা শক্ত ও অধিক গাঁইট এবং ছোট সূতার গাছ হইবে আর ওঁচা শণই বিস্তর জন্মিবে।

নিড়ান———চারা সকল বাহির হইয়া যখন চারি অবধি ছয় ইঞ্চ উচ্চ হয় তখন নিড়াইতে আরম্ভ করিবে এবং যাবৎ পর্য্যন্ত গাছ যত বড় হইতে পারে, সম্পূর্ণ রূপে তত বড় না হয় তাবৎ পর্য্যন্ত ক্রমাগত নিড়াইতে থাকিবে। যে সকল ব্যক্তিরা নিড়াইবে, তাহারা যেন বাতাসের দিকে মুখ করিয়া ক্ষেত্রের মধ্যে বেড়ায় তাহা হইলে নরম ও শুইয়া পড়া গাছ সকল তাহাদের গুড়ি মারিয়া যাইবার সময় হাওয়া দ্বারা উচ্চ হইতে পারিবে। কোন কোন জমিতে ঝড় ও বৃষ্টির সময় শণের গাছ নুইয়া পড়ে, তাহা নিবারণ করিতে হইলে, ক্ষেতের দুই ধারে খুঁটি পুঁতিয়া তাহার উপরে বাঁশ লম্বা করিয়া দিলে, গাছ ঠেক্‌না পাওয়াতে নীচে পড়িতে পারে না। অন্য প্রকার উপায় দ্বারাও উহা নিবারিত হইতে পারে। সমস্ত ক্ষেতের লম্বা ও চৌড়া দিকে খুটি পুঁতিয়া তাহার উপর দড়ি দিয়া শণের গাছের মধ্য দিয়া বাঁধিয়া দিলে আরও সহজ ও ভাল রূপ গাছ নুইয়া পড়া নিবারণ হইতে পারে; কেন না ঐ রূপে গাছের চারি পার্শ্বে দড়ী বদ্ধ হওয়াতে অতিশয় ঝড়

বহিলেও গাছ জালে আবদ্ধের ন্যায় ঐ দড়ির মধ্যে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে। ভারতবর্ষে উত্তর পশ্চিমে বাতাস বহিতে আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে শণ তোলা উচিত।

উত্তোলন——শণ গাছের গোড়া জরদা বর্ণ হইয়া পাতা ঝরিতে আরম্ভ হইলেই তাহা তুলিবার উপযুক্ত হয়। শণ তুলিবার সময় গাছ ধরিয়া শিকড় সমেত উপড়াইবে। শণ পাকিলেও যতদিন পর্য্যন্ত তাহার বীজ না পাকে, ততদিন জমিতে রাখা যাইতে পারে। বীজ রাখার অভিপ্রায় হইলে, গাছ তুলিয়া আড়া আড়ি করিয়া সাজাইয়া রাখিলে, সহজে বীজ লইতে পারা যায়। যাহারা বীজ তুলে তাহারা ঐ রূপ সাজান গাছ হইতে মুঠা করিয়া বীজ ছিঁড়িয়া লইতে পারে, তাহাতে তাহাদের ক্লেশ হয় না। কিন্তু ঐরূপ সাজাইয়া দুই এক দিন মাঠে শুকাইবার জন্য ফেলিয়া রাখা আবশ্যক।

শণ পচান——ইয়ুরোপে কৃষকেরা যে প্রকারে পাট ডুবাইয়া রাখে, ভারতবর্ষেও সেই ধারায় শণ পচাইয়া থাকে, তবে এই মাত্র প্রভেদ ইয়ুরোপে পাট ডুবাইয়া তাহার উপরে পরিষ্কার ইট ও তক্তা চাপা দেয়, এদেশের কৃষকেরা তাহা না দিয়া শণের উপরে মাটি ও পচা পাঁক চাপা দিয়া থাকে, কিন্তু তাহাতে সূতা দাগি ও পচা হয়। শণের সূতা সকল পরস্পর ভিন্ন করিবার নিমিত্ত পচান আবশ্যক। পচান ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে হইতে পারে; প্রথম প্রকার এই এক মাস বা ছয় সপ্তাহ মাটিতে ফেলিয়া রাখে তাহাতেই শণ পচে। দ্বিতীয় বাঁধা জলে ডুবাইয়া রাখিয়া পচায়, এই প্রকার জলে অতি শীঘ্র পচিয়া থাকে দশ দিনের মধ্যেই পচা সম্পূর্ণ হয়; কিন্তু এরূপে পচাইলে সূতা নীরস হয়। নীলের হৌজে ফেলিয়া নীলের মত পচান যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে চারি দিন অন্তর জল বদলাইয়া দিতে হইবে এবং শেষে কতকদিন জমিতে ফেলিয়া রাখিতে হইবে। তৃতীয় প্রকার স্রোতের জলে ডুবাইয়া পচায় কিন্তু তাহাতে পচিতে এক মাস লাগে। যে জলে শোণ পচাইবার নিমিত্ত ডুবাইয়া রাখিবে, সেই জল যত দিন পর্য্যন্ত বিকৃত হইয়া অম্লরস হইতে আরম্ভ না হয়, তাবৎ পর্য্যন্ত শোণ জলে

রাখিবে। অনন্তর জল পচিতে আরম্ভ হইলেই শণ সকল জল হইতে তুলিবে এবং যেখানে ঘন ঘন ঘাস অথবা খড়কুটা থাকে এমত স্থানে সাজাইয়া রাখিবে, কিন্তু সর্ব্বদা উল্‌টাইয়া দিতে হইবে এবং যতদিন কাঠি সকল শুকাইয়া হাত দিয়া ভাঙ্গিবার উপযুক্ত না হয় ও শণের সরু সরু সূতা সকল আপনা হইতে খসিয়া না পড়ে তাবৎ পর্য্যন্ত ঐ স্থানে সাজান থাকিবে।

পঞ্চম প্রকার গরম জলে এবং নরম সাবানে শণ পচায়, ইহা সর্ব্বা-পেক্ষা উত্তম। মেং—লিস্ সাহেব এই প্রথা প্রকাশ করিয়াছিলেন। শুষ্ক জলে ডুবাইয়া রাখা অপেক্ষা ঐ প্রকার জলে দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে কি সরস কি শুষ্ক সকল প্রকার শণ উত্তমরূপে পচে এবং তাহাতে উত্তম সূতা বাহির হয়।

বিলাতে রপ্তানি জন্য শণ ও পাট একটী প্রধান বাণিজ্যের দ্রব্য হইয়া উঠিয়াছে। অতএব দেশ মধ্যে এই কৃষির বহুল চাস একান্ত আবশ্যক।

উদ্যান।

দুঃখ সন্তপ্ত হৃদয় প্রসন্ন করিতে উদ্যান একটী প্রশস্ত ক্ষেত্র। এই ক্ষেত্রে গমন করিলে সকল প্রকার দুঃখ বিস্মৃত হইতে হয়। এখানে প্রকৃতি সতী সৌন্দর্য্যের দ্বার চিরউম্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। এমন সৌন্দর্য্যের রঙ্গভূমি, আনন্দের ক্রীড়াস্থল এবং নির্ম্মল সুখের ভাণ্ডার সংসারে অতি দুর্ল্লভ। ফলপুষ্প ভারাবনত মনোহর বৃক্ষ, আনন্দময়ী লতা, শ্যামল বর্ণ বিশিষ্ট নবদুর্ব্বাদল স্বতঃই মানব মনকে বিমোহিত করিয়া থাকে। এখানে সকলই পবিত্র, সকলই দেবভাবে পরিপূর্ণ। তাইবলি উদ্যানের ন্যায় সুখের স্থান জগতে আর নাই।

কবি এই পবিত্র ক্ষেত্রে আসিয়া কল্পনার যোগসাধন করেন, উপমার উপমেয় রত্ন এই খনি হইতে সংগ্রহ করিয়া থাকেন, প্রকৃতি সতী শিক্ষয়িত্রী হইয়া তাঁহার মানসক্ষেত্রে নানা রূপ কল্পনার বীজ রোপণ করিয়া দেন।

কবিকুল চূড়ামণি কালিদাস বল, সেক্সপিয়ার বল, সকলেই এখান হইতে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। এই উদ্যানের ফল, পুষ্প, লতা শোভা লইয়া সকলেই আপন আপন কবিতার জীবন দান করিয়াছেন। যে কবি যে পরিমাণে উদ্যানের সৌন্দর্য্যে হৃদয় রঞ্জিত করিয়াছেন, তিনি সেই পরিমাণে কবিতারসে সংসার ভাসাইয়াছেন। জয়দেব এই উদ্যান হইতে ললিত লবঙ্গ লতা লইয়া সুমধুর পদাবলী রচনা করিয়া সংসার মাতাইয়াছেন! দুষ্মন্ত জগতের যাবতীয় মণি মাণিক্য তুচ্ছ করিয়া অন্তঃপুরবাসিনী রমণী গণের সহিত আশ্রম পালিতা বনলতা শকুন্তলার রূপগরিমার তুলনা দিতে সংসার ভাণ্ডারে আর কিছুই না পাইয়া অবশেষে হৃদয়ের সহিত বলিয়াছিলেন, "আজ উদ্যান-লতা বন-লতার নিকট পরাজিত হইল।" রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, অতি পুরাকাল হইতেই আর্য্যেরা স্নেহের চক্ষে বৃক্ষলতাদি দর্শন করিতেন। ঋষিগণ স্ব স্ব আশ্রম নানাবিধ বৃক্ষ, পুষ্পলতা দ্বারা সর্ব্বদা সুশোভিত করিয়া রাখিতেন। মুনি কন্যা সকল আপন সহোদর ও অপত্যের ন্যায় আশ্রম রোপিত তরু-লতাদিগের প্রতি ব্যবহার করিতেন। রামায়ণে উল্লিত আছে, জনক দুহিতা পঞ্চবটীর অনুপম শোভা দেখিয়া রাজ্য সুখ বিস্মৃত হইয়াছিলেন। কুরুকুল তিলক কুরুরাজ স্বহস্তে হল চালনা করিয়া ক্ষত্রিয় বীর্য্য খথনি কুরুক্ষেত্র আপন বাসযোগ্য রাজধানী করিয়াছিলেন। বসুদেবাত্মজ জনার্দ্দন প্রাণের সহিত ভাল বাসিয়া তাল, তমাল, পিয়াশাল প্রভৃতি পাদপ শ্রেণী এবং রমণীয় কুঞ্জবন লইয়া চিত্ত বিনোদন করিতেন। ফলতঃ অতি প্রাচীনকাল হইতেই উদ্যানস্থিত বৃক্ষাদির প্রতি আর্য্যগণের ভালবাসা ছিল।

উদ্যান প্রিয়তা ভারতবাসীদিগের চিরদিনের গৌরব। আর্য্যগণ বৃক্ষ-লতার প্রতি এত মমতাপূর্ণ ছিলেন যে তাহার প্রমাণ স্বরূপ বৃক্ষসেবা একটী মহাধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। প্রখর রৌদ্রের সময় মৃত্তিকা অত্যন্ত নীরস থাকে, পাদপ সকল পুষ্টি সাধনোপযোগী রস গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না এজন্য বৈশাখ মাসে বৃক্ষ বিশেষে জল সিঞ্চন একটী যাহা ব্রতের মধ্যে পরিগণিত হইয়া রহিয়াছে। ফলতঃ প্রাণিগণের প্রতি সদ্ ব্যবহারের ন্যায় অনেক বৃক্ষের প্রতি ও সদ ব্যবহারের প্রথা হিন্দুদিগের

যাইতে পারে। তদ্ভিন্ন যে যে সকল গাছের গুটি কলম করা যায়, তাহাদিগেরও দাবা কলম হইতে পারে। তবে উচ্চ বৃক্ষে ঐ কলম করিতে হইলে তাহাদিগের শাখা সকলকে টবের মৃত্তিকায় প্রোথিত করিতে হয়। দাবা কলম করিতে হইলে, শাখার একটী পর্ব্ব, উভয় পার্শ্বের গ্রন্থি পর্য্যন্ত চিরিয়া তন্মধ্যে এক খণ্ড কাষ্ঠ, কোঞ্চি কিম্বা বাখারি প্রবেশ করাইয়া ঐ স্থান দৃঢ়রূপে মৃত্তিকায় প্রোথিত করিতে হয়। এই কলম সম্বন্ধে এইরূপ দৃষ্টি রাখা অতি আবশ্যক, যাহাতে ঐ প্রোথিত স্থানটী উঠিয়া না পড়ে এবং শাখার চেরা স্থান যোড়া লাগিয়া না যায়। এইরূপে তিন চারি মাস থাকিলেই ঐ চেরা স্থান হইতে শিকড় বহির্গত হয়। পরে যথা সময়ে সাবধানে কলমের নিম্ন ভাগে শাখাকে ছিন্ন করিয়া উপযুক্ত স্থানে রোপণ করা যাইতে পারে।

দাবা কলম আরও দুই প্রকারে তৈয়ার করা যায়। শাখার একটী গ্রন্থির নিকট হইতে অপর গ্রন্থি পর্য্যন্ত কলম (লেখনী) কাটার ন্যায় এরূপে চিরিতে হইবে যে, চেরা খণ্ডের এক পার্শ্বের এক প্রান্ত শাখা হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে, কিন্তু অপর প্রান্ত শাখার সহিত সংযুক্ত থাকিবে। ঐ স্থানকে নত করিয়া প্রোথিত করিলে দাবা কলম প্রস্তুত হইতে পারে। অপর প্রকার, ঠিক গুটি কলমের ন্যায় শাখার চতুঃপার্শ্ব হইতে ত্বক্ ও কাষ্ঠ কাটিয়া ফেলিয়া সেই স্থান পুতিয়া দিলেও দাবা কলম প্রস্তুত হইতে পারে। দাবা কলম করিবার জন্য শাখার যে ভাগ মৃত্তিকার মধ্যে প্রোথিত করা যায়, সেই স্থানকে স্থির রাখিবার নিমিত্ত কলমের নিকটে একটী দৃঢ় কাষ্ঠের কীলক প্রোথিত করিয়া তাহার সহিত শাখাকে বন্ধন করা কিম্বা প্রোথিত স্থানের উপরে গুরুভার পদার্থ স্থাপন করা যাইতে পারে। এই কলমও চৈত্র বৈশাখ মাসে প্রস্তুত করা যায়।

ক্রমশঃ।

মধ্যে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। নির্ম্মল পুষ্প লইয়া ঈশ্বরের নির্ম্মল চরণ পূজা করিবার নিমিত্ত সকল হিন্দুজাতির আবাস ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে নানাবিধ পুষ্পের বৃক্ষ রোপণ প্রথা বহুকাল হইতেই চলিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু কালের কেমন কুটিল গতি, পূর্ব্বের ন্যায় এখন আর হিন্দুজাতির আবাস ভূমিতে পুষ্পাদির বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায় না। পূর্ব্বে প্রায় সকল হিন্দু সন্তানগণের বাস ভূমিতে নানা প্রকার ফল পুষ্পের বৃক্ষে সুশোভিত থাকিত। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই হতভাগ্য বাঙ্গালি আজ কাল আবার সেই একটী নির্ম্মল সুখে বঞ্চিত হইতেছেন। উদ্যানের পারিপাট্য সাধনে তাঁহাদিগের আর পূর্ব্বের ন্যায় যত্ন দেখিতে পাওয়া না।

বাড়ীতে একটী ফল পুষ্পের উদ্যান থাকিলে যে কত উপকার সাধিত হয় তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। উহা কেবল যে নয়নানন্দ বর্দ্ধক সুখের স্থান তাহা নহে; তদ্বারা বিস্তর লাভও হইতে পারে। প্রাতে ও সায়ংকালে স্বহস্তে কিয়ৎকাল উদ্যান কার্য্য করিলে অঙ্গ চালনা জনিত স্বাস্থ্যের প্রভূত উপকার হইয়া থাকে। উদ্যানস্থিত বৃক্ষের ফল পুষ্প শোভা দর্শন করিলে মনে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপস্থিত হয় এবং স্বীয় উদ্যানের ফল বিতরণ দ্বারা লোকের উপকার সাধন করিতে পারা যায়। পণ্ডিতবর উইলিয়ম রস্ক সর্ব্বদাই বলিয়া থাকিতেন "স্বহস্তে হল চালনা দ্বারায়, রজনীতে আমার যেরূপ গাঢ় নিদ্রা হইত, সে সুখ আমার মনে এখনও জাগরিত হইয়া রহিয়াছে।" প্রভূতক্ষমতা, অতুল ঐশ্বর্য্য, অসীম পদমর্য্যাদা এ সকল উপকরণ লইয়, মানবমন পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। সেই জন্যই বোধ হয়, দেবরাজ ইন্দ্র অমরাবতী অপেক্ষাও নন্দন কানন অধিক ভাল বাসিতেন লঙ্কাপতি রাবণ স্বর্ণলঙ্কার মধ্যে অশোক কাননকেই সমধিক গৌরবের ও সুখের স্থান বলিয়া নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন, রামচন্দ্র অযোধ্যার শোভায় আকৃষ্ট না হইয়া নৈমিষারণ্যকেই সাধন কানন করিয়াছিলেন। ফলতঃ বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বোধ হয়, বৃক্ষ লতাদির প্রতি ভালবাসা মনুষ্যের স্বাভাবিক ধর্ম্ম।

কি প্রণালীতে উদ্যান সুশোভিত করিতে হয়, কোন্ কোন্ ঋতুতে এবং দিবসের কোন্ ভাগে বৃক্ষে জল সিঞ্চন করিতে হয় আর্য্যেরা তদসম্বন্ধেও

বিস্তর উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। উদ্যানের পারিপাট্য সাধনে অর্থাৎ লতাদির কুঞ্জ রচনা প্রভৃতিতেও তাঁহাদিগের অভিজ্ঞতা দেখিতে পাওয়া যায়। অধুনা ইয়ুরোপীয়গণ উদ্যানের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে অত্যন্ত মনোযোগী হইয়াছেন। তাঁহারা পৃথিবীর নানাস্থান, নানাবন, নানা বর্ব্বত হইতে বহুবিধ সুরম্য বৃক্ষলতাদি সংগ্রহ করিয়া স্বীয় স্বীয় উদ্যান সুশোভিত করিতেছেন। কৃষি বিজ্ঞানে তাঁহাদিগের অসাধারণ দক্ষতা দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। উদ্যানের উন্নতি করিবার জন্য তাঁহারা ননা প্রকার উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। এক একটী বৃক্ষে ভিন্ন ভিন্ন গাছের কলম করিয়া এক বৃক্ষ হইতে কত প্রকার ফুল ফুটাইতেছেন। রসায়ণ বিদ্যার প্রভাবে বিভিন্ন প্রকৃতির বৃক্ষ লইয়া কত আশ্চর্য্য ক্ষমতা প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহাদিগের অধ্যবসায় ও যত্নে উদ্যানের যে যার পর নাই শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। তাঁহারা চারি পাঁচ জাতীয় গোলাপ লইয়া অন্যূন বারশত প্রকারের গোলাপ করিয়া উদ্যানের অসাধারণ শোভা করিয়াছেন। যিনি একবার কোম্পানির বাগান কিম্বা ইডেন গার্ডেন দেখিয়াছেন, তিনিই উদ্যান কার্য্যে তাঁহাদিগেরগুণপনা বুঝিতে পারিয়াছেন।

সচরাচর উদ্যান সকল দুইভাগে বিভক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। পুষ্পোদ্যান ও ফলের উদ্যান। তন্মধ্যে ফলের বাগান একটী আয়ের সংস্থান। কাবুল আফগান স্থানের লোকেরা ফলের বাগান দ্বারা বিলক্ষণ লাভ করিয়া থাকেন। আমাদের দেশে আম্র কাঁঠাল, নিচু, লেবু, পেয়ারা প্রভৃতি সুখাদ্য ফলের বাগান থাকিলে অনায়াসে জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারে এক একটী বাগানের ফল, কলম ও কাষ্ঠ বিক্রয় দ্বারা যথেষ্ট অর্থ সংগৃহীত হইয়া থাকে। সহরবাসী অপেক্ষা পল্লীবাসীদিগের এ বিষয়ে অনেক সুবিধা আছে পল্লীগ্রামে প্রত্যেক গৃহস্থের আবাস বাটীর চতুর্দ্দিকে বিস্তর স্থান পতিত দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল পতিত ভূমি ফেলিয়া না রাখিয়া উদ্যানে পরিণত করিলে যথেষ্ট লাভ হইতে পারে। আবাস বটীর উদ্যানে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ রোপন না করিয়া কলমের গাছ রোপণ করাই ভাল। কারণ অল্প দিনের মধ্যে বৃক্ষে ফল ধরে, এবং অল্প বয়সের বিনয়ের ন্যায় চারা গাছের ফল দেখিতে অত্যন্ত আনন্দ কর হইয়া উঠে

লমের গাছ রোপণ করিলে গাছ অধিক স্থান ব্যাপিয়া ং আওতা জন' অন্যান্য গাছের কোন অনিষ্ট হয় না। সকল দাতার ন্যায় অকাতরে ফলদান করিয়া উদ্যান স্বামীকে করিয়া থাকে। ফলতঃ এক একটী উদ্যান এক একটি বলিলেও বড় দোষ হয় না।

বেগুণ।

বেগুণের আবাদ একটি লাভ জনক কৃষি। যে প্রণালীতে চাস করিয়া আমারা ইহার লাভ দেখিয়াছি এই প্রস্তাবে তাহাই লিখিত হইল।

বীজ রক্ষা ও চারা প্রস্তুত———ক্ষেতে প্রথমে যে সকল বেগুণ ধরিতে আরম্ভ হয় ঐ স ে বেগুণের মধ্যে যে গাছের বেগুণ সম্যকরূপে পরিপুষ্ট হয় এবং গাছ তেজাল থাকে, এরূপ গাছের প্রথমকার বেগুণ বীজ জন্য রাখা আবশ্যক। যত দিন পর্য্যন্ত ক্ষেতে গাছ থাকিবে, ততদিন ।।ত ঐ বেগুণ গাছে রাখিতে হইবে। গাছে বেগুণ সুন্দররূপে পরিপক্ক হইলে, ক্ষেত উঠিবার সময় ঐ বেগুণ ঘরে তুলিয়া রাখা উচিত। কেহ কেহ বেগুণ হইতে বীচি পৃথক করিয়া জলে ধুইয়া রাখিয়া থাকেন। বীচি ধুইয়া রাখিলে বেগুণের আস্বাদনের মিষ্টতার অনেক হ্রাস হইয়া থাকে। এজন্য সমগ্র বেগুণ রাখা কর্ত্তব্য।

অনন্তর চৈত্র মাসে গোবরের সার দিয়া হাপর করিতে হইবে। ঐ পরে সেই বেগুণের সমুদায় বীচি পাতো দিতে হইবে। হাপরে বীচি ফেলা ংলে পাতালতা দ্বারা ঐ সকল বীচি উত্তম করিয়া ঢাকা আবশ্যক। যখন খিবে বীচি হইতে চারা অঙ্কুরিত হইয়াছে, তখন আর ঐ আচ্ছাদন রাখার কোন প্রয়োজন থাকিবে না।৬।৭ অঙ্গুলি পরিমিত চারা বড় হইলে অর্থাৎ ৩।৪ টি পাতা ধরিলে ঐ সকল চারা তুলিয়া ক্ষেতে রোপণ করিতে হইবে।

জমির পাইট ও রোপণ প্রণালী———ফাল্গুন মাসে উত্তম করিয়া

জমিতে লাঙ্গল দিয়া রাখিতে হইবে। ভূমি সুন্দররূপ তাহাতে সার ফেলিয়া রাখা আবশ্যক। সারের সঙ্গে কিয়ৎ মিশাইয়া দিলে ভাল হয়। কারণ মাটিতে ছাই মিশান থাকিে পোকা লাগিয়া গাছের বিশেষ ক্ষতি করিতে পারে না। পূর্ব্বে দড়ি ধরিয়া দুই হাত অন্তর দাঁড়া বা আইল বাঁধিতে হ হিসাবে ঐ সকল দাঁড়া বাঁধা উচিত যেন বর্ষার জল জমিয়া গ অনিষ্ট করিতে না পারে। গাছের গোড়ায় জল জমিলে ফল না। এজন্য নিতান্ত নিম্ন ভূমিতে বেগুণের চাস করা কর্ত্তব্য নহে। দাঁড়া কাটা হইলে, বৈশাখ মাসের প্রথমে হাপর হইতে চারা তুলি রোপণ করা উচিত। চারা সকল হাপর হইতে তুলিয়া তাহার শিকড়ের কিয়দংশ কাটিয়া ফেলিয়া অবশিষ্ট শিকড়ে গোবর মাখিয়া রোপণ করিবে। পূর্ব্বে ক্ষেতে যে দাঁড়া কাটা হইয়াছে, ঐ দাঁড়ার মধ্যে নিম্ন ভূমিতে দুই হাত অন্তর লাইন করিয়া এক একটী চারা পুঁতিতে হইবে। চারা পুঁতার এক সপ্তাহ পরে চারার গোড়ায় ঐ দাঁড়ার কিয়ৎ পরিমাণে মাটি কাটিয়া দিতে হইবে। আবার সপ্তাহ পরে গাছ কিছু বড় হই, ঐ দাঁড়া হইতে প্রথমে আয় মাটি কাটিয়া গাছের অনেক দূর পর্য্যন্ত ঢাকিয়া দিতে হইবে। অধিক পরিমাণে মাটি দ্বারা গাছ ঢাকিয়া দিবার তাৎপর্য্য এই যে গাছ বড় হইয়া ফল ধরিলে ভার জন্য কোন দিকে হেলিয়া পড়িতে পারিবে না। দ্বিতীয় বার মাটি দিবার এক মাস পরে, পুনর্ব্বার দাঁড়ার অবশিষ্ট মাটি কাটিয়া গাছের গোড়ায় দিতে হইবে। ফল ধরা পর্য্যন্ত মধ্যে মধ্যে গাছের গোড়া খুঁড়িয়া দেওয়া আবশ্যক।

পিপীলিকা বেগুণ গাছের একটী পরম শত্রু। এই শত্রু লাগিয়া অকালে অনেক গাছ নষ্ট করিয়া ফেলে। এজন্য পিপীলিকা লাগিলে ক্ষেতে ছাই ছড়াইয়া অথবা হরিদ্রা গুলিয়া দেওয়া উচিত। পিপীলিকা ভি অন্য এক প্রকার পোকা লাগিয়া গাছের বিস্তর অপকার করিয়া থাকে এই পোকা গাছের উপরিভাগে কোন স্থানে ছিদ্র করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিতে আরম্ভ করে। এবং উপরিকার সমুদায় ডাঁটা শূন্যগর্ভ করিয়া পুনর্ব্বার নিম্নে নাবিতে আরম্ভ করিয়া থাকে এজন্য সর্ব্বদা সতর্ক থাকা আবশ্যক।

মধ্যাহ্নে একটা দেড়টা সময় ক্ষেতে গিয়া দেখিবে যে সকল গাছের ডগা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, সেই সকল গাছের যেখানে উক্ত রূপ ছিদ্র দেখিবে তাহার চারি পাঁচ অঙ্গুলির নিম্নে কাটিয়া সে ডাঁটাটী ক্ষেত হইতে দূরবর্ত্তী অন্য স্থানে ফেলিয়া দিতে হইবে, কারণ ক্ষেতে উহা ফেলিলে ডাঁটার অভ্যন্তরস্থ কীট অন্য গাছ আক্রমণ করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় অনিষ্ট করিতে পারে। পূর্ব্বোক্ত রূপে জমি তৈয়ার করিয়া বেগুণ রোপণ করিলে গাছে জল না দিলে চলিতে পারে। তবে আবশ্যক বোধে পৌষ মাসে ক্ষেতে জল দিলেও উপকার ভিন্ন কোন অপকার দেখা যায় না। ১৮০৯ টী চারা হইলেই এক বিঘা ভূমির উপযুক্ত হইতে পারে।

পাইক পাড়া নর্শরির অন্তর্গত পোনর কাঠা জমিতে এই রীতি অনুসারে বেগুণের আবাদ করা হয়, ঐ সকল গাছে এত বেগুণ ধরিতে আরম্ভ করিয়াছিল যে তাহা শুনিলে আশ্চর্য্য বোধ হয়। এক সপ্তাহে ক্ষেত হইতে প্রায় ৪০।৫০ টাকার বেগুণ বিক্রয় করা হইয়াছিল। যাঁহারা বেগুণের আবাদ করিয়া থাকেন নর্শরির এই প্রণালীর প্রতি তাঁহাদের লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য।

আমাদের দেশে নানা প্রকার বেগুণ হইয়া থাকে। কয়েক বৎসর হইল ইয়ুরোপ হইতে নানা জাতীয় বিলাতী বেগুণ আনীত হইয়া দেশ মধ্যে চাষ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বিলাতী বেগুণ দেশীয় বেগুণের ন্যায় সুখাদ্য নহে। ঐ সকল বেগুণ সুপক্কাবস্থায় লোহিত বর্ণ হইলে গাছগুলি দেখিতে অতি সুন্দর হয়। দেশীয় বেগুণের মধ্যে মুক্ত কেশী, মাকড়া, শিঙ্গা, চৈতে প্রভৃতি প্রকার ভেদে নানা জাতীয় দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল বেগুণের মধ্যে মুক্তকেশী উৎকৃষ্ট। ইহার বিশেষ গুণ এই যে গাছে অধিক পরিমাণে ফলিয়া থাকে এবং আস্বাদনে সুস্বাদু। পাইক পাড়া নর্শরিতে এই বেগুণের আবাদ করা হইয়াছিল।

পেঁপে।

আমাদের দেশে নানা বিধ সুখাদ্য ফল জন্মিয়া থাকে। ঐ সকল ফলের বৃক্ষ কতক এদেশ জাত, কতক বিদেশ হইতে আনীত। পেঁপের গাছ দেশ মধ্যে যেরূপ ব্যাপিয়া পড়িয়াছে, তাহা দেখিলে উহাকে এতদ্দেশীয় গাছ বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু পেঁপে আমাদের দেশীয় ফল নহে। আমেরিকা হইতে উহা আনীত হয়, এক্ষণে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই উহার গাছ দেখিতে পাওয়া যায়।

পেঁপে অতি সুখাদ্য ফল ; ইহার একটী বিশেষ গুণ এই যে উহা প্রায় বার মাসেই পাওয়া যায়। কাঁচা পেঁপের অতি উত্তম তরকারি হইয়া থাকে। সুপক্ক পেঁপের মিষ্টতার পরিচয় দিতে বোধহয় জিহ্বা কাহাকেও বঞ্চিত করে নাই ; সুতরাং তাহাতে আমরা ক্ষান্ত হইলাম।

বর্ষাকালে পেঁপের বীজ ছড়াইয়া দিলে, তাহা হইতে চারা বাহির হইয়া গাছ জন্মিয়া থাকে। বীজ ছড়াইবার সময় একটী বিষয়ে লক্ষ্য রাখিলে ভাল হয় ; পেঁপের বোঁটার দিকে অর্থাৎ যে দিকটা সোরু সেই দিকের বীজ না পুঁতিয়া যে ভাগ মোটা সেই দিকের বীজ পুঁতিলে যে গাছ হয়, তাহাতে বড় বড় পেঁপে হইয়া থাকে। সচরাচর আট দশ মাসের মধ্যেই পেঁপে ফলিতে আরম্ভ হয়। পেঁপের চারা তুলিয়া পুঁতিলেও গাছ হইতে পারে। কিন্তু ঐ চারা তুলিয়া পুঁতিবার দোষে অনেক গাছের ফল ছোট হইতে দেখা যায়। চারা তুলিবার সময় গাছ যে ভাবে থাকে সেই ভাবে অন্য স্থানে পুঁতিতে হয় ; অর্থাৎ গাছের যে ডাল দক্ষিণ দিকে আছে, তাহা যেন উত্তর বা অন্য কোন দিকে করিয়া পুঁতা না হয়। বীজ হইতে চারা বাহির হইয়া যে ডাল যে দিকে মুখ করিয়া থাকে, অন্য স্থানে পুঁতিবার সময়ও অবিকল সেইরূপ করিয়া পুঁতিলে গাছে বড় বড় ফল ধরিয়া থাকে। পেঁপে দুই জাতীয় দেখিতে পাওয়া যায়, যে গাছে ফল ধরে তাহাকে ফলন্ত গাছ কহে, ইহারা স্ত্রী জাতি

মধ্যে গণ্য, আর যাহাতে ফল হয় না—তাহাকে অফলন্ত গাছ কহে তাহা পুরুষ জাতি মধ্যে পরিগণিত। পেঁপের চারা দেখিলেই ফলন্ত অফলন্ত কিনা তাহা বলিতে পারা যায়। যে সকল গাছের পাতা বড় এবং পাঁপ লম্বা সেই সকল গাছে ফল ধরে না। আর যে সকল গাছের পাতা অপেক্ষাকৃত ছোট পাঁপ ঘন ঘন সেই সকল গাছে ফল ধরিয়া থাকে। পেঁপের গাছ অতি সহজেই হইতে পারে। গাছ করিবার জন্য কোনরূপ ব্যয় বা পরিশ্রম করিতে হয় না, এরূপ অনায়াস লভ্য উৎকৃষ্ট ফলের গাছ সকল বাড়ী থাকা উচিত।

আলু।

কি প্রণালীতে চাস করিলে আলু অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইতে পারে, তদ্‌সম্বন্ধে কতিপয় ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা যেরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহাই পাঠক বর্গের অবগতির জন্য নিম্নে লিখিত হইল।

মেং নাইট সাহেব অনুসন্ধান করিয়া লিখিয়াছেন চোক যুক্ত আস্ত আলু রীতিমত অন্তর করিয়া রোপণ করিলে অধিক পরিমাণে ফসল উৎপন্ন হয়।

ডাক্তার পেট্রিক নীল সাহেব এডিনবর্গ নগরে প্রকাশিত এক খানি পুস্তকে লিখিয়াছেন ঈষৎ অথবা সম্পূর্ণ অপক্ক নম্বাকৃতি আলুর বীজ রোপণ করিলে গাছ সকল অতিশয় তেজাল, এবং অধিক ফলবান্ হয়, অধিকন্তু পোকা লাগিয়া গাছের কোন অপকার করিতে পারে না।

পরিষ্কার হাল্‌কা এবং পলি মাটি যুক্ত ভূমিই আলুর চাসের পক্ষে অত্যুত্তম। এরূপ জমিতে সার না দিলেও আলুর গাছ অতিশয় বাড়িয়া উঠে এবং ফসল অতি সুস্বাদু হয়। ভিজা জমিতে আলুর চাস করিলে গাছ ভাল হয় না এবং পোকা লাগিয়া থাকে। অপর টাটকা গোবরের সার আলুর পক্ষে উপকারী নহে তাহাতে আলু বিস্বাদু হয়। আলুর চাস পক্ষে নূতন পলী পড়া জমি সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম।

বীজ রোপণের পর অঙ্কুর হইলে মাটি খুঁড়িয়া দিতে হইবে। চারা সকল চারি ইঞ্চ উচ্চ হইলে তাহাদিগের বৃদ্ধি এবং শিকড় তেজাল হইবার নিমিত্ত চারিদিকের মাটি একত্র করিয়া ক্রমে ক্রমে গোড়ায় এপ্রকার রাশি করিয়া দিবে যেন আলুর গোড়ার মাটি জমা হইয়া প্রথম রোপণের স্থান অপেক্ষা ১৫ ইঞ্চ উচ্চ হয়। আলুর চারার গোড়ায় মাটি যত অধিকবার খুঁড়িয়া দেওয়া যায় ততই গাছের পক্ষে ভাল, তাহাতে উপকার ব্যতীত অপকার হয় না। গাছে যখন ফুল ধরিবে তখন কুঁড়িগুলা চেপ্‌টাইয়া দিবে, যদিও ইহা সামান্য কর্ম্ম, তথাপি নাইট সাহেব কহেন ঐরূপ করিলে বিঘা-প্রতি ২৭॥ মোন ফসল অধিক হইবে।

আলু উপড়াইবার সময় যাবৎ গাছ একেবারে শুষ্ক হইয়া না যায় তাবৎ পর্য্যন্ত মূলের ফসল তুলিবে না। মেং নাইট্‌ সাহেব কহেন এই প্রণালীতে চাস করিলে প্রত্যেক বিঘার ৩১৪ মোন ফসল উৎপন্ন হইতে পারে। যাঁহারা আলুর চাস করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের এ বিষয় পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। এ পরীক্ষাতে অধিক আয়াস বা ব্যয় করিতে হইবে না। যদি এ দেশে বিঘাপ্রতি ঐরূপ উৎপন্নের পড়ন হয়, তাহা হইলে উহা দ্বারা বিস্তর লাভ হইতে পারে।

ক্রোটন।

কয়েক বৎসর হইল এই সুদৃশ্য গাছ এদেশে আনীত হইয়াছে। মফস্বল-বাসী অনেকেই ক্রোটনের নাম শুনিয়াছেন কি না সন্দেহ। এই গাছ অন্য কোন ব্যবহারে লাগে না। লাল পাতার গাছ যেমন উদ্যানের শোভা করিয়া থাকে, ক্রোটনও সেইরূপ উদ্যানের অপূর্ব্ব শ্রী ও আনন্দ বর্দ্ধন করে।

ক্রোটন নানা জাতীয়; ইহার পত্রের বিশেষ শোভা। পরমেশ্বর ইহাতে যে কত সৌন্দর্য্য ও শিল্পনৈপুণ্য এবং বিচিত্র ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা দেখিলে তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারা

যায় না। ক্রোটনের এক একটী পত্র দেখিলে হৃদয়ে প্রভূত আনন্দ সঞ্চারিত হয়। এক এক জাতীয় ক্রোটনের এক এক প্রকার বিচিত্র পত্র। কোন্ জাতীয় ক্রোটনের কোন্ প্রকার পত্র তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে বুঝান বড় কঠিন।

এই গাছ টবে কিম্বা জমিতে উভয় স্থানেই হইতে পারে। ক্রোটনের গাছ ৪। ৫ হাত উচ্চ হইয়া থাকে। ক্রোটনের পাতায় গাছ তৈয়ার করা একটু কঠিন। ভাল রকম বালি মাটি টবে পূর্ণ করিতে হয়, ঐ বালিতে ক্রোটনের পাতার বোঁটার দিকে পুঁতিতে হইবে। এইরূপ নিয়মে পাতা পুঁতিয়া কাচের আবরণ (গ্লাস কভার) দ্বারা ডাকিয়া রাখিতে হইবে। ঐ টব প্রখর রৌদ্র লাগে এরূপ স্থানে না রাখিয়া ছায়াতে রাখা প্রশস্ত। প্রথমতঃ দুই দিন অন্তর টবে জল দিতে হইবে। গাছ লাগিয়া গেলে জল দেওয়ার নিয়ম ক্রমে কমাইয়া আনিলে কোন হানি হইবে না। গাছ বড় হইলে ঐ আবরণ খুলিয়া রাখিতে হইবে, অনন্তর গাছ গুলি হয় টবে কিম্বা মাটিতে পুঁতিয়া রাখিলে ক্রোটনের গাছ তৈয়ার হইয়া উঠে। বড় গাছের টব রৌদ্রে রাখিলে অথবা রৌদ্র লাগে এরূপ স্থানে গাছ পুতিলে মরিবার কোন আশঙ্কা থাকে না। পাতা অপেক্ষা ডাল কাটিয়া কলম করিলে অতি সহজেই গাছ হইতে পারে। কলম বেলে মাটিতে রোপণ করিলে ভাল হয়। বেলে মাটিতে গাছ পুতিবার কারণ এই গাছের শিকড় সহজেই চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া সতেজ হইয়া উঠিতে পারে।

সম্প্রতি নানা জাতীয় ক্রোটনের গাছ পাইকপাড়া নর্শরিতে আনীত হইয়াছে। উদ্যান প্রিয় ব্যক্তিগণ ইচ্ছা করিলে ঐসকল গাছের চারা এখান হইতে প্রাপ্ত হইতে পারেন।

তেজ পত্র।

আমরা যে সকল মসলা ব্যবহার করি, তাহার অধিকাংশই প্রায় বিদেশ হইতে আনীত হইয়া থাকে! পূর্ব্ব উপদ্বীপ প্রভৃতি না না স্থানের মসলা আসিয়া আমাদের খাদ্য দ্রব্য সুমিষ্ট করিয়া দেয়। প্রত্যেক গৃহস্থেরই মসলার প্রয়োজন। এমত প্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাষে বিমুখ থাকা একান্ত দুঃখের বিষয়। এ দেশের যেরূপ মৃত্তিকার অবস্থা, এবং জল বায়ু যেরূপ অনুকুল একটু যত্ন করিলে আমাদের আবশ্যকীয় অনেক দ্রব্যেরই আবাদ হইতে পারে। দেশ মধ্যে কৃষি বিদ্যার আদর না থাকায় সামান্য একটী পত্রের জন্য আমাদিগকে পর মুখ অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয়।

রন্ধন কার্য্যে তেজ পাত একটী উপাদেয় মসলা। উহা যে কেবল রন্ধনে ব্যবহার হয় এরূপ নহে; ঔষধের জন্যও তেজ পত্রের সমধিক আদর দেখিতে পাওয়া যায়। তেজ পত্রের গাছ অতি সহজেই হইয়া থাকে। বীজ হইতে যে গাছ জন্ম, তাহা নিস্তেজ ছোট এবং অল্প কাল স্থায়ী হয়। তাহার পাতা উত্তম রূপ পরিবর্দ্ধিত হয় না। এবং গাছ বাড়িতে অধিক দিন সময় লাগে। এজন্য কলমের গাছ রোপণ করাই প্রশস্ত। কলমের গাছ চারি পাঁচ বৎসরে বৃক্ষের আকারে পরিণত হয়। কিন্তু যদি চারা গাছে পাতা ভাঙ্গা যায়, তবে গাছ বাড়িতে কিছু বিলম্ব হইয়া পড়ে। এজন্য যত দিন গাছ সম্পূর্ণ না বৃদ্ধি পায়, তত দিন উহার পাতা ভাঙ্গা উচি নহে। তবে স্বভাবতঃ যে সকল পত্র শুষ্ক হইয়া পতিত হয় তহা ব্যবহার করায় কোন হানি হইতে পারে না। গ্রামে একটী তেজ পাতের গাছ থাকিলে, বোধ হয় গ্রামবাসীদিগকে তেজপাতের জন্য বাজারে যাইতে হয় না গাছের সুপক্ক ফল যেমন সুমিষ্ট এবং ইচ্ছা করিলেই ভোগ করিতে পা যায়, সেইরূপ বাগানের পরিণত তেজপাতা উত্তম মসলার কার্য্য করি থাকে এবং আবশ্যকমত ব্যবহার করা যায়। বিদেশ হইতে যে সকল তেজপাতা এ দেশে আসিয়া থাকে, তাহার অধিকাংশ কাঁচা পাতা শুকা-

বাগান সুসজ্জিত ও সুদৃশ্য করিতে হইলে কোন্ স্থানে কি গাছ বসান উচিত।

উদ্যান সুসজ্জিত করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। কোন্ স্থানে কোন্ প্রকারের গাছ বসাইলে দেখিতে মনোরম বোধ হয়, তাহাই উদ্যানের বিশেষ কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। মফঃসল প্রদেশে অনেকেই এই কার্য্যে নিতান্ত অনভিজ্ঞ সুতরাং ঐ সকল গাছ যে কি এবং তাহাদের নাম কেহই অবগত নহেন আমরা তাঁহাদিগের জানাইবার জন্য নিম্নে কতকগুলির নাম প্রকাশ করিলাম, পরে সমস্ত উদ্যানে কি কি গাছ রোপিত হওয়া উচিত ক্রমে২ বলিতে প্রবৃত্ত হইব। এই বারে কেবল বাগানের চতুষ্পার্শ্বে ইষ্টক প্রাচীর বা বেড়ার ধারে যে জো বা পটি নির্ম্মাণ করিতে হয়, ঐ সকল স্থানে যে সকল গাছ বসাইলে ভাল দেখাইবে এবং সচরাচর বসান যায়, তাহাদিগের নাম পাঠকবর্গের ও সাধারণের বিজ্ঞাপন জন্য লিখিত হইল, এই সকল গাছ পাইকপাড়া নর্শরিতে অতি সুলভ মূল্যে পাওয়া যাইতে পারে এবং দিগ্দিগন্ত রেলে বা ইষ্টিমার যোগে বাক্সবন্দি হইয়া নির্ব্বিঘ্নে রওনা এবং অব্যাঘাতে নির্দ্দিষ্ট স্থানে পোঁছিয়া থাকে।

বিদেশস্থ বড় লোক মাত্রেই উদ্যান আছে, কিন্তু ঐ সকল দেশস্থ অনভিজ্ঞ মালিদের উপর নিতান্ত নির্ভর থাকায় শৃঙ্খলা শূন্য হইয়া রহিয়াছে। এইক্ষণে আমরা তাঁহাদিগকে অনুরোধ করি যে, যাঁহারা কলিকাতাস্থ সাহেবগণের ন্যায় বাগান করিতে মানস করেন তাঁহারা আমাদের নিয়ম অনুকরণ করত উদ্যান কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে, তাহাতে মনে অসীম আনন্দ লাভ করিতে পারিবেন, তাহার আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

ইরিথিরিনা ব্লেকাই পারিজাত,	Erythrina Blackii.
ঐ হেণ্ডারসনি, একজাত ঐ	,, Hendersonii.
ঐ কৃষ্টাগেলিস ঐ ঐ	,, Cristagalis.
কোকোলবা,	Cocoloba.
এব্রমা আগষ্টম উলটকম্বল,	Abroma Agustum.
গ্রেভেলিয়া রোবষ্টা,	Gravellia robusta.

ইয়া আমদানী করে, তজ্জন্য উহা গৃহ জাত বৃক্ষের পাতার ন্যায় উত্তম হয় না।

ছায়ার্মুক্ত আঠালে মাটিতে তেজ পাতার গাছ পুঁতিলে, গাছ সতেজ ও বর্দ্ধন শীল হয়। অন্যান্য গাছে যেমন বৎসর বৎসর সার দেওয়ার রীতি আছে, ইহাতেও সেই নিয়মে সার দেওয়া, গাছের গোড়া খুঁড়িয়া দেওয়া এবং সম্যক প্রকারে পাইট করা আবশ্যক। চারার অবস্থায় গাছে সর্ব্বদা জল দেওয়া উচিত। আগুড়া অথবা লতা কিম্বা অন্য গাছের ডাল আসিয়া গাছ আক্রমণ করিতে না পারে, তদ্‌পক্ষে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

পাল্‌ং শাক।

পালঙ শাক বুনিবার প্রণালী এদেশে সকলেই অবগত আছেন। সুতরাং সে প্রণালী উল্লেখ করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। গাছ তেজাল, ঝাড় বড় এবং পাতা অতি বৃহৎ করিবার একটী উপায় সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে, সেই উপায়টী দেশ মধ্যে অবলম্বিত হয় ইহাই আমাদিগের অভি-প্রেত।

পালঙ শাক নানা জাতীয়। কতক দেশী, কতক বিলাতী। দেশী পালঙ আবার প্রকার ভেদে দুই প্রকার, চুকো বা টক পালঙ এবং শাক পালঙ, শাক পালন যে নিয়মে বুনিলে ঝাড় ও পাতা বড় হয় তাহারই বিষয় লিখিত হইল।

সাধারণতঃ শাকের ক্ষেত যেরূপ পাইট করিয়া তৈয়ার করিতে হয় তাহা করিবে। তদসম্বন্ধে নূতন নিয়ম কিছুই অবলম্বন করিবার আবশ্যকতা নাই। পালঙের বীজ ভাদ্রমাসে অরন্ধনের সময় ভিজাইতে হইবে, যে পরিমাণে জল দিলে বীজ সকল ভিজিতে পারে এরূপ হিসাবে জল দিতে হইবে। দিন কয়েক পরে ঐ জল শুষ্ক হইলে, পুনর্ব্বার পূর্ব্বের ন্যায় জল দিয়া ভিজাইতে হইবে, এইরূপ করিয়া ভ্রাতৃদ্বিতীয়া পর্য্যন্ত ভিজাইয়া রাখিতে হইবে। অন-

গুর ভ্রাতৃ দ্বিতীয়ার সময় (দ্বিতীয়ার দুই এক দিন অগ্রে পশ্চাৎ হইলেও হানি নাই) ঐ বীজ ক্ষেতে বুনিয়া প্রতি দিন জল দিতে হইবে। এই বীজ হইতে যে শাক বাহির হইবে তাহার আকার যে অতি বড হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

গোল মরিচ।

পানের লতার ন্যায় মরিচের লতানিয়া গাছ হইয়া থাকে। আঠা-লিয়া মাটিতে উহার লতা রোপণ করিতে হয়। লতার গোডা সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখা আবশ্যক। মধ্যে মধ্যে গাছে সার দিতে হয়। যতদিন পর্য্যন্ত লতা ফলবতী না হয় প্রতিদিন জল দেওয়া উচিত। লতা বড হইলে হয় মাচায় কিম্বা গাছে তুলিয়া দিতে হয়। যে গাছে মরিচের লতা আশ্রয় করে, তাহাকে এরূপ করিয়া ঢাকিয়া ফেলে যে সেই গাছে প্রায় ফল ধরিতে দেখা যায় না। এ জন্য নিষ্ফল গাছে উহার লতা তুলিয়া দেওয়া উচিত।

মরিচের লতা মাটিতে কলম করিলে প্রত্যেক গাঁইট হইতে গাছ বাহির হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে গোডার মূল লতা রাখিয়া সমু-দায় লতা কাটিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। ঐ রূপ করিয়া না কাটিয়া দিলে, গাছের ভাল রূপ তেজ হয় না এবং ফল নিতান্ত ছোট ছোট আকারে হইয়া থাকে। প্রথম বৎসর লতার যে স্থান কাটিতে হয়, দ্বিতীয় বৎসর তদপেক্ষা লতা বড় রাখিয়া কাটিতে হইবে। তৃতীয় বৎসর তাহা অপেক্ষা বড় রাখিয়া কাটিয়া দেওয়া উচিত। এই প্রণালীতে ৩। ৪ বৎসর লতা কাটিয়া দিলে গাছে উত্তম উত্তম ফল ধরিবে। মরিচ পাকিয়া উঠিলে প্রায় প্রতিদিন উহা পাড়িতে হয়। এক একটা গাছে প্রচুর মরিচ উৎপন্ন হইয়া থাকে। দ্বিতীয় বৎসরেই গাছে ফল ধরিয়া থাকে। কিন্তু সেই সকল ফল নিতান্ত ছোট ছোট আকারে হইতে

দেখা যায়। পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে বৎসর বৎসর লতা কাটিয়া দিলে ফল আর ক্ষুদ্র আকারে পরিণত হয় না। এজন্য দ্বিতীয় বৎসরে ফলের আশা পরিত্যাগ করিয়া তৃতীয় বৎসর হইতে গাছে ফল রাখিলে ভাল হয়। ছায়া যুক্ত স্থানে গাছ রোপিত হইলে অধিক পরিমাণে ফল ধরিয়া থাকে।

নারিকেল।

"দাতার নারিকেল,
বকিলের বাঁশ"

নানা স্থানে নানা প্রণালীতে নারিকেল রোপিত হইয়া থাকে। ১২৮৭ সালের ৪র্থ সংখ্যক কৃষিতত্ত্বে নারিকেল রোপণের অনেক গুলি নিয়ম প্রকাশিত হইয়াছে। পাঠকগণ তাহা পাঠ করিলে এ বিষয়ে অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিবেন। সুতরাং তদ সম্বন্ধে আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। অদ্য আমার নারিকেলের বিষয়ে কয়েকটী কথা বলিয়া আমাদের প্রস্তাব শেষ করিবে।

সকল গাছে সমানরূপ নারিকেল ধরে না এবং সকল নারিকেলের আস্বাদ ও সুমিষ্ট হয় না ইহার কারণ কি? কৃষিতত্ত্ববিদ পণ্ডিত সকল এ সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। "বেলে মাটিতে গাছ পুঁতিলে অল্প দিনের মধ্যে গাছ বাড়িয়া উঠে, এবং চারা গাছে বড় বড় নারিকেল ধরিয়া থাকে। এই গাছ দেখিতে অতি আনন্দজনক; কিন্তু বেলে মাটির গাছ অধিক দিন জীবিত থাকে না, গাছে প্রচুর পরিমাণে ফল ধরে না, এবং ফল ও সুমিষ্ট হয় না। অধিকাংশ গাছে কীট লাগিয়া তাহার জীবন নষ্ট করিয়া ফেলে। এ জন্য বেলে মাটিতে নারিকেল রোপণ করা উচিত নহে।

দোআঁশ মৃত্তিকায় নারিকেল রোপণ করিলে, বেলে মাটির রোপিত গাছ অপেক্ষা অধিক দিনে গাছ বাড়িয়া উঠে, ফল অপেক্ষা কৃত মিষ্ট হয় এবং শীঘ্র শীঘ্র গাছ মরিয়া যায় না। আঠালিয়া ভূমিতে চারা পুঁতিলে গাছ বাড়িতে অধিক কালসময় লাগিয়া থাকে। কিন্তু ফল ধরিতে আরম্ভ হইলে অপর্য্যাপ্ত নারিকেল ধরিতে দেখা যায়। এই নারিকেলের জল ও শস্য অতি সুমিষ্ট। গাছ অধিক কাল জীবিত থাকে, কিন্তু নারিকেল কিছু ছোট আকারে হইতে আরম্ভ হয়। আঠালিয়া মাটির গাছে পোকা ধরিয়া অকালে গাছ নষ্ট করিতে পারে না। এজন্য ঐরূপ মৃত্তিকা নির্ব্বাচন করিয়া গাছ রোপণ করা বিধেয়। কেহ কেহ এরূপও কহিয়া থাকেন যে ভূমিতে উলু ঘাস জন্মিয়া থাকে সেই মৃত্তিকায় গাছ রোপণ করিলে আশানুরূপ ফললাভ হইয়া থাকে। চারা পুঁতিবার সময় গর্ত্ত একটু গভীর করিলে ভাল হয়। গভীর গর্ত্তে রোপিত বৃক্ষ বড় হইলে শিকড় সকল মৃত্তিকার উপর বাহির হইয়া গাছের কোন অনিষ্ট সাধন করিতে পারে না। গাছে রাখিয়া নারিকেল ঝুনা করিলে সেই সকল বৃক্ষে অধিক ফলন হইতে দেখা যায় না। গাছ হইতে যত অধিক পরিমাণে ডাব পাড়া যায় ততই ফলন বেশী হয়। বোধ হয় এই কারণেই "দাতার নারিকেল" এই প্রবাদ বাক্য এদেশে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।

নারিকেল অতি উৎকৃষ্ট ফল। উহার বিশেষ গুণ এই যে সকল সময়ই পাওয়া যায়। কি [illegible] কি মহৎ সকলেরই নিকট ইহার সমান আদর। রোগ বিশেষে নারিকেল অতি সুপথ্য ও ঔষধ মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে। বঙ্গদেশ হইতে প্রত্যাগত কোন বিদেশীয় যবন নারিকেল দেখিয়া দিল্লীশ্বরের নিকট ব্যক্ত করিয়াছিলেন মহারাজ! আমি দেখিয়া আসিলাম, পরমেশ্বর বঙ্গদেশের প্রতি অত্যন্ত সদয়। তদ্দেশীয় দিগের আহারের কোন অভাব নাই, ঈশ্বর তাহাদিগের খাদ্যের জন্য দুই খণ্ড রুটী ও জল বৃক্ষে তুলিয়া রাখিয়াছেন।" বোধ হয় নারিকেলের এই সকল উপকারিতা নিবন্ধন প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা নারিকেল বৃক্ষকে ব্রাহ্মণ মধ্যে গণ্য করিয়া গিয়াছেন। ব্রহ্ম হত্যার যে প্রকার মহা পাপ, নারিকেল বৃক্ষ

নষ্ট করায় সেই পাপের বিভীষিকা দেখাইয়া এই মহোপকারী বৃক্ষ রক্ষা করিবার ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন।

চন্দ্র মল্লিকা।

চন্দ্র মল্লিকা অতি সুদৃশ্য পুষ্প, উহার সৌন্দর্য্যে সকলেরই নয়ন আকৃষ্ট হইয়া থাকে। অতি প্রচীন কাল হইতে এই মনোহর পুষ্প এদেশে দেখিতে পাওয়া যায়। অধুনা উদ্ভিদ্ তত্ত্বজ্ঞ ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ রসায়ণ বিদ্যাবলে উহার যার পর নাই উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন। তাঁহারা নানা প্রকার কলম করিয়া প্রায় দুই শত জাতীয় চন্দ্রমল্লিকা উৎপন্ন করিয়াছেন। আমাদের দেশে উহার কিছুই উন্নতি হয় নাই।

নানা বর্ণের চন্দ্রমল্লিকা দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল পুষ্পের মধ্যে কতকগুলি ক্ষুদ্র জাতীয়; অপর কতকগুলি বৃহৎ আকার বিশিষ্ট। বড় বড় চন্দ্রমল্লিকা দেখিতে অতি মনোরম। প্রস্ফুটিত হইবার সময় ক্রমে ক্রমে দল সকল বিকাশ হইতে থাকে; একটী পুষ্প প্রস্ফুটিত হইতে অধিক দিন সময় অপেক্ষা করে। বিকশিত পুষ্প অধিক দিন ধরিয়া গাছে শোভিত থাকে। লোহিত, হরিদ্রা, শুভ্র প্রভৃতি ভিন্ন জাতীয় পুষ্প সকল যখন উদ্যানে প্রস্ফুটিত হইতে আরম্ভ করে, তখন উদ্যানের অত্যন্ত শ্রী হয়।

শীত কালে চন্দ্রমল্লিকা ফুটিয়া থাকে। গাছের ফুল ফুটা শেষ হইলে, ফুটন্ত ডাল সকল কাটিয়া ফেলা উচিত। বৎসর বৎসর ঐ রূপ নিয়মে ডাল কাটিয়া না দিলে, গাছের তেজ হ্রাস হইয়া ফুল ছোট হয়। যে সকল স্থানে জল দাঁড়ায়, এরূপ স্থানে গাছ পুঁতিলে বর্ষাকালে অধিকাংশ মরিয়া যায়। এজন্য উচ্চ ভূমিতে গাছ পোঁতা আবশ্যক, গাছের চারিদিক ঢালু করিয়া দিলে জলে কোন অনিষ্ট করিতে পারে না। মৃত্তিকা অপেক্ষা টবে গাছ সকল ভাল থাকে। এজন্য অনেকে টবে রাখিয়া থাকেন। টবে রাখার প্রধান গুণ এই যে ইচ্ছা-

মত গাছগুলি আবশ্যক স্থানে রাখিতে পারা যায়। ছায়াতে গাছ রাখিলে বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। টবে মধ্যে মধ্যে জল দেওয়া আবশ্যক।

অতি সহজেই চন্দ্রমল্লিকার গাছ হইয়া থাকে। মূল গাছের গোড়া হইতে যে সকল চারা বাহির হয় ঐ সকল চারা তুলিয়া পুঁতিলেই গাছ তৈয়ার হইয়া উঠে।

সার।

যে সকল দ্রব্য মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত হইয়া ভূমিব উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি এবং উদ্ভিজ্জের পুষ্টিসাধন করে তাহাকে সার কহে। প্রাণিগণ যেমন পুষ্টিকর দ্রব্য আহার না করিলে সুস্থ ও সবল থাকে না। উদ্ভিদ-গণও সেইরূপ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টি সাধনোপযোগী পদার্থ না পাইলে বৃক্ষের আকারে পরিণত হইয়া ফল শস্য প্রদান করিতে সমর্থ হয় না। জল, বায়ু উত্তাপ এবং সার প্রভৃতির উপর উদ্ভিদদিগের জীবন সম্পূর্ণ নির্ভর করে। জন্তুদিগের ন্যায় ঐ সকল পদার্থে উদ্ভিদগণের ভিন্ন ভিন্ন শারীরিক কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে। উদ্ভিদগণ সার হইতে আবশ্যকীয় রস গ্রহণ করিয়া জীবন ধারণ করিয়া থাকে। এজন্য সকল দেশেই কৃষি-ক্ষেত্রে সার দেওয়া রীতি দেখিতে পাওয়া যায়। নানা প্রকার দ্রব্য দ্বারা মৃত্তিকার সার প্রস্তুত হইয়া থাকে। জন্তু, উদ্ভিদ, ধাতু, এবং বহু পদার্থের সংযোগেও সার প্রস্তুত হইয়া থাকে। প্রাণিগণের শরীর পচিয়া রূপান্তরিত হইয়া মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত হইলে তাহাকে জন্তুর সার কহে। অস্থি, মাংস রক্ত, প্রভৃতি শরীরের প্রত্যেক পদার্থেই সার হইয়া থাকে। এজন্য কোন কোন দেশের কৃষকেরা বৃক্ষের মূলে রক্তদিয়া থাকে। কোন প্রাণীর শরীর সার করিতে হইলে, তাহার মৃত দেহের উপর চূণ ছড়াইয়া কিছু দিন গর্ত্তে পুঁতিয়া রাখিতে হয়। ৩। ৪ মাস পরে যখন দেখিবে উহা মৃত্তিকার সহিত উত্তম রূপ মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে,

তখন উহা তুলিয়া ভূমিতে দিলে মৃত্তিকার উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হয়। সার প্রস্তুত সম্বন্ধে কয়েকটী নিয়ম কৃষিদর্শন হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"অস্থি সকল ধূলার ন্যায় অত্যন্ত চূর্ণ করিয়া দিলে, প্রথম বৎসর বিশেষ উপকার হয় কিন্তু দ্বিতীয় বৎসর তাদৃশ হয় না। এজন্য উহাদিগকে তাদৃশ চূর্ণ না করিয়া প্রস্তরোপরি রাখিয়া লৌহ নির্ম্মিত কঠিন বস্তুর আঘাত দ্বারা কিছু স্থূল স্থূল রাখিয়া গুঁড়া করিবে, পরে তাহা এক বৎসর ক্ষেত্রমধ্যে ছড়াইলে বহুকাল সমান উপকার জন্মাইবে। এই সার অন্যান্য শস্য অপেক্ষা ইক্ষু এবং গেঁড়ু হইতে যে সকল উদ্ভিজ্জ উৎপন্ন হয় তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী। ইহার বিশেষ গুণ এই যে ইহার সংসর্গে মৃত্তিকা অত্যন্ত আলগা থাকে। যে ক্ষেত্রের মৃত্তিকা স্বভাবতঃ আলগা ও উত্তাপিত তাহার পক্ষে ইহা মহোপকারক। কিন্তু যে ক্ষেত্রে চিক্কণ মৃত্তিকার অংশ অধিক তাহাতে অপেক্ষাকৃত অধিক দিতে হইবে, তাহা না দিলে অধিক উপকার দৃষ্ট হয় না। বালুকাময় ক্ষেত্রে এক বৎসর এই সার ক্রমাগত ছড়াইলে দুই তিন বৎসর উত্তম শস্য হইতে পারে।

শৃঙ্গের গুঁড়া এবং খড়মের বৌল কুঁদিলে যে সকল অবশিষ্ট গুঁড়া থাকে তাহা অস্থি গুঁড়া অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, তাহার ব্যবহার করিতে হইলে অগ্রে তাহাকে গর্ত্তমধ্যে পূর্ব্বোক্ত রূপ পচাইতে হইবে।

অস্থি ভস্ম ও সিদ্ধ করিয়া সার করিলে তাহার স্নেহ দ্রব্য এবং অন্যান্য সারাংশ নষ্ট হওয়াতে তাদৃশ উপকার দর্শে না। এই নিমিত্ত তাহা না করিয়া গুঁড়া করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

মৃতদেহ, অস্থি ইত্যাদি সংস্পর্শ করা হিন্দুশাস্ত্র বিরুদ্ধ, এই সকল দ্রব্যের ব্যবহার এদেশে প্রচলিত নাই, কিন্তু কৃষিকার্য্যের উন্নতি বিধানে কৃষকগণের ইহা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

উদ্ভিজ্জ সার——বৃক্ষের পত্র, শাখা প্রভৃতি গর্ত্তমধ্যে পচাইলে গোময়ের মত সার হয় কৃষিকার্য্যে তাহা ব্যবহার অত্যন্ত আবশ্যক।

মৃত্তিকার অনেক অধোভাগে যে বোধ মৃত্তিকা আছে তাহাও চারার পক্ষে অশেষ উপকারক। ঐ মৃত্তিকা বৃক্ষের পত্র, শাখা, প্রকাণ্ড ইত্যাদি পচিয়া উৎপন্ন হয়।

পুষ্করিণী খনন করিয়া উদ্যান করিতে হইলে অগ্রে ঐ মৃত্তিকা সমভাবে চারাইয়া পশ্চাৎ চারা রোপণ করিবে। ঐ মৃত্তিকার সংসর্গে উদ্যান ভূমির উৎপাদিকা—শক্তি সাতিশয় বৃদ্ধি পাইয়া চারা দিগকে অনায়াসে পরিপুষ্ট করে। অন্যান্য সার অপেক্ষা ইহার বিশেষ গুণ এই যে চারার মূল দেশে পচাপত্র গোময় প্রভৃতি সার প্রদান করিলে, উঁই প্রভৃতি কয়েক প্রকার কীট উৎপন্ন হইয়া চারার অভিনব কোমল শিকড় সকল কাটিয়া ফেলে, তাহাতে উদ্যান সমূলে বিনষ্ট হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। কিন্তু বোধ মৃত্তিকা দিলে তাহার কোন শঙ্কা থাকে না। এই নিমিত্ত গামলায় বীজ বপণ করিতে হইলে অন্য সার না দিয়া বোধ মৃত্তিকা, চিক্কণ মৃত্তিকা এবং বালি সমান অংশে মিশ্রিত করিয়া বীজ বপণ করিবে। যখন ঐ মৃত্তিকা উদ্যানস্থ অন্য চারার মূলে দিতে হইবে, তখন তাহাকে উত্তম গুঁড়া করিয়া দিবে।

উদ্ভিজ্জ সারের মধ্যে খোইল সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। বৃক্ষমূলে খোইল প্রদান করিলে তাহাতে তৈল থাকায় তত্রত্য মৃত্তিকার উৎপাদিকা শক্তি অতিশয় উত্তেজিত হয়, বিশেষতঃ সাম্বাৎসরিক চারা খোইল সম্পর্কে ত্বরায় বৃদ্ধি পায়। কৃষিকার্য্যে খোইল ব্যবহার করিতে হইলে প্রথমতঃ উহাকে শুষ্ক করিয়া গুঁডা করিতে হইবে। পরে যে ক্ষেত্রে চাস দেওয়া হইয়াছে তাহাতে ঐ গুঁডা ছড়াইয়া তাহার উপরিভাগে পুনর্ব্বার লাঙ্গল দ্বারা যাহাতে খোইল চাপা মাত্র পড়ে, এইরূপ অল্পমাত্র চাস দিবে। ঐ খোইলের গুঁড়া ঘুটের গুঁডার সহিত মিশ্রিত করিয়া ছড়াইলে বিশেষ উপকার দর্শে। অনন্তর বৃষ্টির দ্বারা বা জল সেচন করিয়া ঐ মৃত্তিকা ভিজাইয়া রাখিবে। কিছু দিন তদবস্থায় রাখিয়া যখন চারা রোপণ করিতে হইবে তখন পুনর্ব্বার কিছু খোইল ছড়াইতে হইবে, পরে চারা সকল বাড়িলে পুনর্ব্বার কিছু খোইল দিতে হইবে। এইরূপ তিন বার খোইল দিলে ভূমির উৎপাদিকা শক্তির আধিক্য দেখিতে পাওয়া যাইবে। কিন্তু খোইলের অংশ অধিক হইলে চারা নষ্ট হইবার অত্যন্ত সম্ভাবনা, এই নিমিত্ত বিঘাপ্রতি এক মোণ বা আবশ্যক হইলে দুই মোণের অধিক কখন দিবে না।

মসিনার খোইল তিল বা সর্ষপ খোইলের তুল্য। ভেরাণ্ডার খোইল সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। উহার রস আকর্ষণ শক্তি অপেক্ষাকৃত অধিক থাকায় উদ্ভিজ্জের মূলদেশে অধিক রস যোগাইয়া ত্বরায় পরিবর্দ্ধিত করে এবং উহার সংসর্গে বৃক্ষের ফল বা মূল সকল অপেক্ষাকৃত বড় হইয়া থাকে। দোষের মধ্যে আস্বাদনের বৈলক্ষণ্য হয়। আলুক্ষেত্রে উক্ত খোইল দিলে আলু সকল আকারে বড এবং শ্বেতবর্ণ হয়, কিন্তু তাহার তাদৃশ আস্বাদ থাকে না।

ধাতুসার——ধাতুসারের মধ্যে জল* প্রধান বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। কারণ জল ব্যতীত কৃষিকার্য্য কোন রূপেই সম্পন্ন হইতে পারে না। ধাতু নানা প্রকার। কিন্তু এদেশে সমগ্র দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় তাবতের নাম উল্লেখ না করিয়া চূণের বিষয় লিখিত হইল। শীত প্রধান দেশে মৃত্তিকার কাঠিন্য হেতু উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি হয় না। তাহা বাড়াইবার জন্য সেই দেশে চূণ ব্যবহার করা আবশ্যক। বঙ্গরাজ্যে মৃত্তিকায় বালির অংশ অধিক থাকায় চূণ অব্যবহার্য্য, কিন্তু যে ক্ষেত্র বহুকাল পতিত থাকে তাহাতে কৃষিকার্য্য সম্পাদন জন্য অগ্রে লাঙ্গল দ্বারা কর্ষণ করিয়া নূতন চূণ ছড়াইয়া দিবে। পরে তদুপরিভাগে পুনর্ব্বার এমত চাস দিয়া মই দ্বারা মৃত্তিকা চারাইবে, যাহাতে চূণ মৃত্তিকার অধিক নিম্নগত না হয় এবং এক বৎসর তদবস্থায় রাখিলে চূণের প্রভাবে ঘাস প্রভৃতি অকর্ম্মণ্য উদ্ভিজ্জ সকল বিনষ্ট হইয়া যাইবে, পরে অন্য সারদিয়া কৃষিকার্য্য করিলে দুই তিন বৎসর সমান শস্য জন্মাইতে পারে। চূণের প্রধান গুণ এই যে মৃত্তিকা শুষ্ক হইলে বায়ু হইতে রসাকর্ষণ করিয়া মৃত্তিকাকে সরস করে এবং মৃত্তিকা নিরন্তর জল সংসর্গে দূষিত হইলে রস আকর্ষণ পূর্ব্বক তাবৎ দোষ বিনষ্ট করে।

মিশ্রসার———জন্তুসার, উদ্ভিজ্জসার কিম্বা ধাতুসার একত্রিত হইলে মিশ্রিত সার বলা যায়। জন্তুদিগের বিষ্ঠায় স্বভাবতঃ মিশ্রিত সার। তদ্ব্যতীত মনুষ্যেরা দুই তিন প্রকার সার একত্রিত করিয়া মিশ্রিত সার

---

* জল চূণ প্রভৃতিকে ধাতু বলিয়া গণনা করা গেল।

করিয়া থাকে! এদেশে গো, গর্দ্দভ, ঘোটক, মেষ শূকর এবং কপোত প্রভৃতি কতকগুলি জন্তুর বিষ্ঠা মিশ্রিত সারের মধ্যে প্রধান রূপে প্রচলিত আছে। ইহাদের মধ্যে গোময় অতি প্রসিদ্ধ। কিন্তু প্রথমাবস্থায় উহার মধ্যে অনেক অপরিপক্ক বস্তুর অংশ থাকায় না পচাইলে কৃষিকার্য্যের উপযোগী হইতে পারে না। একারণ প্রথমতঃ গর্ত্ত খনন করিয়া তাহার অধোভাগ ইষ্টকাদি দ্বারা বান্ধিয়া এক দিক অপেক্ষাকৃত নিম্ন রাখিবে, পরে ঐ গর্ত্তে গোময়ে পূর্ণ করিয়া কিছু দিন রাখিলে যে সকল রস ক্রমশঃ অবস্থিত হইয়া নিম্নভাগে একত্রিত হইবে তাহা তুলিয়া ক্ষেত্র মধ্যে ছড়াইবে। গোময় শুষ্ক হইলে কিম্বা অত্যন্ত পচিলে তেজোহীন হয়, এই নিমিত্ত যেস্থানে রৌদ্র লাগিতে না পারে এমত স্থানে হ্রদ করিবে এবং মধ্যে মধ্যে তদুপরি গোমূত্র ঢালিয়া দিবে।

সাতিশয় পচিতে সম্ভাবনা হইলে দিন থাকিতে তুলিয়া জলে গুলিয়া ক্ষেত্রমধ্যে ছড়াইলে বিশেষ উপকার জন্মায়। বিশেষতঃ গামলায় যে সকল চারা থাকে, তাহার মূলে ঐ সার প্রদান করিলে ঐ সকল চারা আশু বর্দ্ধন শীল হইয়া উঠে।

গোমূত্রে খোইলের গুঁড়া এবং যথায় গোময়াদি পচে তথাকার মৃত্তিকা মিশ্রিত করিয়া ক্ষেত্রে ছড়াইলে ভূমির অত্যন্ত উৎপাদিকা শক্তি জন্মাইয়া চারা সকলকে ত্বরায় পরিপুষ্ট করে।

এই সার ক্ষেত্রে দিবার পূর্ব্বে লাঙ্গলে ভূমি কর্ষণ করিয়া মই দ্বারা তাহার মৃত্তিকা সমান রূপে চারাইবে। উন্নতানত থাকিলে এই সার তরলতা প্রযুক্ত উন্নত স্থান হইতে নিম্নস্থানে আসিয়া একত্রিত হইবার সম্ভাবনা। পরে বিদা টানিয়া সর্ব্বত্র সমভাবে মৃত্তিকা বিলোড়িত করিবে।

গোমূত্রে অর্দ্ধপূর্ণ কলসে রক্ত, মাংস কিম্বা মৎস্য দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া রাখিবে, ইহাতেও এক প্রকার মিশ্রসার হইতে পারে। পরে ৫।৬ মাস গত হইলে মুখ উদ্‌ঘাটন পূর্ব্বক ঐ সার জলের সহিত গুলিয়া চারার মূলভাগে ঢালিয়া দিবে। এই সার উদ্যান কার্য্যে মহোপকারক।

গোমূত্রের ন্যায় অপর জন্তুর প্রস্রাবও শস্যের পক্ষে উপকার জনক,

লেজারোষ্ট্রোমিয়া, রকম২,	Lagerstrœmea, of sorts.
সেগো পাম,	Sago Palm.
ইয়লো বাম্বু,	Yellow Bambo.
লেজারোষ্ট্রোমিয়া রিজাইনা,	Lagerstrœmea regina.
পয়েনসিয়ানা রিজিয়া, উদ্যানের অতিশয় শোভা,	Poinciana regia.
কলভিলিয়া রেসিমোসা,	Colvillea racemosa.
পয়েনসিয়ানা পলকেরিমা,	Poinciana pulcherrima.
নিকটেনথেস আরবরট্রিসটিস,	Nyctanthes arbortristis.
ওকনা এলাটা,	Ochna Alata.
মিছেলিয়া চাম্পাকা,	Michellia Champaca.
কৃসেণ্টিয়া কেজেটি,	Crecentia Cagettii.
মাইমিউসপস্ ইলেনগাই,	Mimusops Elengii.
নকলিয়া কদম্বা,	Nauclea Kadumba.
বিউটিয়া ফ্রনডোসা,	Butea frondosa.
নিরিঅম, রকম২,	Nerium, of sorts.
ডুরেণ্টা, দুই জাতের,	Duranta, of 2 sorts.
হেমেলিয়া পেটেন্স,	Hamelia patens.
করডিয়া সিবেষ্টিনা,	Cordea Sebestena.
এজাডিরেক্টা ইণ্ডিকা,	Azadirachta Indica.
নকলিয়া করডিফোলিয়া,	Nauclea Cordifolia.
দারাসিনা ২।৩ প্রকারের,	Daracinas, of 2 or 3 sorts.
এগাটি গ্রেণ্ডিফ্লোরা,	Agati Grandiflora.
ঐ অপর রকমের,	Do. other varieties.
বহিনিয়া-পরপরিয়া,	Bauhinia purpurea.
ঐ আলবা,	Do. Alba.
ভুর্জ্জপত্র,	Bhurjapatra.
কেসিয়া, ২-৩ প্রকারের,	Cassia, of 2 or 3 sorts.

কিন্তু প্রথমাবস্থায় ইহার তেজ দুঃসহ, চারায় দিলে জ্বলিয়া যাইতে পারে। অতএব উহাকে কিছু দিন কলসীতে রাখিয়া পচাইবে, পরে তাহার চতুর্গুণ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ভূমিতে ছড়াইলে মৃত্তিকা ত্বরায় উর্ব্বরা হইয়া উঠে। যে ভূমির মৃত্তিকা স্বভাবতঃ আলগা তাহার পক্ষে ঐ সকল জলীয় সার বিশেষ উপযোগী, তাহা পতিত হইবামাত্র মৃত্তিকার অধোভাগে প্রবিষ্ট হইয়া চারার মূলদেশে সংলগ্ন হওয়ায় চারা সকল অল্পকাল মধ্যেই তেজস্বী হইয়া থাকে। যে ক্ষেত্রের মৃত্তিকা অতি কঠিন তাহার পক্ষে তাদৃশ উপকার দর্শে না।

বীজ বপণ করিবার পূর্ব্বে লাঙ্গল দ্বারা ক্ষেত্র কর্ষণ পূর্ব্বক সার ছড়াইয়া পুনর্ব্বার লাঙ্গল ও মই দ্বারা মৃত্তিকা সারের সহিত মিশ্রিত করিয়া এমত চাপা দিবে তাহাতে ঐ সার মৃত্তিকার অত্যন্ত নিম্নগত না হয় এবং নিতান্ত উপরিভাগে না থাকে। যদি অধিক নিম্নগত হয় তবে চারার মূল আপাততঃ অধিক দূর যাইতে না পারায় সারের রস আকর্ষণ করিতে অক্ষম হইয়া থাকে। যদিও উপরিভাগে থাকায় বৃষ্টির জলে গলিয়া মৃত্তিকার ভিতরে প্রবিষ্ট হইতে পারে, কিন্তু অধিক বৃষ্টি হইলে তাহার অধিকাংশই ভাসিয়া যাইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। এই সকল বিবেচনা করিয়া যে ক্ষেত্রে সাম্বাৎসরিক চারা রোপণ করিতে হইবে তাহাতে চারা রোপণের পূর্ব্বে চাস দিয়া একবার, রোপণ সময়ে একবার এবং চারা হইলে একবার এই তিনবার সার দিতে হইবে। তদ্ব্যতীত পূর্ব্বোৎপন্ন চারায় সার দিতে হইলে নিতান্ত গোড়ায় সার না দিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে কিয়দ্দূরে অর্থাৎ মূল হইতে বহির্গত শিকড় সকলের অগ্রভাগ পার্শ্ববর্ত্তী হইয়া যে যে স্থানে বিস্তীর্ণ হইয়াছে সেই স্থান সকল খনন করিয়া সার দিতে হইবে।

মৃত্তিকা কোন দোষে দূষিত হইলে অগ্রে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সংশোধন পূর্ব্বক তাহাতে সার প্রদান করিবে; নতুবা সার দানের কোন ফল দৃষ্টি হইবে না। বর্ষাকালে চারার মূলে সার দেওয়া অনুচিত। যদিও দেওয়া যায় তবে তাহার অধিকাংশই জল প্রবাহে বাহির হইয়া নিম্নস্থানে একত্রিত হয়, একারণ বর্ষাবসানে অর্থাৎ কার্ত্তিক বা অগ্রহায়ণ মাসে চারার মূল দেশের মৃত্তিকা খনন করিয়া অর্থাৎ কিছু দিন সূর্য্যের উত্তাপসংলগ্ন

করিবে। মাঘ বা ফাল্গুন মাসে তাহাতে সার দিয়া মধ্যে মধ্যে জল প্রদান করিতে থাকিবে। তৎকালে প্রায় অনেক বৃক্ষ মুকুলিত হইবার সম্ভাবনা, এজন্য ঐ সময়ে বৃক্ষমূলে সার দিলে তথায় অধিকতর রস সঞ্চার হওয়ায় মুকুল সকল সুচারুরূপে পরিপুষ্ট হইতে পারে।

গোলাপ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

গোলাপ যে নানা জাতীয় তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তন্মধ্যে লোহিত, গোলাপী, শুভ্র, জরদা ও নানা বর্ণ সংযুক্ত গোলাপ এদেশে দেখিতে পাওয়া যায়। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে এক এক ব্যক্তির নামানুসারে এক এক জাতীয় গোলাপের নাম করণ করা হইয়াছে। ঐ সকল বিজাতীয় নামের তালিকা পাঠ পাঠক বর্গের নীরস বোধ হইবে, তজ্জন্য তাহা পরিত্যক্ত হইল।

সকল জাতীয় গোলাপ গাছ রোপণ প্রণালী এক রূপ নহে। আমাদের দেশে যে সকল গোলাপ প্রচলিত আছে, ডাল কাটিয়া পুঁতিয়া দিলে তাহাদিগের গাছ হইতে পারে; অপর কতকগুলি গোলাপের ডালে যে গাছ হয়, তাহাতে ফুল ভাল হয় না এবং ফুলের আকার ছোট হইতে দেখা যায়। বিলাতী কয়েক জাতীয় গোলাপ জোড় কলমেই ভাল হইয়া থাকে। যে প্রণালীতে উহাদিগের কলম বাঁধিতে হয়, নিম্নে তদ্বিবরণ লিখিত হইল।

ভূমি নির্ব্বাচন ও পাইট——উদ্যানের মধ্যে যে স্থানে বৃক্ষাদির আওতা না থাকে, এরূপ বেলে মাটি গোলাপের উত্তম ক্ষেত্র। ঐ স্থানটী যেন বর্ষার সময় জলে প্লাবিত হইয়া না থাকে এরূপ উচ্চ হওয়া আবশ্যক। যদি কোন ক্রমে সে খানে জল সঞ্চিত হয়, তবে চারিদিকে এরূপ উপায় করিবে যেন তৎক্ষণাৎ সেই জল বাহির হইয়া যাইতে পারে। গোলাপ ক্ষেত্র উত্তমরূপ পাইট করিতে হয়। মৃত্তিকা সুন্দররূপ কোদালী দ্বারা

কোপাইয়া ঢিল ভাঙ্গিয়া সমান করিতে হয়। অনন্তর ঐ খনিত মৃত্তিকায় পুরাতন গোময়ের সার মিশ্রিত করিতে হইবে। এই সকল ব্যবস্থানুসারে মৃত্তিকা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে গাছ রোপণ করিলে উৎকৃষ্ট ফল হইতে পারে। দোআঁশ বালুকাযুক্ত মৃত্তিকা যে গোলাপের জন্মভূমি তাহা সর্ব্বদা মনে রাখা আবশ্যক। অতএব উল্লিখিত স্থানে একটী হাপোর করিতে হইবে। হাপোর হইতে গাছ পালার শিকড় ইঁটের কুচি বাছিয়া ফেলিতে হইবে। ফলতঃ হাপোরের মাটি এরূপ করিয়া খুঁড়িয়া বাছিতে হইবে তাহাতে যেন অন্য কোন পদার্থ না থাকে। এই পরিষ্কৃত মৃত্তিকায় উপযুক্ত পরিমাণে গোবরের সার মিশ্রিত করিতে হইবে। মাটিতে সার মিশান হইলে, গাছ পুঁতিবার পূর্ব্বদিন হাপোর জলে ভিজাইয়া রাখিতে হইবে। হাপোরের মাটি উত্তম করিয়া না ভিজাইলে গোলাপের ডাল পুঁতিবার সময় কঠিন মাটির ঘর্ষণে ডালের ছাল উঠিতে কিম্বা তাহাতে আঘাত লাগিতে পারে। ঐ ঘর্ষণে বিস্তর অনিষ্ট হইয়া থাকে। পাঠকগণের ইহা মনে রাখা উচিত যে গোলাপের ছালেই তাহাদিগের জীবন। এমন দেখা গিয়াছে যে ডাল সম্পূর্ণ রূপে ভাঙ্গিয়া গিয়াও সামান্য ছালে আবদ্ধ থাকিয়া উহা জীবিত হইয়া পুষ্প প্রসব করিয়াছে। হাপোর প্রস্তুত হইলে (কার্ত্তিক মাসের মধ্যে ডাল পাতো দেওয়া উচিত) তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা গোলাপ গাছের ডাল কাটিতে হইবে। ডালের গাঁইটের নীচে অর্থাৎ কাঁটার নিম্নে কলম ছিয়া করিয়া এক পোঁচে উহা কাটিলে ভাল হয়। গোলাপ গাছের নিকট হাপোর প্রস্তুত করিয়া ১০।১৫ অঙ্গুলি পরিমিত মাপে ডালের গাঁইটের নীচে কাটিয়াই নিকটবর্ত্তী হাপোরে রোপণ করিয়া দিবে। কর্ত্তিত ডালের দুই অঙ্গুলি পরিমিত মাটিতে পুঁতিবে। প্রত্যেক ডাল তিন চারি অঙ্গুলি ব্যবধান করিয়া রোপণ করাই ভাল। গাছের নিকট হাপোর করিয়া শীঘ্র ডাল পুঁতিবার তাৎপর্য্য এই যে ডাল কাটিলে কর্ত্তিত স্থান হইতে যে আঠা বা রস নির্গত হয়, তাহা পরে ডাল পুঁতিবার সময় সেই রসে কিয়ৎ পরিমাণে মৃত্তিকা সংলগ্ন হইয়া থাকে, এই মৃত্তিকা সংলগ্ন মুখ হইতে শীঘ্র শিকড় নির্গত হয়। যদি হাপোর দূরে হয়, তবে ডাল কাটিয়া পূর্ব্বোক্ত রীতি অনুসারে যত

সত্বরে পার তাহা পুঁতিতে হইবে। অনন্তর সরু বোমায় করিয়া দুই এক দিন অন্তর ঐ রোপিত ডালে অল্প পরিমাণে জল দিতে হইবে। জল এত অল্প পরিমাণে দিতে হইবে সেই জলে যেন গাছ ভিজিয়া তাহার গাত্র নিঃসৃত জল দ্বারা মূলের মৃত্তিকা সরস থাকিতে পারে। যখন ডালের পূর্ব্ব পত্র সকল শুষ্ক হইয়া মাটিতে ঝরিয়া পড়িতে আরম্ভ হইবে, তখন ঐ পতিত পত্র সকল হাপোর হইতে বাছিয়া ফেলা আবশ্যক। কারণ ঐ সকল পাতা পড়িয়া থাকিলে, পাতাব নিম্ন স্থানের মৃত্তিকায় ভালরূপ রৌদ্র, বাতাস এবং জল না পাওয়াতে গাছের অপকার করিতে পারে। পূর্ব্ব পত্র সকল ঝরিয়া পড়িলে, ডালের গাঁইট হইতে নূতন নূতন অঙ্কুর নির্গত হইতে থাকিবে। যে সকল ডাল শুষ্ক হইয়া মরিবার উপক্রম হয়, তাহাদিগকে তুলিয়া ফেলা উচিত। উক্ত ডাল তুলিবার সময় যেন অন্য গাছ না নড়ে এরূপ হিসাবে তুলিতে হইবে। ১৫ দিন পরে গাছে আর জল না দিলে কোন ক্ষতি হয় না। পাতলা নিড়ানী দ্বারা মধ্যে মধ্যে হাপোর খুঁড়িয়া দেওয়া উচিত। কারণ গাছের গোড়ায় মাটি আল্‌গা থাকিলে, শিকড় সকল স্বাধীন ভাবে চারি দিকে বিস্তৃত হইতে পারে। মালীরা সর্ব্বদাই বলিয়া থাকে. "এক দিনের খুঁড়িয়া দেওয়া সাত দিন জল দেওয়ার সমান।"

যখন দেখিবে রোপিত ডাল হইতে অনেকগুলি ফেঁকড়ী বাহির হইয়া নূতন নূতন পত্রে শোভিত চারা গাছের ন্যায় ডাল সমূহ পরিণত হইয়াছে, তখন তদ্ সমুদায় তুলিয়া পূর্ব্বোক্ত ক্ষেত্রে রোপণ করিয়া দিবে। হাপোর হইতে যে দিন চারা তুলিবে, তাহার পূর্ব্ব দিন উত্তম করিয়া হাপোর ভিজাইয়া রাখা উচিত। কারণ হাপোরের মাটি ভিজা থাকিলে অনায়াসেই শিকড় সমেত গাছ উঠিবে, শিকড় ছিঁড়িয়া যাইবার কোন সম্ভাবনা থাকিবে না। গাছ তুলিয়া উহা ২৪ ঘণ্টা ছায়ায় রাখিয়া পর দিন রোপণ করা ভাল। কিছুদিন অতীত হইলে এই সকল গাছ হইতে বহুতর শাখা বাহির হইয়া পুষ্পোদ্‌গম হইতে আরম্ভ হইবে। শাখার সংখ্যা অল্প হইলে প্রথমে যে সকল শাখা নির্গত হইবে তাহার কিয়দংশ কাটিয়া দিলে সেই শাখার গাত্র হইতে বিস্তর শাখা প্রশাখা বহির্গত

হইয়া প্রচুর পুষ্প হইতে থাকিবে। যে সকল শাখায় আর ফুল ফুটিবার সম্ভব থাকিবে না মধ্যে মধ্যে তদ্ সমুদায় কাটিয়া দিলে ভাল হয়। হাপোর হইতে চারা তুলিয়া টবে বসাইলেও চলিতে পারে। কিন্তু টব যত বড় হয় গাছের পক্ষে ততই সুবিধা। টবের গাছ সর্ব্বদা যত্নে রাখিতে হয়।

যে সকল ভাল ভাল গোলাপ কলম বাঁধিতে হয়, তাহাদিগের ডাল কাটিয়া পূর্ব্বোক্ত নিয়মে রোপণ করার কোন প্রয়োজন করে না। জায়গেণ্টিক নামক সামান্য জাতীয় গোলাপের ডাল কাটিয়া পূর্ব্বোল্লিখিত নিয়মানুসারে হাপোরে রোপণ করিতে হইবে। হাপোরে গাছ প্রস্তুত হইলে সেই সকল গাছ তুলিয়া ভাল ভাল গোলাপের ডালে জোড় কলম বাঁধিতে হইবে। এই সকল কলমের গাছে উৎকৃষ্ট ফুল হইয়া থাকে।

জোড় কলম———যে সকল গাছে কলম বাঁধিতে হইবে, সেই সকল গাছের ডালগুলি যে দিকে লম্বিত থাকে, সেই দিকে ধীরে ধীরে মাটিতে শোয়াইতে হইবে। ডাল মাটিতে পড়িয়া গেলে, ঐ ডালের মধ্য ভাগ আঁকুড়সির ন্যায় গাঁইট বিশিষ্ট ছোট ছোট কঞ্চির কাটিতে-আবদ্ধ করিয়া মাটিতে ফেলিয়া রাখিতে হইবে। কঞ্চির ছোট ছোট কাটির আঁকুড়সির ন্যায় গাঁইটে ঐ ডাল বদ্ধ করিয়া কাটিটী মাটিতে পুঁতিয়া দিলেই ডাল পতিত থাকিবে। অনন্তর হাপোর হইতে জায়গেণ্টিকের চারা তুলিয়া আনিয়া এই পাতিত ডালের গাত্র হইতে যে সকল নূতন শাখা নির্গত হয়, তাহার নিকট পুঁতিতে হইবে। প্রত্যেক ডালের নিকট এক একটী চারা রোপণ করা আবশ্যক। পরে ঐ নূতন ডালের মধ্য স্থল হইতে দুই ইঞ্চ পরিমিত স্থান এবং জায়গেণ্টিকের মধ্য ভাগ হইতে ঐ পরিমিত স্থান অর্দ্ধেক ছুলিয়া পরস্পর বাঁধিয়া দিতে হইবে। মুল গাছে এবং কলম বাঁধা চারায় নিয়মিত রূপে জল দেওয়া উচিত। এই রূপে কিছুদিন কলম বাঁধা থাকিলে গাছ তৈয়ার হইয়া উঠে। গাছ প্রস্তুত হইলে কলম বাঁধা ডালেব বন্ধনের নীচে এবং জায়গেণ্টিকের জোড় বাঁধার উপরে কলম ছেয়া করিয়া কাটিয়া পূর্ব্বোক্ত গোলাপ ক্ষেত্রে রোপণ করিলেই কলমের গাছ প্রস্তুত করা হইল। এই প্রণালীতে গাছ বোপণ করিলেই উৎকৃষ্ট গোলাপ হইয়া থাকে।

সরিষা।

আমাদের দেশে কয়েকজাতীয় সরিষা দেখিতে পাওয়া যায়; তন্মধ্যে রাই, শ্বেতী, ও কাজলী প্রধান। কাজলী আবার দেশী ও ঝুনী দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন সরিষার চাস হইয়া থাকে। এই শস্য প্রায় সকল প্রকার মৃত্তিকাতেই জন্মিতে পারে। আশু ধান্যাদির আবাদ উঠিয়া যাইবার পরে ভূমি কর্ষণ করিয়া রাখিতে হয়। অনন্তর সরিষা বুনিবার সময় উপস্থিত হইলে, অর্থাৎ অশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসের মধ্যে পুনরায় ভূমি উত্তম করিয়া লাঙ্গল দিতে হইবে, লাঙ্গল দেওয়া হইলে মই দ্বারা মাটি চারাইয়া সরিষা বপণ করিতে হয়। প্রত্যেক বিঘায় দেড় সেরের অধিক বীজ ফেলিবার আবশ্যক করে না। বীজ অধিক পরিমাণে বুনিলে চারা ঘন হইয়া গাছ সকল নিস্তেজ এবং অধিক শস্য প্রদানে অসমর্থ হয়।

অন্যান্য শস্যের ন্যায় সরিষা ক্ষেত্রেও উপযুক্ত সার দেওয়া আবশ্যক। মৃত্তিকা ভেদে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন সার দেওয়া উচিত। ক্ষেত্রের মৃত্তিকা আটালিয়া মাটি বিশিষ্ট হইলে গোময়, খোইল ও ছাই, এবং বেলিয়া মাটি হইলে, কেবল গোময় ও খোইল দিলেই হইতে পারে। ভূমি নির্ব্বাচন দোষে অনেক ক্ষেত্রে ভালরূপ শস্য হইতে দেখা যায় না। ঝুনি সরিষা দো আঁশ বা আটালিয়া জমিতে ভাল হয় না। এজন্য দো আঁশ, বেলে, ও আটালিয়া মৃত্তিকায় দেশী সরিষা বপণ করা উচিত। সরিসার ফুল ও ফল প্রসবের সময় দুইবার ভূমিতে জল সেচিয়া দেওয়া আবশ্যক। এই দুই সময় ক্ষেত্রে জল না দিলে শস্য পরিপুষ্ট ও সরস হয় না।

সরিষা পাকিয়া উঠিলে উহা কাটিতে হইবে। প্রথমতঃ গাছ সকল কাটিয়া একস্থানে গাদা দিতে হইবে। অনন্তর উহা রৌদ্রে দিয়া শুষ্ক হইলে বীজ পৃথক করিয়া লইতে হইবে।

সরিষার চাসে লাভ নিতান্ত কম নহে। ভাল জমি নির্ব্বাচন এবং

যদি উপযুক্ত পাইট করা যায় তবে বিঘা প্রতি ১০।১৫, টাকা অনায়াসেই লাভ হইতে পারে। সরিষার ফুলের অবস্থায় বৃষ্টি হইলে, এক প্রকার পোকা হইয়া শস্যের বিশেষ অনিষ্ট করিয়া থাকে। সরিষা আমাদের যে রূপ নিত্য ব্যবহারে লাগিয়া থাকে, দেশ মধ্যে যতই ইহার চাষ বৃদ্ধি হয় ততই মঙ্গল।

বাবলা।

দেশ মধ্যে দিন দিন জ্বালানী কাষ্ঠের অত্যন্ত অভাব হইয়া উঠিতেছে, এই সময় জ্বালানী কাষ্ঠের উপযোগী বৃক্ষ রোপণ করিলে সুন্দর লাভ হইতে পারে। অন্যান্য দ্রব্যের সহিত কাষ্ঠও দিন দিন দুর্ম্মূল্য হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আম, কাঁঠালের গাছ জ্বালানিতে ব্যবহার করিলে, বিশেষ লাভ হয় না; কারণ ঐ সকল গাছ অসময়ে কাটিলে ফল হানি, এবং গড়ন কার্য্যের উপযুক্ত না হওয়াতে লাভও কমিয়া আইসে। বাবলার গাছ প্রস্তুত করিতে পারিলে, ঐ অভাব পরিপূর্ণ হইতে পারে।

বাবলার গাছ করিতে কিছুই ব্যয় হয় না। সামান্য যত্ন করিলেই অনায়াসে গাছ তৈয়ার হইতে পারে। বাবলার গাছের একটী গুণ এই যে উহা আম, কাঁঠাল কিম্বা বট অশ্বত্থের ন্যায় অধিক স্থান ব্যপিয়া থাকে না এবং ইহার শাখা প্রশাখা আওতা করিয়া অন্যান্য শস্যের পক্ষে বিশেষ হানি করে না। ক্ষেত্রের মধ্যস্থলে গাছ রোপণ না করিয়া, ক্ষেত্রের চতুঃসীমায় গাছ করিলেই উত্তম হয়। অল্প সময়ের মধ্যে বাবলার গাছ বিক্রয়োপযোগী হইয়া উঠে। জ্বালানী ভিন্ন গোরুর গাড়ীর চাকা করিতেও বাবলার সমধিক আদর দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে যে গাছ এক টাকা মূল্যে বিক্রয় হইত, এক্ষণে সেই গাছ চারি পাঁচ টাকায় বিক্রীত হইয়া থাকে।

আমাদের দেশে যে কয়েক জাতীয় বাবলা আছে, সকল গুলি দ্বারা

উক্ত কার্য্য সমূহ নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। আরব প্রভৃতি দেশীয় বাবলার আঠায় উৎকৃষ্ট গঁদ প্রস্তুত হয়। গঁদ নানা প্রকার কার্য্যে ব্যবহৃত হয় বলিয়া তাহা একটী পণ্য মধ্যে পরিগণিত হইয়া উঠিয়াছে।

বাবলার গাছ প্রস্তুত করা যে অতি সহজ তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। বাবলার সুপক্ক বীজ অপেক্ষা অর্দ্ধ পক্ক বীজে উত্তম চারা হইয়া থাকে। কেহ কেহ বীজ ছড়াইয়া চারা করিয়া থাকেন, কেহ কেহ আবার বীজ পাতো দিয়া চারা প্রস্তুত হইলে ক্ষেত্রে রোপণ করিয়া থাকেন। বাবলার অর্দ্ধপক্ক বীজ গোবর মাখাইয়া ক্ষেত্রে ছড়াইয়া দিলেই গাছ হইতে পারে। আর পাতো দিতে হইলে প্রথমতঃ বীজ সকল গোবর মাখাইয়া একটী স্থানে হাপোর করিয়া পাতো দিতে হয়, হাপোরে মধ্যে মধ্যে জল দিলে চারার উপকার হইতে পারে। হাপোরে ২।৩ হস্ত পরিমিত চারা হইলে ঐ সকল চারা ক্ষেত্রের চারি ধারে লাইন করিয়া রোপণ করিয়া দিলে ৩।৪ বৎসরের মধ্যেই গাছ হইয়া উঠে। অন্যান্য গাছের ন্যায় বাবলার বিশেষ কোন পাইট করিতে হয় না।

আদা।

আদা দুই জাতীয় আম আদা ও ঝাল আদা। আম আদা গন্ধের জন্য প্রসিদ্ধ। ইহাতে অন্নাদি রন্ধন করিলে অতি উপাদেয় হয়। ঝাল আদা অনেক তরকারিতে ব্যবহার হইয়া থাকে; কিন্তু রন্ধন কার্য্য অপেক্ষা ঔষধে অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়, এজন্য আদার মূল্য অধিক হইয়া উঠিয়াছে। এক বিঘা আদার আবাদ করিলে খরচ বাদে অন্যূন ৭০।৭৫ টাকা লাভ হইতে পারে। এরূপ লাভজনক কৃষি পরিত্যাগ করিয়া চাকুরীর জন্য লালায়িত হওয়া আক্ষেপের বিষয়। সামান্য উদরান্নের নিমিত্ত আজন্ম দাসত্ব বৃত্তি করা অপেক্ষা এই সকল লাভজনক কৃষি অবলম্বন করা সহস্র গুণে শ্রেয়। একজন গৃহস্থ ৮।১০ বিঘা আদার চাস করিতে পারিলে

তিনি স্বচ্ছন্দে স্বাধীনতা সুখের সহিত পরিবার প্রতিপালন করিতে পারেন। মৃত্তিকার প্রত্যেক রেণুতে যে সুখ ও অর্থের বীজ নিহিত আছে, তাহা সকলেরই মনে রাখা উচিত।

অল্প নিম্ন ভূমিতে আদা ভাল হইয়া থাকে, আদার আবাদ করিতে হইলে, প্রথমে উত্তম করিয়া জমি কোদ্‌লাইতে হয়, এবং চৈত্র কিম্বা বৈশাখ মাসের মধ্যে জল হইলে, ঐ ভূমিতে লাঙ্গল ও মই দিয়া বীজ রোপণের উপযুক্ত করিতে হয়। আদা, হলুদ, পলাণ্ডু প্রভৃতির মূলে বীজের কাজ হইয়া থাকে। জমি প্রস্তুত হইলে, আধ হাত ব্যবধান করিয়া লাইন অনুসারে আদা রোপণ করিতে হয়। বীজ হইতে গাছ হইলে উভয় পার্শ্ব হইতে মাটি কাটিয়া গাছের গোড়ায় দেওয়া কর্ত্তব্য। বর্ষার সময় ক্ষেতে ঘাস হইলে তাহা নিড়াইয়া দেওয়া উচিত। ক্ষেতের চারিদিকে ভাল করিয়া ঘেরা না থাকিলে, ঘাসের লোভে গবাদি পশু ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া আদার গাছের বিস্তর অপকার করিতে পারে। এজন্য সে পক্ষে সতর্ক থাকা আবশ্যক।

শীতের প্রারম্ভে অর্থাৎ কার্ত্তিকের শেষ অগ্রহায়ণ মাসে যখন দেখিবে গাছ শুকাইতে আরম্ভ হইয়াছে, তখন মৃত্তিকা হইতে আদা তুলিতে আরম্ভ করিবে। হলুদ ও আদার চাস প্রায় একই রকম। আদা তুলিয়া রাখিলে তাহা শুষ্ক হইলে উহাকে সুঁট কহিয়া থাকে। বৈদ্য শাস্ত্রে সুঁট একটী প্রধান ঔষধ। আদা কিম্বা সুঁট উভয় অবস্থাতেই ঔষধের কার্য্য হইয়া থাকে।

অনেক গৃহস্থের বাড়ীতে দুই এক ঝাড় আদার গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। বাড়ীতে দুই এক ঝাড় আদার গাছ থাকিলে তদ্দ্বারা রন্ধন কার্য্যের অনেক সুবিধা হইতে পারে।

আদার ন্যায় আম আদারও চাস করিতে হয়। ফাল্গুন হইতে আষাঢ় মাসের মধ্যে উহার মূল রোপণ করিলে চলিতে পারে। অন্যান্য পাইট আদার চাসের ন্যায় করিতে হয়। সুতরাং তাহা আর উল্লেখ করার কোন প্রয়োজন নাই।

শাক আলু ।

সকল প্রকার মৃত্তিকায় এই আলু ভাল হয় না। বেলে মাটিতে শাক আলু উত্তম জন্মিয়া থাকে। বেলে মাটির বিশেষ গুণ এই যে উহা অন্যান্য মৃত্তিকার ন্যায় কঠিন নহে। বৃক্ষ লতাদির মূল সকল এই মাটিতে সহজেই বিস্তৃত হইতে পারে। এজন্য মূল বৃদ্ধি—শীল অর্থাৎ ওল, কচু, আলু প্রভৃতি বেলে মাটিতে রোপণ করিয়া থাকে। আলুর ক্ষেতে মধ্যে মধ্যে জল দেওয়া আবশ্যক। কারণ মৃত্তিকা সরস থাকিলে উহার রস গ্রহণ করিয়া মূল শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া উঠিতে পারে। আলুর জমি প্রস্তুত করিতে হইলে, মৃত্তিকা অধিক গভীর করিয়া খুঁড়িয়া দেওয়া উচিত। মাটি আল্‌গা হইলে আলু গা মেলিতে পারে। মাটি তৈয়ার হইলে, ক্ষেতে পটি বাঁধিতে হয়, সচরাচর ১০। ১৫ অঙ্গুল অন্তর আলি প্রস্তুত করিয়া ঐ পরিমিত স্থান ব্যবধানে আলুর বীজ রোপণ করিলে ভাল হয়। কেহ কেহ বাগানে আড়ের গায়ে আলুর গাছ তুলিয়া দিয়া থাকেন। কিন্তু মাটিতে গাছ লতাইয়া বেড়াইলেও কোন বিশেষ ক্ষতি হয় না। বৈশাখ হইতে আষাঢ় মাসের মধ্যে শাক আলু রোপণের সময়।

মান কচু ।

এদেশে যে কয়েক প্রকার কচু দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে মানকচু সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ওলের ন্যায় এই কচুও তরকারীর জন্য ব্যবহার হইয়া থাকে। শীতকালের মানকচু অতি সুস্বাদু হয়। এই সময় কচুতে আঁশ থাকে না, রন্ধন করিলে মোমের ন্যায় আঠাযুক্ত হইয়া থাকে। পৌষ মাঘ মাসের কচুই উৎকৃষ্ট।

সারবিরা থিবিটা,	Cerbera theveta.
সিনেমন জেপনিকা,	Cinnamon Japonica.
গুলাল চাঁপা,	Goolal Champa.
গোয়াটেরিয়া লঙ্গিফোলিয়া,	Guateria longifolia.
বালানাইটেস ইণ্ডিকা,	Balanites Indica.
ওকনা ইস্কোয়ারোসা,	Ochna Squarosa.
জোনসিয়া অসোকা,	Jonesia Asoca.
মিমিসিলন টিংটোরিয়া,	Memecylon tinctoria.
পুন্নাগ চাঁপা,	Punnag Champa.
সেণ্ডাল উড, হোয়াইট,	Sandal wood, white.
নটকান,	Nutcan.
টারমেনেলিয়া কেটেপা	Terminalia Catapa.
ঐ চিবলা,	Do. Cheebula.
তেজপাত,	Tezpath.
ইকসোরা জবা	Ixora Java.
কেসুরিনা মিউরিকেটা,	Casurina Muricata.
টিকোমা ইষ্টান্স,	Tecoma Stans.

নিউ গ্রানেডা ধান।

আমেরিকা মহাদেশের মধ্যে নিউ গ্রানেডা নামে একটী দেশ আছে, ঐ দেশে এক রকম ধান জন্মে, তাহাকে নিউ গ্রানেডা ধান নামে উল্লেখ করা গেল। ঐ ধানের বিশেষ গুণ এই যে, ইহার এক বার চাস করিলে এক গাছে তিন চারি-বার ফসল পাওয়া যায়। এই ধান্যে বেশী জল সেচন করিতে হয় না এবং ইহার চাসে বেশী পরিশ্রমও লাগে না। ভারতবর্ষের শুষ্ক বালিয়া কিম্বা কাঁকরিয়া পাহাড়ী জমি অথবা উচ্চ ডেঙ্গা ভূমিতে এই ধান খুব ভাল জন্মিতে পারে। সাহেবেরা, এদেশে ঐ ধান জন্মিতে পারে কি না, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য কয়েক বার চাস করিয়া ছিলেন। প্রথম প্রথম গাছের স্বভাব বুঝিতে না পারিয়া অর্থাৎ কিরূপ জমিতে চাস করিতে হইবে, কিরূপ

কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে মানকচু রোপণ করিলে ভাল হয়। কেহ কেহ বর্ষার পূর্ব্বেও রোপণ করিয়া থাকে। দোআঁশ মৃত্তিকায় যেমন উৎকৃষ্ট কচু হইয়া থাকে, অন্য মাটিতে সেরূপ হয় না। সেঁতা কিম্বা ছায়াযুক্ত স্থানে উহার চাস করা উচিত নহে। মাটি যত খুঁড়া হয় অথবা পুষ্করিণীর তোলা মাটিতে রোপণ করিলে অতি বৃহৎ কচু হইয়া থাকে। এক কিম্বা দেড় হাত অন্তর সারি করিয়া কচু পোঁতা উচিত। পুঁতিবার সময় মাইজ ডাঁটাটী রাখিয়া অবশিষ্ট গুলি কাটিয়া রোপণ করিলে ভাল হয়। অন্যান্য সার অপেক্ষা গাছের গোড়ায় ছাই দিলে শীঘ্র শীঘ্র গাছ বাড়িয়া উঠে, গাছের বৃদ্ধির সহিত মূলও বড় হইতে থাকে। এক বৎসরের মধ্যেই কচু খাদ্যের উপর্যুক্ত হয়। কিন্তু আকার তত বড় হয় না। কোন কোন কচুর গাছ ফুলিয়া ফুল ধরিয়া থাকে। গাছ ফুলিয়া ফুল ধরিলে অনেকে অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া থাকেন, কিন্তু কচুর ফুলের সহিত মনুষ্যের বিপদের কোন সংশ্রব দেখিতে পাওয়া যায় না। ফলতঃ এই বিশ্বাসটী যে নিতান্ত কুসংস্কার—মূলক তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

লাউ।

লাউ তরকারীর জন্য প্রসিদ্ধ। এক একটী গাছে বিস্তর ফল ধরিয়া থাকে। লাউ আমনে ও আউশে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; শীত কালে যে লাউ জন্মে তাহাকে আমনে ও গ্রীষ্মকালে যাহা জন্মে তাহাকে আউশে কহে। এই সকল লাউয়ের মধ্যে লম্বা গোল প্রভৃতি আকার ও রং ভেদে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। তরকারি ভিন্ন তানপুরা প্রভৃতি বাদ্য যন্ত্রের জন্য উহার সমধিক আদর দেখিতে পাওয়া যায়। কাশী অঞ্চলে কমণ্ডুর নিমিত্ত অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গাছের সুন্দর রূপ পাইট করিতে পারিলে লাউয়ের অতি বৃহৎ আকার করিতে পারা যায়।

কলায়ের সহিত লাউ সিদ্ধ করিয়া খাওয়াইলে গাভীর দুগ্ধ অধিক হয়। ফলতঃ লাউ নানা কার্য্যে লাগিয়া থাকে।

বীজ রক্ষণ——গাছের সুপরিণত লাউ বীজের জন্য রাখিতে হয়। যতদিন গাছ থাকিবে, ততদিন উহা গাছে রাখা উচিত। গাছ মরিতে আরম্ভ হইলে তখন সেই বীজ লাউ তুলিতে হইবে। লাউ হইতে বীচি বাহির করিয়া না রাখিলে পোকা ধরিয়া তাহা নষ্ট হইতে পারে। এজন্য বীচি বাহির করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। বীচি বাহির করিতে হইলে, ঐ বীজ লাউয়ের মুখ কাটিয়া সেই মুখে গোবর পূর্ণ করিয়া রাখিতে হয়। গোবর দিয়া রাখিলে লাউ মধ্যস্থ কঠিন অংশ পচিয়া উঠে, এবং তাহা হইতে সহজে বীচি বাহির করিতে পারা যায়। অনন্তর ঐ বীচি রৌদ্রে শুকাইয়া বোতলে তুলিয়া রাখিবে।

রোপণ প্রণালী——আমনে লাউ কার্ত্তিক মাসের শেষে অথবা অগ্রহায়ণের প্রথমে রোপণ করা উচিত। এটেল মাটিতে লাউ ভাল হইয়া থাকে। এজন্য গৃহস্থের বাড়ীর গাছ অপেক্ষা মাঠের আবাদে গাছে অধিক লাউ ফলিয়া থাকে। লাউ বীজ অন্ততঃ চারি দিন ভিজাইয়া রাখা উচিত। এইরূপ দীর্ঘ সময় ভিজাইলে বীজ হইতে শীঘ্র অঙ্কুর নির্গত হয়। বীজ হইতে চারা বাহির হইয়া বাড়িতে আরম্ভ হইলে, কঞ্চি অথবা অন্য কোন ডাল পালায় গাছের ডগা তুলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। কেহ কেহ মাচায় গাছ তুলিয়া দিয়া থাকে, মাঠের গাছ প্রায় মাটিতে লতিয়া বেড়ায়। মধ্যে মধ্যে গাছের গোড়া খুঁড়িয়া জল দিলে ভাল হয়।

আউশে লাউ চাস আমনে লাউ চাসের ন্যায়। এই লাউ চৈত্র কিম্বা বৈশাখ মাসের মধ্যে রোপণ করিলে ভাল হয়।

কুমড়া।

কুমড়া দুই জাতি, দেশী ও বিলাতী। তরকারীর জন্য উভয় বিধ কুমড়ারই ব্যবহার হইয়া থাকে। রক্তপিত্ত প্রভৃতি কোন কোন উৎকট

রোগে দেশীয় কুমড়া ঔষধের কার্য্য করে। কুমড়া যত পুরাতন হয় ততই উপকারী। পুরাতন কুমড়ার মূল্য অধিক। কুমড়ার চাসে পরিশ্রম ও ব্যয় সামান্য। একটু যত্ন করিয়া গাছ লাগাইলে অনেক ফল ধরিয়া থাকে। কুমড়া বর্ষাকালে হইয়া থাকে, সুতরাং গাছে জল দেওয়ার কোন প্রয়োজন হয় না। কুমড়ার বীজ জলে না ভিজাইয়া রোপণ করিতে হয়। বীজ হইতে অঙ্কুর জন্মিলে গাছের ডগাগুলি মাচায় কিম্বা অন্য কোন আশ্রয়ে তুলিয়া দিতে হয়। কেহ কেহ গৃহের চালে ডগা তুলিয়া দিয়া থাকেন। তাহাতে ডগা সকল স্বাধীন ভাবে চারি দিকে বিস্তৃত হইতে পারে। ডগা যত অধিক বাড়িয়া বিস্তারিত হয়, গাছে তত অধিক পরিমাণে ফল ধরে। চালে গাছ তুলিয়া দিলে গাছের উপকার হয় বটে, কিন্তু বর্ষার জল বসিয়া চাল পচিয়া যাইতে পারে। এজন্য চালে গাছ না তুলিয়া মাচা করিয়া দেওয়া ভাল। বিলাতী কুমড়ার চাস দেশীয় কুমড়ার ন্যায়। দেশী কুমড়া অপেক্ষা বিলাতী কুমড়া অতি সুখাদ্য। দেশী কুমড়া পাকিলে তরকারীর অনুপযোগী হয়, তখন উহা দ্বারা অন্যান্য খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত হইতে পারে। বিলাতী কুমড়া দ্বারাও যদি অন্যান্য খাদ্য প্রস্তুত হয় না, কিন্তু পক্কাবস্থায় উহা ঘরে তুলিয়া রাখিলে অনেক দিন পর্য্যন্ত ব্যবহারযোগ্য থাকে।

জল সিঞ্চন।

মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি প্রাণিদিগের শারীরিক কার্য্য সম্পাদন জন্য জল যেমন প্রয়োজনীয়, উদ্ভিদদিগের পক্ষেও জল সেইরূপ আবশ্যকীয় পদার্থ। জল ব্যতীত উদ্ভিদ জীবিত থাকিতে পারে না। জল দ্বারা মৃত্তিকা সর্ব্বদা সরস থাকে, উদ্ভিদগণ মৃত্তিকা হইতে ঐ রস আকর্ষণ করিয়া জীবনধারণ করে। বৃক্ষ, লতা, গুল্ম প্রভৃতি উদ্ভিদ্‌দিগের শিকড় সকল মৃত্তিকার অভ্যন্তরে বিস্তৃত থাকে, ঐ সকল শিকড় সর্ব্বদাই মৃত্তিকার রস আকর্ষণ করিয়া বৃক্ষের শাখা, প্রশাখা, পত্র প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অংশে সঞ্চারিত করিয়া দেয়, তদ্দ্বারা শাখা প্রশাখাদি সমুদায় বৃক্ষ অঙ্গ

পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। আমাদের শরীরে যেমন অসংখ্য শিরা, ধমনী, কৈশিকা পথে রক্ত সর্ব্বশরীরে পরিচালিত হইতেছে, গর্ভস্থ শিশু যেমন জননীর দেহ হইতে শোণিত গ্রহণ করিয়া নিজ দেহ পোষণ করিয়া থাকে। বৃক্ষাদির পুষ্প ফলও সেইরূপ বৃক্ষের শরীরস্থ রস লইয়া পরিণত হয়। নীরস কঠিন মৃত্তিকায় কোন উদ্ভিদ্ রোপিত হইলে, অথবা মৃত্তিকা হইতে কোন উদ্ভিদের মূলোৎপাটন করিয়া তুলিয়া রাখিলে, ক্রমে ক্রমে যে তাহার ফল পুষ্প, পত্র, প্রশাখা, শাখা শুষ্ক হইয়া মরিতে থাকে, তাহার একমাত্র কারণ, রসগ্রহণ কার্য্যের অভাব। প্রকৃতির কেমন আশ্চর্য্য নিয়ম, বৃষ্টি, ও শিশির পাত দ্বারা মৃত্তিকা সর্ব্বদাই সিক্ত থাকে। উদ্ভিদগণ সেই সিক্ত ভূমির রস আকর্ষণ করিয়া বৃদ্ধি হইয়া উঠে। জলাশয়ের নিকটস্থ ক্ষেত্রের বৃক্ষ শস্যাদি যে তেজস্কর ও শ্রীবিশিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার কারণ মৃত্তিকা কৈশিকা—কর্ষণ দ্বারা ঐ জলাশয়ের জলগ্রহণ করিয়া উদ্ভিদদিগের দেহ পুষ্ট করিয়া দেয় এবং তত্রস্থ সজল বায়ু হইতে জলকণা লইয়া উদ্ভিদগণ জীবিত থাকে। ফলতঃ জলের উপর উদ্ভিদ্‌দিগের জীবন সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া রহিয়াছে, বলিয়াই সকল দেশে উদ্ভিদ ক্ষেত্রে জল সিঞ্চনের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। সকল মৃত্তিকায় এবং সকল উদ্ভিদে সমান জল সিঞ্চন আবশ্যক করে না। মৃত্তিকা ভেদে, উদ্ভিদ ভেদে ও ঋতু ভেদে ক্ষেত্রে জল দেওয়ার ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম অবলম্বিত হইয়া থাকে। ভারতের আর্য্য ঋষিগণ ক্ষেত্রে জল সিঞ্চন সম্বন্ধে যেরূপ ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাহা পাঠকবর্গের অবগতির জন্য এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

“ সায়ং প্রাতস্তু ঘর্ম্মন্তে শীতকালে দিনান্তরে।
বর্ষাতৌতু ভুবঃশোষে সেক্তব্যা রোপিতা দ্রুমা॥ ”

গ্রীষ্মকালে প্রতিদিন প্রাতে ও বৈকালে জল দেওয়া উচিত, বর্ষাকালে মৃত্তিকা সর্ব্বদা সিক্ত থাকে, সুতরাং সে সময় ক্ষেত্রে জল সিঞ্চনের কোন প্রয়োজন থাকে না, শীতকালে দিনান্তে একবার করিয়া জল দিলেই চলিতে পারে। উদ্ভিজ্জের গোড়ায় অধিক পরিমাণে জল সঞ্চিত হইলে, উদ্ভিদ মূল তাহা পূর্ব্বের ন্যায় আকর্ষণ করিতে অসমর্থ হয় এবং সেই জল

ক্রমে ক্রমে বৃক্ষাদিকে পচাইতে আরম্ভ করিয়া থাকে। এজন্য যে সময় সর্ব্বদা বৃষ্টি হয়, তখন ক্ষেত্রে জল দেওয়া স্থগিত রাখা কর্ত্তব্য। অপরিমিত আহার গ্রহণ যেমন প্রাণিদিগের পক্ষে নিসিদ্ধ বৃক্ষাদির পক্ষে অধিক জলও সেইরূপ। গাছের চারার অবস্থায় সর্ব্বদা (বর্ষা ব্যতীত) ক্ষেত্রে জল দেওয়া উচিত। কারণ চারার অবস্থায় উদ্ভিদ্দিগের নূতন পত্র বহু ছিদ্র বিশিষ্ট থাকে। সূর্য্যের উত্তাপে ঐ সকল ছিদ্র হইতে ঘর্ম্ম অর্থাৎ রস নির্গত হইয়া রসের পরিপাক কার্য্য সাধিত হয়। সুতরাং ঐ সময়ে গাছে জল না দিলে শীঘ্রই পত্রাদি সূর্য্য কিরণে শুষ্ক বা শ্রীহীন হইয়া যাইতে পারে। প্রখর রৌদ্রের সময় বৃক্ষাদিতে জল দেওয়া উচিত নহে। অপরাহ্নে বায়ু শীতল হইলে বৃক্ষ মূলে জল দেওয়া কর্ত্তব্য। শস্য ক্ষেত্র প্রভৃতিতে নালা কাটিয়া জল দিলে বিশেষ উপকার হইতে পারে, নালা কাটিয়া জল দেওয়ার ব্যবস্থা করিলে প্রচুর জলে মৃত্তিকা সিক্ত হইতে পারে এবং জল প্লাবনে ক্ষেত্রস্থ কীটাদি বিনষ্ট হইয়া যায়। চারা গাছে কলসীতে করিয়া জল ঢালিয়া দেওয়া উচিত নহে, কারণ অধিক পরিমাণে জল পড়িয়া কোমল চারা হেলিয়া পড়িতে পারে এবং জল প্রবাহে চারার মূলের মৃত্তিকা আল্‌গা হইয়া শিকড় বাহির হইবার সম্ভব। পুষ্প ও মুকুলোদ্‌গমের সময় বৃক্ষ মূলে জল দিলে রসগ্রহণ করিয়া পুষ্পাদি সত্বর বিকাসিত হইয়া উঠে। যে সকল গামলার তলায় ছিদ্র থাকে, তাহাতেই বৃক্ষাদি রোপণ করা কর্ত্তব্য, কারণ ছিদ্র না থাকিলে গামলায় জল সঞ্চিত হইয়া বৃক্ষ পচিয়া যাইতে পারে।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে সকল মৃত্তিকায় এবং সকল উদ্ভিদে সমান জল আবশ্যক করে না। কোন কোন মৃত্তিকায় আদৌ জল না দিলে চলিতে পারে। নদীর চর ভূমি যাহা বন্যার জল প্লাবনে ডুবিয়া যায় এবং ঐ জল মরিতে আরম্ভ হইলে যে পলি পড়ে সেই কর্দ্দমময় স্থানে যে সকল শস্যাদি বপণ করা যায়, তাহাতে জল না দিলে কোন অনিষ্ট হয় না। কলার গাছ যে ক্ষেত্রে রোপণ করা হইয়া থাকে, সেই ক্ষেত্রে বা ঐ গাছে জল দেওয়ার কোন আবশ্যকতা নাই। ফলতঃ ভূমি ও বৃক্ষাদি ভেদে জল দেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত।

জলী ধান।

জেলা নদীয়ার অন্তর্গত বনগ্রাম সবডিবিজনে যে নিয়মে জলী ধানের আবাদ হইয়া থাকে, তাহা এস্থলে উল্লিখিত হইল।

জলী ধানের ভূমিতে বৎসরের মধ্যে তিন বার ফসল গৃহীত হইয়া থাকে। বনগ্রামে যমুনা নদী প্রবাহিত। এই নদীর তটে এই ধানের চাস হইয়া থাকে। নদীর তীরস্থ ভূমিতে চাস দিয়া ফাল্গুনের শেষে অথবা চৈত্র মাসের প্রথমে ধান বপন করিতে হয়। এক বিঘা ভূমিতে দশসের আউশ (আশুধান্য) এবং পাঁচ সের আমন ধান একত্রে মিশাইয়া অন্যান্য ধান্যের ন্যায় জমিতে বীজ ছড়াইতে হয। বীজ অঙ্কুরিত হইলে বিদা ও মই দিয়া শস্যের পাইট করা উচিত। জমি এই রূপে পাইট করিয়া রাখিলে বৈশাখ মাসে আউশ ধান পাকিয়া উঠিবে। ধান পাকিলে উহা কাটিয়া লইতে হইবে। জমির ধান কাটা হইলে, যখন দেখিবে বৃষ্টি কিম্বা বন্যার জলে ক্ষেত্র সিক্ত অথবা কিয়ৎ পরিমাণে জলে ডুবিয়া গিয়াছে, তখন একবার মই দিবে। এই সময়ে ক্ষেত্রে মই দিলে পূর্ব্ব ফসলের অর্থাৎ আউশ ধানের যে সকল গোড়া উন্নত হইয়াছিল, তদ সমুদয় পতিত হইয়া কর্দ্দমের সহিত সংলগ্ন হইয়া যাইবে। মৃত্তিকা সংলগ্ন গোড়া সকল কিছু দিন পরে সার রূপে পরিণত হইয়া আমন ধানের বিশেষ উপকার সাধন করিবে। এই মই দেওয়ার কিছু দিন পরে দেখিতে পাইবে, আমন ধানের যে সকল বীজ ক্ষেত্রে বপণ করা হইয়াছিল, তাহা অঙ্কুরিত হইতে থাকিবে। ধান অঙ্কুরিত হইলে তাহার আর কোন পাইট আবশ্যক করিবে না। কিছু দিন পরে ঐ সকল অঙ্কুর এক একটী বড় বড় ঝাড় হইয়া উঠিবে। অনন্তর ভাদ্র মাসের শেষে ক্ষেত্রের ধান পাকিয়া উঠিলে তখন তাহা কাটিয়া লইবে।

কার্ত্তিক মাসে বন্যার জল মরিতে আরম্ভ হইলে, জমিতে যে পলি পাড়িবে, তাহাতে খেঁসারি বা মসুরি বপণ করিলে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইতে পারে। ঐ শস্যে কোন প্রকার পাইট আবশ্যক হয় না। ফাল্গুন

মাসে শস্য পাকিয়া উঠিলে তখন তাহা কাটিয়া লইবে। যে সকল প্রদেশে নদীর তীরস্থ এই রূপ জমি আছে, সেই সকল স্থানে এই জলী ধানের চাস আরম্ভ হইলে বিস্তর লাভ হইতে পারে। এই কৃষিতে বৎসরে তিন বার ফসল লইতে পারা যায়, অথচ পাইট প্রভৃতির জন্য খরচ অধিক পড়ে না। এরূপ লাভজনক আবাদে কৃষক মাত্রেরই মনোযোগী হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

সুপারি।

"সাত নাড়াতে গুও
কাঁঠাল নাড়ায় ভুও।"

ফলের মধ্যে সুপারি নিত্য ব্যবহার্য্য। ইহা বিক্রয় দ্বারা বিলক্ষণ লাভ হইতে পারে। নারিকেল গাছের ন্যায় প্রায় বার মাসেই সুপারি গাছে ফলিয়া থাকে। লোনা মাটিতে ইহার আবাদ ভাল হয়। সুপারি গাছ দেখিতে অতি সুশ্রী। সরল গাছ গুলি শ্রেণী বদ্ধ করিয়া রোপিত হইতে উদ্যানেব অত্যন্ত শোভা হয়। অনেকে সখ করিয়া উদ্যানে এই গাছ রোপণ করিয়া থাকেন। উদ্যানের মধ্যে যে সকল পথ থাকে তাহার উভয় পার্শ্বে শ্রেণী বদ্ধ পাদপ সকল দেখিতে অতি মনোহর। সুপারি গাছ যে কেবল উদ্যানের শোভা করিয়া থাকে এরূপ নহে; ফল বিতরণ দ্বারা উদ্যান স্বামীর বিস্তর লাভ করিয়া দিতেও বিমুখ থাকে না। প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতে গুটিকতক সুপারি গাছ থাকিলে সুপারির জন্য আর অর্থ ব্যয় করিতে হয় না।

লোনা এটেল মাটিতেই সুপারি ভাল হইয়া থাকে। সুপারির চারা করিতে হইলে প্রথমতঃ বীজ রক্ষা করিতে হয়। বীজের দোষে সকল গাছে সমান ফল ধরে না। এজন্য বীজ সম্বন্ধে একটু মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। আশ্বিন, কার্ত্তিক অথবা অগ্রহায়ণ মাসে গাছ হইতে পাকা

সুপারি পাড়িয়া গৃহ মধ্যে শীতল স্থানে রাখিতে হয়। ঐ স্থানে যেন সর্ব্বদা বাতাস লাগিতে পায়। মেজেতে মাটির উপর রাখিলে, সেঁতার জন্য বীজ নষ্ট হইতে পারে, এই নিমিত্ত কোন পাত্রের উপর বিছাইয়া রাখা উচিত।

সুপারির চারা প্রস্তুত করিতে হইলে, প্রথমতঃ অন্যূন এক হস্ত পরিমিত গভীর একটী গর্ত্ত করিতে হইবে, অনন্তর ঐ গর্ত্তে এক একটী সুপারি বোঁটা উপর দিকে করিয়া বসাইতে হইবে। বীজের পরিমানানুসারে গর্ত্ত ছোট বড় করা আবশ্যক। গর্ত্তে সুপারি বসান হইলে তাহার উপর অল্প পরিমাণে বালি ছড়াইয়া দিতে হইবে, বালি এরূপ পরিমাণে দিতে হইবে, যে তদ্দারা সুপারির পাশের ফাক বুঁজিয়া গিয়া প্রত্যেক সুপারির উপরে যেন আচ্ছাদিত হইতে পারে। এইরূপে স্তবকে স্তবকে, সুপারি বসাইতে হইবে। উপরের স্তবকে অল্প পরিমাণে খড় বিছাইয়া তদুপরি পূর্ব্বের ন্যায় বালি দিয়া ঢাকিয়া দিতে হইবে। এক একটী গর্ত্তে ৪।৫ স্তবকের অধিক বসান উচিত নহে। সুপারি বসান শেষ হইলে, জল দিয়া সেই গর্ত্তটী পূর্ণ করিয়া দিতে হইবে। গর্ত্তের জল শুকাইলে প্রয়োজন বুঝিয়া মধ্যে মধ্যে তাহাতে জল দেওয়া আবশ্যক। সচরাচর দেড় মাসের মধ্যেই সুপারি অঙ্কুরিত হইতে দেখা যায়। অঙ্কুর ৩।৪ অঙ্গুল বড় হইলে, অন্য স্থানে বেলে মাটিতে হাপোর করিতে হইবে। এই হাপোরও চারার সংখ্যানুসারে পরিমাণ স্থির করা আবশ্যক। হাপোরের মাটি উত্তম করিয়া খুঁড়িয়া তাহাতে সার দিতে হইবে। হাপোর মধ্যে ইঁটের কুচি কিম্বা গাছের শিকড় যাহা থাকে, তদ্‌সমুদায় উত্তম করিয়া বাছিয়া ফেলিতে হইবে। মাটি বাছা শেষ হইলে হাপোর জল দিয়া ভিজান আবশ্যক। এইরূপে হাপোর প্রস্তুত হইলে, গর্ত্তের অঙ্কুরিত সুপারি সাবধানে শিকড় সমেত তুলিয়া ৫।৬ অঙ্গুলি অন্তর অন্তর উহা রোপণ করিয়া দিতে হইবে। গর্ত্তের উপরিকার দুই একটী স্তরের সুপারি অঙ্কুরিত হইলে, জানিবে যে সকল স্তরের বীজ হইতে ঐ রূপ অঙ্কুর বাহির হইয়াছে। হাপোরে ২।৩ মাস চারা রাখিয়া বর্ষার সময় এক একটী চারা তুলিয়া বাগানে রোপণ করিতে হইবে। প্রত্যেক চারা ৩।৪ হস্ত ব্যবধানে সারি

করিয়া রোপণ করা উচিত। ছায়া যুক্ত স্থানে উত্তম সুপারি হইয়া থাকে ইটী মনে রাখা কর্ত্তব্য। সুপারি অধিকবার নাড়িয়া পুঁতিলে ফল বড় বড় ও মিষ্ট আস্বাদন হইয়া থাকে। সুপারির গাছ যত নিকট করিয়া রোপণ করা হয় ততই ভাল; কারণ উহার পাতা পরস্পর গাছে গাছে ঠেকা ঠেকী হইলে গাছ উত্তম তেজস্কর থাকে এবং প্রচুর ফল উৎপন্ন হয়। বোধহয় অনেকে দেখিয়া থাকিবেন, শ্রেণীর মধ্যে দুই একটী গাছ মরিয়া গেলে, অবশিষ্ট ফাকের গাছে সুন্দর রূপ সুপারি ধরে না। গাছ সকল পরস্পর নিকটবর্ত্তী থাকিলে, আর একটী লাভ এই যে বাগানে সুপারি পাড়িতে হইলে প্রত্যেক গাছে উঠিতে হয় না, একটী গাছের ফল পাড়া হইলে, সেই গাছ নোওয়াইয়া অপর গাছে যাইতে পারা যায়। এইরূপে বাগানের একটী গাছ হইতে সমুদায় গাছে বেড়াইয়া সুপারি পাড়িতে কোন অসুবিধা হয় না। ইহাতে প্রত্যেক গাছে আরোহণ জন্য পরিশ্রম ও সময় ব্যয় কমিয়া আইসে। গাছ হইতে পাকা সুপারি পাড়িয়া কেহ কেহ রৌদ্রে শুকাইয়া খোসা ছাড়াইয়া থাকে; কিন্তু তাহাতে সুপারির গাত্রাবরণ ছাল তোলা বড় কঠিন হইয়া উঠে। এজন্য গাছ হইতে সুপারি পাড়িয়া গৃহ মধ্যে হাঁড়ি কিম্বা কলসী অথবা অন্য কোন পাত্রে পুরিয়া ঢাকিয়া রাখিতে হইবে। তিন চারি দিন এইরূপ অবস্থায় থাকিলে, সুপারির এক প্রকার কস বাহির হইয়া কিয়ৎ পরিমাণে ফাঁপিয়া উঠিবে; অনন্তর ঐ সকল পাত্রের সুপারি বাহির করিয়া ৪। ৫ দিন রৌদ্রে দিয়া উত্তমরূপ শুষ্ক করিয়া তাহার খোসা তুলিলে ফলের গাত্রাবরণ ছাল শুদ্ধ উঠিয়া যাইবে। সুপারি পাকিলে কোন কোন পাখীতে উহা নষ্ট করিয়া থাকে। এজন্য সুপক্ক না হইলেও অর্থাৎ গাছে হরিদ্রাবর্ণ হইলে তাহা পাড়িয়া পূর্ব্বোক্ত প্রণালী ক্রমে তাহা শুষ্ক করিবে। যশোহর প্রভৃতি কয়েকটী জেলাতে এক একটী নারিকেল ও সুপারির বাগানে এক একটী গৃহস্থ প্রতি পালিত হইয়া থাকে।

লেবু।

লেবু দুই প্রকারে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; অর্থাৎ কতকগুলি জল পানে ও কতকগুলি ভোজন প্রভৃতি কার্য্যে। কমলা বাতাবী এই সকল জল পানে আর পাতী কাগচী ইত্যাদি ভোজনে ব্যবহার হয়। লেবু অনেক ঔষধে লাগে ; মৃদু অম্ল বিশিষ্ট পাতি প্রভৃতি পথ্য রূপেও গৃহীত হয়। সকল প্রকার লেবু রোপণ ও পাইট একরূপ নহে। এই প্রস্তাবে পাতি, চিনে পাতি, কাগচী, চিনে কাগচী, গোঁড়া, চিনে গোঁড়া, সরবতী এবং কলম্বা লেবুর রোপণ প্রণালী লিখিত হইল। বাঙ্গালা দেশ অপেক্ষা উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে আচারাদিতে লেবু অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ঐ সকল দেশে লেবুর আবাদও অধিক দেখিতে পাওয়া যায়।

যে স্থানে অধিক রৌদ্র লাগিয়া থাকে, সে স্থান অপেক্ষা কিছু ছায়া যুক্ত স্থানে ইহা ভাল হয়। বাড়ীর উত্তর দিকে লেবুর আবাদ করা ভাল। পোড়া মাটি কিম্বা ইঁট ও ঝামা বিশিষ্ট ক্ষেত্রে লেবু রোপণ করিলে প্রচুর ফল ধরিয়া থাকে। লেবুও প্রায় বৎসরের সকল সময় ধরিতে দেখা যায়। লেবু গাছের গোড়া মধ্যে মধ্যে খুঁড়িয়া দিয়া সার দিলে ভাল হয়। গাছের পাইট ভাল রূপ করিতে পারিলে এক একটী গাছ আট দশ হাত পর্য্যন্ত বড় এবং তদুপযুক্ত স্থান ব্যপিয়া ঝাড় হইয়া থাকে। গাছের ডাল পালা যত অধিক হয়, ততই ফল ধরিবার সম্ভাবনা। ডাল ধরিয়া টানাটানি করিলে, গাছে আঘাত লাগিয়া ফল ধরার ব্যাঘাত হইয়া থাকে। পরিণত লেবুর বীচি ৭। ৮ দিন শুষ্ক করিয়া ঘরে তুলিয়া রাখা আবশ্যক। বীজ অগ্রে কোন স্থানে পাতো দিয়া চারা প্রস্তুত করিলে ভাল হয়। চারা এক হাত বড হইলে তাহা তুলিয়া বাগানে রোপণ করিলে গাছ হইয়া উঠে। পাতো না দিয়া কেবল বীচ ছড়াইয়া দিলেও গাছ হইতে পারে। লেবুর কলম বাঁধিয়া গাছ করিলে ফল বড় হইয়া থাকে, কিন্তু ফলনে অল্প হয়। বীচির গাছে যদিও লেবুর আকার ছোট হইয়া থাকে, কিন্তু ফল অধিক পরিমাণে ধরিতে দেখা যায়। লেবুর

জল আবশ্যক হইবে, কোন্ সময়ে বীজ ছড়াইতে হইবে, এই সকল স্থির করিতে না পারিয়া, তাঁহাদের চেষ্টা সফল হয় নাই। পরে ক্রমে ঐ সকল বুঝিতে পারিয়া ঐ ধান উত্তমরূপে জন্মাইয়া ছিলেন।

উপরে যে প্রকার জমির কথা লেখা গিয়াছে, সেই প্রকার জমিতে ভাদ্র মাসের প্রথমে এই ধানের বীজ ছড়াইতে হয়, সাহেবেরা পরীক্ষা করিয়া ইহা স্থির করিয়াছেন। বীজ ছড়াইবার পূর্ব্বে জমি এইরূপে তৈয়ার করিতে হয়। জমির উপরে যে সকল ঘাস বা আগাছা থাকে, সে সকল আগুন দিয়া পোড়াই-তে কিম্বা কোদাইল দ্বারা পরিষ্কার করিতে হইবে, তাহার পরে কাটি দিয়া ঐ জমিতে মুটম হাত অন্তরে অন্তরে গর্ত্ত করিবে. ঐ সকল যেন আড়াই বা তিন অঙ্গুল গভীর হয়। এই প্রকার গর্ত্ত করা হইলে, একটা গর্ত্তে চারি পাঁচটা ধানের বীজ রোপণ করিবে, ইহাতেই গাছ জন্মিয়া ধান্য উৎপন্ন হইবে। বেশী জল দেওয়া বা অন্য কোন প্রকার কার্য্য করা আবশ্যক হয় না।

রোপণের তিন মাস পরে ফসল তৈয়ার হয়। প্রথম ফসল কাটিয়া লইলে সেই গাছে পুনরায় শিষ বাহির হইয়া এক মাসের মধ্যেই দ্বিতীয় ফসল তৈয়ার হয়, তাহা কাটিয়া লইলে, আরও শিষ বাহির হয় এবং ধান জন্মে। এই প্রকারে ঐ গাছ হইতে তিন চারিবার ফসল পাওয়া যায়। কিন্তু প্রথম বারে যত ফসল হয়, শেষে তত হয় না; ক্রমেই কম হইয়া থাকে। এই ধান বাদার ধান অপেক্ষা ছোট ছোট; কিন্তু অধিক পরিষ্কার ও সুস্বাদু হয় এবং অনেক দিন ঘরে রাখিলেও নষ্ট হয় না। ভারত শ্রমজীবী। ভাদ্র, ১২৮৬।

রিয়া গাছের আঁস।

১২৮৬ সালের শ্রাবণ মাসের ভারত শ্রমজীবীতে আমরা উপরি উক্ত শিরোনামের একটী প্রবন্ধ পাঠ করিলাম। কিন্তু ঐ প্রবন্ধ মধ্যে রিয়া গাছের আকার প্রকার ও আবাদ প্রণালীর বিষয় কিছুই বিবৃত হয় নাই। কোন ফসলের চাস আবাদ করিতে সাধারণকে উপদেশ দিতে হইলে, উহার আবাদ প্রণালী, ব্যয়, লাভ ইত্যাদির বিষয় বিশেষরূপে বিবৃত হওয়া উচিত। নতুবা ফলোদয়ের সম্ভাবনা নাই। ঐ প্রবন্ধে পাঠ করা গেল যে, আশাম, রঙ্গপুর, দিনাজপুর প্রভৃতি স্থানে উহার বহুল চাস আবাদ হইয়া থাকে। এই জন্য আমরা কৃষিতত্ত্বের তত্তৎ প্রদেশীয় পাঠকগণকে অনুরোধ করিতেছি যে,

আবাদে বেশ লাভ হইয়া থাকে। অন্যান্য তরকারীর ন্যায় ইহা নিত্য বিক্রয় দ্বারা সংসার খরচ চলিতে পারে। লেবুর আবাদে ব্যয় অধিক পড়ে না। বাড়ীতে একটী গাছ থাকিলে, পয়সা হাতে করিয়া বাজারে যাইতে হয় না। এরূপ লাভজনক গাছ বাড়ীতে রোপণ না করিয়া বাজারের মুখ চাহিয়া থাকা নিতান্ত আলস্য পরায়ণের লক্ষণ।

লাল পাতী।

—০ঃ০—

বৃক্ষ লতা প্রভৃতি উদ্ভিদ্ শরীরে পরমেশ্বর যে কত বিচিত্রিতা, কত সৌন্দর্য্য, ও কত কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন তাহা দর্শন করিলে মোহিত হইতে হয়। তাঁহার তুলিকায় যাহা চিত্রিত, তাহার সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট না হয় সংসার মধ্যে এমন মনুষ্য কেহই নাই। তিনি মনুষ্যের সুখের জন্য কত স্থানে যে কত রমণীয় উদ্ভিদের সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা করা দুঃসাধ্য! ফলতঃ উদ্ভিদ্ জগতে তাঁহার জীবন্ত সৌন্দর্য্য বর্ত্তমান রহিয়াছে। এক একটী সুদৃশ্য বৃক্ষ, মনোহর পত্র, পরিমল—পূর্ণ বিকশিত পুষ্প সন্দর্শন ও তদ্বিষয় আলোচনা করিলে কাহার না মস্তক তাঁহার চরণে প্রণত হয়! সর্ব্বদা এক বর্ণের দ্রব্য দর্শন করিলে নয়নের আনন্দ জন্মে না। হৃদয় পরিতৃপ্ত হয় না এজন্য দয়ার সাগর বিশ্বপতি তাঁহার এই বিশ্বরাজ্য নানা বর্ণে রঞ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন। লালপাতীর এক একটী পত্রের কি অপূর্ব্ব শোভা! গাঢ় লোহিত বর্ণের পত্রগুলি যখন নির্গত হয় তখন বাগান আলো করিয়া থাকে। এই পাতার বিশেষ গুণ এই যে শীঘ্র শুষ্ক হইয়া বিবর্ণ কিম্বা ঝরিয়া পড়ে না। এক একটী পাতা অনেক দিন গাছ শোভিত করিয়া থাকে। শীত কালে এই পাতার অত্যন্ত সৌন্দর্য্য হয়। সাহেবেরা এই গাছ এদেশে আনিয়া উদ্যানের একটী শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন। কেবল শোভার জন্য এই গাছ বাগানে রোপিত হইয়া থাকে। লাল পাতীর ন্যায় আরও কয়েক জাতীয় গাছ আছে। ঐ সকল গাছের মধ্যে

কোন কোন গাছের পাতা সম্পূর্ণ সাদা, কোন কোন গাছের পাতা অপেক্ষাকৃত অল্প সাদা আবার কোন কোন গাছের পাতা নানা বর্ণে রঞ্জিত। এই সকল গাছ এক স্থানে রোপিত হইলে উদ্যানের অত্যন্ত শোভা হয়।

লাল পাতীর গাছ অতি সহজেই হইয়া থাকে। চারা প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমতঃ একটী হাপোর প্রস্তুত করিতে হয়। অন্যান্য গাছের হাপোরের ন্যায় মাটির পাইট ও সার দিয়া জল দ্বারা সমুদায় মৃত্তিকা কর্দ্দমময় করিতে হইবে। ফাল্গুন কিম্বা চৈত্র মাসে গাছের ডাল কাটিয়া হাপোরে বসাইলে ভাল হয়। মধ্যে মধ্যে তাহাতে জল দেওয়া আবশ্যক। কিছু দিন পরে কর্ত্তিত ডাল হইতে অনেক গুলি অঙ্কুর বাহির হইয়া থাকে। এই রূপে ঐ রোপিত ডাল বাড়িয়া উঠিলে জ্যৈষ্ঠ কিম্বা আষাঢ় মাসের প্রথমে বৃষ্টি হইলে, গাছ তুলিয়া উদ্যানে রোপণ করা উচিত। আশ্চর্য্যের বিষয় এই অন্যান্য ঋতুতে গাছের পাতা লাল হইতে দেখা যায় না। তখন অন্যান্য গাছের পাতার ন্যায় হরিৎ বর্ণ বিশিষ্ট থাকে। শীত কাল উপস্থিত হইলে গাছের কতক পাতা সম্পূর্ণ লোহিত বর্ণ হয়।

মালী।

উদ্যানের উন্নতি অবনতি যে মালীর অভিজ্ঞতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। বিভিন্ন দেশজাত, ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির ফল পুষ্প বৃক্ষ ও লতাদির স্বভাব অবগত হইয়া, সেই স্বভাবানুসারে তাহাদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করা নিতান্ত গুরুতর কার্য্য। ইয়ুরোপ আমেরিকা প্রভৃতি দেশ সমূহে উদ্ভিজ্জ ও রসায়ণ বিদ্যা সুচারু রূপে শিক্ষা করিয়া অনেকে উদ্যান বা কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। আমাদিগের দেশে শিক্ষিত শ্রেণী এই কার্য্যকে অত্যন্ত ঘৃণিত জ্ঞান করিয়া কেহই ইহাতে প্রবেশ করেন না। সুতরাং উদ্যান ও কৃষিকার্য্য সামান্য

মালা বা কৃষকদিগের দ্বারাই সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে। যতদিন পর্য্যন্ত এই সকল অশিক্ষিত নিম্ন শ্রেণীর হস্তে উদ্যান কার্য্যের ভার অর্পিত থাকিবে, ততদিন উহার বিশেষ উন্নতি সংসিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই।

রক্ত মাংসপিণ্ড হীন প্রাণ শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ ভার যেমন সুশিক্ষিতা ধাত্রীর উপর সমর্পণ করিয়াও জনক জননী নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। সর্ব্বদাই তাহার তত্ত্বাবধারণ করিয়া থাকেন, সেই রূপ উদ্যান কার্য্য কেবল মাত্র মালীর উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে কোন ক্রমেই তাহার উন্নতি হইতে পারে না। এজন্য সর্ব্বদা মালীর কার্য্য স্বচক্ষে দেখিতে হয়, এবং কোন কোন বিষয়ের ত্রুটি হইতেছে কোন কার্য্য কি প্রণালীতে করিতে হইবে তদ্ সমুদায় স্বয়ং তত্ত্বাবধারণ করা আবশ্যক। যে সকল বিষয়ে ত্রুটি বা অভাব লক্ষিত হইবে, তাহা সংশোধনের উপায় ধার্য্য করিয়া দেওয়া উচিত। আমরা দেখিয়াছি, কত কত সিবিল জজ্ মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি স্বয়ং প্রাতে বা সায়াহ্নে উদ্যানস্থিত বৃক্ষাদির কলম বন্ধন, কুঞ্জরচনা প্রভৃতি উদ্যান কার্য্য স্বহস্তে আনন্দ ও উৎসাহের সহিত করিয়া থাকেন। মালী কি নিয়মে উদ্যানের কার্য্য করিয়া থাকে, সর্ব্বদা তাহা তত্ত্বাবধারণ করা উচিত। কেবল মাত্র মালীর উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে সুন্দর রূপ কার্য্য হইয়া উঠে না। উদ্যান কার্য্য নিজে ভাল রূপ না জানিলে, মালীর কার্য্যের দোষ গুণ বিচার করা বড় কঠিন। যাঁহারা কেবল মাত্র মালীর উপর নির্ভর করিয়া থাকেন, তাঁহারা উদ্যানে যে বিস্তর ক্ষতি সহ্য করেন, তাহা বলা বাহুল্য। উদ্যান সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিতে হইলে, তাহাতে সুদক্ষ মালী নিযুক্ত করিতে হয়। আমাদের দেশে মালিদিগের শিক্ষোপযোগী কোন বিদ্যালয়াদি না থাকায় উহারা উদ্যান কার্য্যে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে সমর্থ হয় না। এজন্য উদ্যান—স্বামীদিগের উচিত তাঁহারা উদ্যান সম্বন্ধীয় পুস্তক এবং সাময়িক পত্রিকাদি পাঠ করিয়া যতদূর জ্ঞান লাভ করিতে পারেন, সময়ে সময়ে মালিদিগকে তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান এবং কার্য্য প্রণালী শিক্ষা দেন। মালীর কার্য্য যে সামান্য নহে তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। সুখ সৌন্দর্য্য লাভের আকর স্বরূপ যে উদ্যান তাহার কার্য্য যে অত্যন্ত কঠিন তাহা কে না স্বীকার করিবেন। মালী যে পরি-

মাণে উদ্যান কার্য্যে পারদর্শী হইবে, উদ্যানও সেই পরিমাণে উন্নত হইয়া উদ্যান—স্বামীর অনন্দ বর্দ্ধন করিবে। অনেক নীতিজ্ঞ পণ্ডিত কৃষি কার্য্যের সহিত শিক্ষাকার্য্যের তুলনা করিয়া থাকেন। কোন্ বালকের কিরূপ স্মরণ-শক্তি, কিরূপ স্বভাব, কিরূপ উপদেশ দিলে সে শিক্ষালাভ করিতে সমর্থ হইবে, তাহার মানসক্ষেত্র কিরূপ উর্ব্বরা ইত্যাদি জ্ঞাতব্য বিষয় না জানিয়া শিক্ষা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে যেমন কোন ফল দর্শে না; সেইরূপ কোন্‌ক্ষেত্র কিরূপ সারবান, কি উপায় অবলম্বন করিলে মৃত্তিকার উৎ-পাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করিতে পারা যায়, কোন্ উদ্ভিদ কোন ভূমিতে উৎপন্ন হইতে পারে, সেই সকল উদ্ভিদের গুণ ও স্বভাব, রোপণপ্রণালী রক্ষা করিবার নিয়ম প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান না থাকিলে সে কৃষক বা মালী দ্বারা উদ্যানের কোন শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতে পারে না।

উদ্যানের সৌন্দর্য্য সাধন জন্য মালীর বিশেষ দৃষ্টিরাখা আবশ্যক। অর্থাৎ কোন্‌স্থানে কোন্ বৃক্ষটী রোপিত হইলে, কি প্রণালীতে কেয়ারি প্রস্তুত করিলে, শাখাদি কি প্রণালীতে ছাটাই করিলে উদ্যানের শোভা হইবে তদ্‌বিষয়ে দৃষ্টিরাখা উচিত। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা প্রভৃতি ঋতুভেদে উদ্যানের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য করিতে হয়। উদ্যানের মধ্যবর্ত্তী পথগুলি সর্ব্বদা পরিষ্কার না রাখিলে ঘাস জন্মিয়া তাহাদিগের শ্রীহীন করিতে পারে। এজন্য সর্ব্বদা ঘাস কিম্বা অন্য গাছ হইতে দেওয়া উচিত নহে। ঘাসের বিশেষ দোষ এই যে উহা মূল সহিত তুলিয়া না ফেলিলে জড় নষ্ট করা বড় কঠিন। উদ্যানের পাইট করিতে ক্রটি হইলে যে গাছ-পালার বিশেষ হানি হয়, মালীর ইটী মনে রাখা উচিত। কার্ত্তিক মাস বাগানের পাইট করিবার উপযুক্ত সময়। বর্ষা শেষ হইলে শীতের প্রারম্ভে সমুদায় উদ্যান কোদালিয়া দেওয়া উচিত। কারণ বর্ষার জলে ভূমি রসযুক্ত থাকে, শীতের আরম্ভে ঐ মৃত্তিকা শুষ্ক হইয়া অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠে। কঠিন মৃত্তিকায় উদ্ভিদের কোমল মূল সকল বিস্তারিত হইতে পারে না। মূল বিস্তৃত না হইলে, বৃক্ষাদির কান্তি পুষ্ট হয় না। পত্র সকল কুঁকড়ান হইয়া শ্রীহীন হইতে থাকে এবং পুষ্পফল উপযুক্ত আকারে পরিণত হইতে ব্যাঘাত জন্মে। এজন্য শীতের প্রথমে সকল উদ্ভিদের

গোড়া খুঁড়িয়া দেওয়া আবশ্যক। গাছের গোড়া খুঁড়া হইলে আল্‌গা মাটিতে শিকড় সকল ইচ্ছামত সঞ্চারিত হইতে পারে। শিকড় চারিদিকে বিস্তৃত হইলে অনেক দূরের মৃত্তিকার রস গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। রস গ্রহণ কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইলে, উদ্ভিদ্‌দিগের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়, নব নব সতেজ পত্র সকল শাখা প্রশাখা হইতে বহির্গত হইতে থাকে, এবং বৃক্ষ লতাদিগের পুষ্প, মুকুল ও ফল উদ্ভিন্ন হইয়া উদ্যানের অপূর্ব্ব শোভা বৃদ্ধি হইয়া উঠে। পুষ্পাদি বৃক্ষের মূলে আলবাল রচনা করিয়া তাহাতে প্রতিদিন জল সেচন করিতে হয়। গোলাপ প্রভৃতি কয়েক জাতীয় উদ্ভিদের ডাল কাটিয়া দিতে হয়। এই সময়ে উদ্যানে সার দেওয়া আবশ্যক। গোময়ের সারই উদ্যানের পক্ষে উপযুক্ত মালিদিগের মনে রাখা কর্ত্তব্য। এক বৎসরের মধ্যে যে সকল বৃক্ষ রোপিত হইয়াছে, সেই সকল বৃক্ষমূলে সার দেওয়া কর্ত্তব্য নহে; কারণ তাহারা সারের রস পরিপাক করিতে অসমর্থ হইয়া মরিয়া যাইবার সম্ভাবনা। যে সকল উদ্ভিদের গোড়া খুঁড়িয়া দেওয়া হইবে, কয়েক দিবস শিকড় সকল আল্‌গা রাখিয়া রৌদ্র ও বাতাস লাগাইয়া পুনর্ব্বার সার মিশ্রিত মৃত্তিকা দ্বারা তাহা ঢাকিয়া দিতে হইবে।

এইরূপে উদ্যানের পাইট সারিয়া জেড়ুয়া ফুল ও শাক সবজী প্রস্তুত করিবার জন্য মালিদিগের চেষ্টা করা উচিত। জেড়ুয়া ফুল অধিকাংশ শীত প্রধান দেশ হইতে আনীত। শীতকালে ঐ সকল ফুল ফুটিয়া থাকে এজন্য সাধারণে উহাদিগকে জেড়ুয়া ফুল কহিয়া থাকে। এই সকল ফুল উদ্যানের অত্যন্ত সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে। জেড়ুয়া ফুল নানা বিধ আমরা অবসর ক্রমে ঐ সকল ফুলের পরিচয় পাঠকবর্গের গোচর করিব। এক্ষণে মালিরা যে প্রণালীতে তাহাদিগকে রোপণ করিবে, তাহাই এস্থলে লিখিত হইতেছে। এই সকল ফুলের পক্ষে পচা পাতার সারই উপযুক্ত। কি নিয়মে পাতার সার প্রস্তুত করিতে হয় তাহা কৃষিতত্ত্বে সার প্রকরণে উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে তাহা উল্লেখ করা অনাবশ্যক। পাতার সার উত্তম গুঁড়া করিয়া হাপোর প্রস্তুত করিতে হইবে। যদি গামলায় বীজ ফেলিতে ইচ্ছা হয় তবে গামলার নীচে অন্য মৃত্তিকা দিয়া উপরে

সার দ্বারা পূর্ণ করিতে হইবে। বীজ অঙ্কুরিত হইলে সরু ধার বোমায় করিয়া মিহি ধারে জল দিতে হইবে। চারা কিঞ্চিৎ বড় হইলে অন্য স্থানে তুলিয়া রোপণ করা কর্ত্তব্য।

এই সময় কফি, পালঙ, সালগাম, ফরাস্, বিট প্রভৃতি শাকসবজীর ক্ষেত প্রস্তুত করা আবশ্যক। সবজীর ক্ষেতে খোইলের সার দেওয়া উচিত। শীতকালে ভূমির পাইট, শাকসবজী রোপণ প্রভৃতি মালীর প্রধান কার্য্য। ফলতঃ এই সময় মালীর উপর অনেক কার্য্য ভার পতিত হয়। চারা রোপণ করিবার এই প্রশস্ত সময়। অনেকে বর্ষাকালে চারা পুঁতিবার উপযুক্ত সময় বিবেচনা করিয়া থাকেন, কিন্তু বর্ষাকালে যে সকল বৃক্ষ রোপণ করা হইয়া থাকে, শীতকালে তাহাদিগের মধ্যে অনেক গাছ মরিয়া যাইবার সম্ভাবনা, কিন্তু শীত ঋতুতে যে সকল গাছ লাগিয়া যায় তাহাদিগের মরিবার কোন আশঙ্কা থাকে না।

গ্রীষ্মকালে গাছে জল দেওয়া মালীর প্রধান কার্য্য। এই সময়ে প্রখর রৌদ্রে মৃত্তিকা শুষ্ক হইয়া থাকে। উদ্ভিদ্‌গণ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে রসগ্রহণ করিতে পায় না, এজন্য প্রতিদিন প্রাতে ও অপরাহ্নে বৃক্ষ মূলে জল দেওয়া আবশ্যক। আমাদের দেশে অধিকাংশ সুগন্ধ পুষ্প এই সময় প্রস্ফুটিত হইতে আরম্ভ হয়। সুতরাং বৃক্ষ মূলে জল না দিলে ঐ সকল ফুল সুন্দর রূপে ফুটিতে পারে না। গ্রীষ্মকালে যে সকল শাকসবজী জন্মিয়া থাকে, তদ্‌সমুদায় রোপণ কার্য্যে মনোযোগী হওয়া উচিত। যে কোন উদ্ভিদ সময়ে রোপিত না হইলে আশানুরূপ ফল লাভ হয় না। অতএব কোন্ ঋতুতে কোন্ উদ্ভিদ রোপণ করা উচিত, তদবিষয়ে মালিদিগের জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়।

পুদিনা।

কোন বৃক্ষের বীজ বা শাখা পল্লব ভিন্ন অন্য একটী নূতন বৃক্ষ বা লতা উৎপন্ন হইতে পারে, ইহা নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। প্রাণি-

দিগের সংশ্রব ব্যতীত যেমন কোন প্রাণী জন্মগ্রহণ করিতে পারে না, উদ্ভিদ্‌দিগের পক্ষেও সেইরূপ। যদিও সকল প্রাণিদিগের প্রজনন ক্রিয়া একরূপ নহে, অর্থাৎ সকল প্রাণী একরূপ নিয়মে উৎপন্ন হয় না, কিন্তু সাধারণতঃ প্রায় প্রাণী শরীর হইতেই প্রাণী উৎপন্ন হইয়া থাকে। পুরুভুজের দেহ কর্ত্তন করিলে সেই কর্ত্তিত অংশ হইতে একটী নূতন পুরুভুজ জন্মগ্রহণ করে। সেইরূপ উদ্ভিদ্‌ বিশেষের বীজ বা শাখা কিম্বা পত্র বিশেষে অন্য একটী উদ্ভিদ্‌ জন্মিয়া থাকে। কিন্তু সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের কি আশ্চর্য্য মহিমা, তিনি উদ্ভিদের সংশ্রব ভিন্ন ও অন্য পদার্থ হইতে নবতর উদ্ভিদ উৎপাদন করিয়া তাঁহার অনির্ব্বচনীয় শক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। মনুষ্য যত বিজ্ঞান চক্ষু উন্মিলিত করিবে, ততই বিশ্বপতির অলৌকিক ব্যাপার দেখিয়া বিমোহিত হইবে।

পুদিনা শাকের পরিচয় পাঠকগণের মধ্যে প্রায় অনেকেই অবগত আছেন। পুদিনা কোন উদ্ভিদ হইতে উৎপন্ন নহে। যেরূপে এই শাক হইয়া থাকে, এস্থলে তাহা উল্লিখিত হইল।

দুই কিম্বা তিন হস্ত পরিমিত একগাছি রজ্জু উত্তম করিয়া চিটা গুড় মাখাইয়া কোন নির্জ্জন স্থানে লটকাইয়া রাখিতে হয়। গুড় খাইবার লোভে মক্ষিকা সকল আসিয়া ঐ রজ্জুতে উপবিষ্ট হইয়া থাকে। রজ্জু নির্জ্জনে রাখিবার তাৎপর্য্য এই যে কোন প্রকার গোলযোগে মক্ষিকা বসিবার ব্যাঘাত না হয় অথবা মক্ষিকা সকল উড়িয়া অন্য স্থানে না যায়। এইরূপে কিছুদিন মক্ষিকা রজ্জুতে উপবিষ্ট থাকিলে, তাহাতে প্রভূত ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে। ডিম্ব প্রসবের পর প্রায়ই অধিকাংশ মক্ষিকা রজ্জু পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে উড়িয়া যায়। এই সময় রজ্জু রৌদ্রের উত্তাপ না লাগে এরূপ স্থানে রাখিতে হয়। রজ্জু প্রস্তুতের সময় বা পূর্ব্বে একটী স্থান নির্ব্বাচন করিয়া তাহাতে গোমল মূত্রের পচা সার দিয়া ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে হইবে। অনন্তর ক্ষেতের উপর রন্ধনশালার ঝুল এবং মাঁকড়-সার জাল বিছাইয়া তদপরি ঐ দজ্জু গোলাকার করিয়া বসাইতে হইবে। রজ্জু গাত্রে হাত কিম্বা অন্য কোন বস্তু লাগিলে, ডিম্ব সকল নষ্ট হইয়া যাইতে পারে এজন্য সাবধানতার সহিত তাহা ক্ষেতে বসাইতে হইবে।

পূর্ব্বোক্ত সার মিশ্রিত মাটি দুই অঙ্গুলি পরিমাণে তদুপরি আচ্ছাদিত করিয়া দিতে হইবে। এবং যতদিন পর্য্যন্ত অঙ্কুর নির্গত না হয়, ততদিন তাহাতে পচা গোবরের জল দেওয়া আবশ্যক। অন্যূন দুই সপ্তাহের মধ্যেই ঐ রজ্জু হইতে পুদিনা গাছ উৎপন্ন হইবে।

কোন্ ব্যক্তি দ্বারা কি উপায়ে যে পুদিনা গাছ জন্মাইবার এই নিয়মটী আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। ফলতঃ যাঁহার দ্বারা এই আশ্চর্য্য ব্যাপার সাধিত হইয়াছে, তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারা যায় না। উদ্ভিদ্ জগতে চেষ্টা করিলে বোধহয় অন্যান্য পদার্থের সংযোগে পুদিনার ন্যায় অভিনব উদ্ভিদ উৎপাদন করিতে পারা যায়। ঐ গাছের ডাঁটা কিম্বা চারা পুঁতিলে, তাহা হইতেও গাছ জন্মিতে পারে। পুদিনা শাকে উৎকৃষ্ট চাট্‌নি প্রস্তুত হয়। কট্‌লেট্, প্রভৃতি খাদ্যে পুদিনা বাটিয়া দিলে অধিকতর সুস্বাদু হইয়া থাকে।

শ্রীশশিভূষণ গুহ।
সিলেট্ কল্‌টিভেটিং কোং লিঃ
ইনেস্পেকটার।

(হেঁচ মুখী।)

ইহা আনারস জাতীয় এক প্রকার গুল্ম বিশেষ। বঙ্গ দেশের অনেক স্থানেই এ গুল্ম সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু সর্ব্ব সাধারণে ইহার প্রয়োজনীয়তার বিষয় সম্যক্ পরিজ্ঞাত নহেন। বিশ্বপতির বিশ্ব-রাজ্যে স্থানে স্থানে যে কত প্রকার আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য তরু গুল্মাদি সংরোপিত রহিয়াছে, তাহার সংখ্যা গণনা করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। বহু অনুসন্ধান ও বহু পর্য্যবেক্ষণ করিলেও সমস্ত পরিলক্ষিত হয় না। উদ্‌ভিদ্‌বিৎ পণ্ডিতেরা হয়ত অনেকেই এ গুল্মের সবিশেষ গুণের পরিচয় পাইয়া থাকিবেন। কিন্তু আমরা অদ্য সর্ব্ব সাধারণের অবগতির জন্য হেঁাচমুখীর

বিষয় কয়েক পংক্তি লিখিতে বাধ্য হইলাম। আমরা উক্ত গুল্মের বিষয় যতদূর জানিতে পারিয়াছি, পাঠক বর্গের সমক্ষে অদ্য তাহাই লইয়া উপস্থিত হইলাম।

উহার গাছগুলি একহাতের অধিক উচ্চ হয় না। পত্রগুলি সুদীর্ঘ, আনারস পাতার ন্যায়। উক্ত পত্র সকল কাটিয়া উত্তপ্ত জলে সিদ্ধ করিতে হয়। পরে সিদ্ধ পত্রগুলির একদিক ধরিয়া অন্য হস্তে দুই অঙ্গুলির চাপ দিয়া টানিলেই পত্রোপরিভাগস্থ ক্লেদ ভাগটা সরিয়া যাইবে। এবং তাহা হইলেই এক প্রকার সূক্ষ্ম সূত্র অবশিষ্ট থাকিবে। সেই সূত্রগুলি এত দৃঢ় ও কঠিন যে সজোরে টানিলেও সহজে ছিঁড়িয়া যায় না। আমাদের দেশীয় লোকদিগের মধ্যে যাঁহারা ইহার গুণের পরিচয় অবগত হইয়াছেন তাঁহারা সেই সূত্রগুলি দ্বারা এক প্রকার "তাগা" তৈয়ার করিয়া থাকেন। অনেকে তাহা কটিদেশে পরিধান করিয়া থাকে। এবং তাহাই কটিদেশে বসন সংরক্ষণের এক প্রকার উপাদান স্বরূপ হইয়া থাকে। বুদ্ধির কৌশল পরম্পরা সঞ্চালন করিয়া হয়ত ইহা দ্বারা অন্য বিধ প্রয়োজন সাধনও বিচিত্র নহে। পরন্তু আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকেরাও ইহা দ্বারা অনেক প্রকার ঔষধ ও তৈলাদি প্রস্তুত করিয়া থাকেন।

বিনয়াবনত—

শ্রীতারিণী চরণ সেন

বল্লভদী—ফরিদপুর।

পলাণ্ডু।

পলাণ্ডু দুই প্রকার;—বড় পলাণ্ডু ও ছোট পলাণ্ডু। বড় পলাণ্ডুর বীজ বপন করিয়া, তাহার চারা রোপণ করিতে হয়। অদ্যকার প্রস্তাবে আমরা ছোট পলাণ্ডুর বিষয় অবতারণা করিব। আলু রোপণ করিলে, যেরূপ তাহা হইতে চারা বহির্গত হয়, সেইরূপ পলাণ্ডু রোপণ করিলেও তাহা হইতে চারা বাহির হইয়া থাকে। পলাণ্ডু অতি উপাদেয় সামগ্রী।

মুসলমান দিগের নিকট ইহা অতি সুখাদ্য বলিয়া আদৃত হইয়া থাকে। কিন্তু এক্ষণে প্রায় অধিকাংশ হিন্দুতেও ইহা ভক্ষণ করিতেছেন। ইহা অতি লাভজনক ফসল, আমাদের এখানে ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মিতে পারে। কিন্তু অনেকানেক হিন্দুর ইহার প্রতি ঘৃণা থাকায়, ইহার চাসে এখানকার লোকের তাদৃশ যত্ন নাই। যদিও এখানকার অনেক উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুতেও ইহা ভক্ষণ করিয়া থাকেন, তথাচ যাঁহারা পলাণ্ডু ভক্ষণ করেন না, তাঁহাদের ভয়েই হউক, অথবা অন্য কোন কারণে হউক এখানকার লোক বড় একখানা পলাণ্ডুর চাস করে না। আমাদের এখানকার প্রায় আধকাংশ উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরাও কৃষাণ রাখিয়া না ; শস্যের চাস করিয়া থাকেন, কিন্তু পলাণ্ডু মুসলমান ও ইতর লোকের খাদ্য বলিয়া তাঁহারা তাহাতে বিমুখ থাকেন, প্রায় কৃষিজাত সমস্ত দ্রব্যই আপনাদের সাংসারিক বিষয়ে ব্যয় করিয়া থাকেন—তাঁহারা বড একখানা কৃষিজাত দ্রব্য বিক্রয় করেন না। তাঁহাদের মধ্যে আবার যাঁহারা পলাণ্ডু ভক্ষণ করেন, তাঁহারাও আবার লোক লজ্জা ভয়ে পলাণ্ডুর চাষ করেন না। তাঁহারা অন্যান্য যে সকল ফসলের চাষ করেন, তাহা অপেক্ষা পলাণ্ডু চাষে তাঁহাদের অনেক অধিক লাভ হইতে পারে। ইটী তাঁহাদের বুঝিবার ভ্রম, যে দ্রব্য তাঁহারা ভক্ষণ করেন না, তাহার চাষ করিতে দোষ কি? পলাণ্ডু প্রস্তুত হইলে, তাহা বিক্রয় করিলেইত হইল? কৃষিকার্য্য যখন লাভের জন্য. তখন পলাণ্ডু চাষ করিবার কোন দোষ দেখা যায় না। এখানকার লোকেরা যদি পলাণ্ডুর চাষে মনোযোগ দেন, তাহা হইলে তাঁহারা বিলক্ষণ লাভবান হইতে পারেন।

আশু ও কেলেস ধান্য কাটার পর, একটু উচ্চ জমিতে আশ্বিন মাসের শেষে কিম্বা কার্ত্তিক মাসের প্রথমে একটী চাষ দিতে হয়, তৎপরে ঐ জমিতে জল সিঞ্চন করিয়া দিয়া, বাত হইলে পর কোদলী দ্বারা জমির মৃত্তিকা উত্তম রূপে খনন করিতে হয়। (প্রথমে যে একটা চাষ দিবার কথা, তৎপরে যে জল সিঞ্চনের কথা লিখিত হইল, তাহা কেবল জমির মৃত্তিকা খননের সুবিধার নিমিত্ত।) আমাদের এখানকার মৃত্তিকা অত্যন্ত কঠিন, লাঙ্গলের দ্বারা জমির মৃত্তিকা উত্তমরূপে খনন করা যায়

তাঁহারা যথাসাধ্য যত্ন সহকারে উক্ত গাছের বিবরণ, চাস আবাদের প্রণালী, আঁস পৃথক্ করিবার প্রকরণ, চাসের খরচ ও ফসলের লাভ এই বিষয় গুলি বিশেষরূপে আমাদিগকে লিখিয়া পাঠাইবেন। এবং পাঠকগণের মধ্যে যদি কেহ অনুগ্রহ পূর্ব্বক উহার কিঞ্চিৎ বীজ আমাদিগের নিকট পাঠাইতে পারেন, তাহারও চেষ্টা করিবেন। উপরি উক্ত শ্রমজীবীতে রিয়া গাছের যেরূপ বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, নিম্নে তাহা অবিকল উদ্ধৃত করিলাম।

"আশাম দেশে যে রিয়া গাছ জন্মে, তাহার আঁস একটী মূল্যবান জিনিস; ঐ আঁস উৎকৃষ্ট পাটের তুল্য শক্ত ও শণের মত পরিষ্কার। আশাম, দিনাজপুব, রঙ্গপুর, প্রভৃতি অঞ্চলের লোকেরা উহার চাস বিলক্ষণ জানে। ঐ অঞ্চলে ইহার নাম কনুখুরা। যদি সহজে আঁস বাহির করিবার ভাল যন্ত্র থাকিত, তাহা হইলে পাট, শণ প্রভৃতি যত রকম আঁস আছে, সকলের চেয়ে উহার দাম কম হইতে পারিত। চীন দেশে চুমা নামে এক প্রকার ঘাস আছে, গ্রাস্ ক্লথ্ অর্থাৎ তৃণময় বস্ত্র নামে যে অনেক দামী কাপড় আছে, তাহা ঐ চুমা ঘাস হইতে তৈয়ার হয়। এই রিয়া গাছ চীন দেশীয় চুমা ঘাসেরই এক জাতি, পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে যে, রিয়া ও চুমা দুই গাছেরই এক গুণ। আশাম, দিনাজপুব ও রঙ্গপুর অঞ্চলে ডোম, জেলে প্রভৃতি ইতর লোকেরা আপন আপন কুটরির সম্মুখে অল্প পরিমাণে ঐ গাছের চাস করিয়া থাকে। উহার চাসের নিমিত্ত ভূমিতে সার দিলে যথেষ্ট উপকার হয়। পাহাড়ের নীচেব জমিতে উহার চাস করিলে গাছ বড় ভাল হয়। কারণ সেখানে ঝড় বহিবার সম্ভাবনা নাই, তাহাতে নিরাপদে গাছ গুলি বাড়িতে পারে। একবার চাস করিলে সেই গাছ হইতে বৎসরে চারি-বার আঁস লওয়া যাইতে পারে। প্রথম বারের আঁস যেমন শক্ত হয়, শেষে তেমন হয় না; কিন্তু ক্রমে আঁস মিহি হইয়া থাকে। চাস করিয়া আঁস তৈয়ার করিতে প্রতি মণে যে টাকা খরচ পড়ে, বিক্রয়ে তাহাপেক্ষা অনেক লাভ হয়। সাহেবেরা এই জিনিস অতি আদরের সহিত গ্রহণ করেন, তাঁহারা ইহা দ্বারা জাহাজের পাইল, মিহি কাপড় ও মেজ ঢাকিবার আচ্ছাদন প্রভৃতি ভাল ভাল দামী জিনিস তৈয়ার করেন। কিন্তু আমাদের দেশের লোকের ঐ আঁসে কেবল জাল, মাছ ধরিবার সূতা ও মোটা চট্ ভিন্ন আর কোন কাজে লাগায় না।"

না, একারণ কোদালী দ্বারা খনন করিতে হয়। যেখানে লাঙ্গলের দ্বারা জমির মৃত্তিকা উত্তমরূপে খনিত হইতে পারে, সেখানে কোদালী দ্বারা খনন করিবার আবশ্যক নাই। ফল কথা এই, জমির মৃত্তিকা ভাল করিয়া খনন করা চাই, এবং খণিত মৃত্তিকা গুলি চূর্ণ করা আবশ্যক। জমির মৃত্তিকা উত্তমরূপে খনিত ও চূর্ণীকৃত হইলে পর, অন্যূন এক হস্ত অন্তর ৪। ৫ অঙ্গুল উচ্চ এক একটী ভেলী করিতে হইবে। সেই ভেলীর উপর কিছু কিছু অন্তর একটু একটু গর্ত্ত করিয়া, তাহার মধ্যে পলাণ্ডুর যে মুখ সূক্ষ্ম তাহা উপরের দিকে রাখিয়া দিয়া, আমাদের এখানে ঘুঁটের ছাঁই, গোবর ইত্যাদিতে যে সার হয়, তাহা দ্বারা ঐ ভেলীর উপরকার গর্ত্ত পূরণ করিতে হইবে। এইরূপে পলাণ্ডু বপণ করা হইলে জমিতে একবার জল সিঞ্চন করিতে হইবে। জল পাইয়া ৫। ৭ দিনের মধ্যেই ঐ পলাণ্ডু হইতে চারা সকল বহির্গত হইবে। জমিতে বাত হইলে একবার নিড়াইয়া অর্থাৎ অল্প করিয়া জমির মৃত্তিকা খনন করিয়া দিবে। নিড়াইবার ৪। ৫ দিন পরে আর একবার জল সিঞ্চন করিয়া, পুনরায় আবার নিড়াইয়া দিবে। এইরূপে ২। ৩ বার জল সিঞ্চন ও নিড়াইয়া দিলেই আর কোন পাইট করিতে হইবে না। পলাণ্ডুর যে গাছ বাহির হয়, তাহাকে "পিঁয়াজ শাক" কহে। তাহা এতদ্দেশীয় প্রায় অনেক লোকেই ভক্ষণ করিয়া থাকে। ঐ পিঁয়াজ শাক পৌষ মাসের শেষে কিম্বা মাঘ মাসের প্রথমে কাটিয়া, আটি বান্ধিয়া বিক্রয় করিলে, উহা হইতে ঐ চাসের ব্যয় উঠিতে পারে। কার্ত্তিক মাসই পলাণ্ডু রোপণ করিবার প্রশস্ত সময়। মেটেল অর্থাৎ যে মৃত্তিকায় বালির অংশ খুব কম, এরূপ মৃত্তিকায় ছোট পলাণ্ডু প্রচুর পরিমাণে জন্মে। আমাদের এখানে মেটেল মৃত্তিকা, একারণ এখানে দোঁ-আঁশ ও বালি মাটি অপেক্ষা পলাণ্ডু অধিক পরিমাণে জন্মিতে পারে। মাঘ মাসের শেষে কিম্বা ফাল্গুন মাসের প্রথমে যখন পলাণ্ডুর দানা সকল পক্ক হইয়াছে, দেখা যাইবে, তখন মৃত্তিকা খনন করি ঐ সকল পলাণ্ডু বাহির করিতে হইবে। পলাণ্ডু পক্ক হইলে, তাহার গা গুলি শুষ্ক হইয়া যায়। উত্তমরূপ পলাণ্ডু জন্মিলে, কাঠায় চারি মনের অধিক জন্মিতে পারে। ভাল করিয়া আবাদ করিলে, ন্যূন বল্পে তিন মা

কম প্রায় যায় না। প্রত্যেক বিঘায় উর্ব্বরতা ও আবাদানুসারে ৫০।৬০ মনের অন্যূন ও ৮০।৯০ মনের অনধিক জন্মিতে পারে। ভাল করিয়া আবাদ করিলে যখন ৫০।৬০ মনের কম পিঁয়াজ হয় না, তমন এক টাকা পাঁচ সিকা মণ বিক্রয় করিলে ও প্রতি বিঘায় ৬০।৭৫ টাকা লাভ হইতে পারে। আবাদ খরচা ৮।১০ টাকা শাক বিক্রয় করিয়া হইতে পারে। যে সকল জমিতে পলাণ্ডু জন্মে, তাহাতে বৎসরে ৩।৪ প্রকার ফসল জন্মিতে পারে। এখানকার কৃষকেরা পলাণ্ডুর চাষ করিলে যে বিলক্ষণ লাভবান হয়, তাহার সন্দেহ নাই। এই সকল লাভের কথা তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেও বুঝে না। উত্তমরূপে আবাদ করিলে, প্রত্যেক বিঘায়, প্রায় একশত টাকার ফসল জন্মে। এদেশে ইক্ষু ব্যতীত এরূপ লাভজনক ফসল আর নাই। ইক্ষু চাষে বিস্তর পরিশ্রম ও বিস্তর অর্থ ব্যয় করিতে হয়, কিন্তু পলাণ্ডু চাষে সেরূপ পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিতে হয় না। অথচ অল্পায়াসে ও অল্প ব্যয়ে বিলক্ষণ লাভ হইয়া থাকে।

বশম্বদ——

শ্রীরাজ নারায়ণ বিশ্বাস

আহার বেলমা।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় কৃষি কার্য্যের প্রতি তদ্দেশীয় গবর্ণমেণ্টের যত্ন।

আমরা প্রথম খণ্ডের নবম সংখ্যক কৃষিতত্ত্বে "কৃষিকার্য্য ও দেশীয় গবর্ণমেণ্ট" শিরোনামে যে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহা পাঠ করিয়া শ্রীযুত বাবু হরিদাস মিত্র এলাহাবাদ হইতে আমাদিগকে এক পত্র লিখিয়াছেন। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় গবর্ণমেণ্ট তদ্দেশীয় কৃষি কার্য্যের উন্নতি নিমিত্ত কিরূপ যত্ন করিয়া থাকেন, ঐ পত্রে তাহার কতকগুলি বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে। আমরা ঐ পত্র খানি হইতে উক্ত বিবরণ গুলি, অদ্যকার প্রস্তাবের মধ্যে সঙ্কলন করিয়া দিব।

আমরা বঙ্গ দেশীয় কৃষির উন্নতি নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের নিকট যতই কেন ক্রন্দন করি না এবং উক্ত বিষয়ে মনোযোগ ও উৎসাহ দান করেন না বলিয়া যতই কেন তাঁহাদের নিন্দাবাদ প্রচার করি না, কোন রূপেই ফলোদয়ের সম্ভাবনা নাই। কারণ তাঁহারা জমিদারের হস্তে ভূস্বামিত্ব অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত আছেন। বঙ্গদেশে ইংরাজ অধিকারের পুর্ব্বে রাইয়তদিগের সহিতই প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে জমির বন্দোবস্ত হইত। জমিদারেরা শতকরা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে কমিসন্ লইয়া রাজস্ব আদায় করিয়া দিতেন। বঙ্গদেশে ইংরাজ অধিকারের পর ১৭৭৭ খৃঃ অব্দ হইতে জমিদারের সহিত এক বৎসরের জন্য জমির বন্দোবস্ত করার প্রথা প্রচলিত হয়। জমিদারদিগের হস্তে অত্যল্প কালের জন্য ভূমির অধিকার প্রদান করায় ভূমির উৎকর্ষ সাধিত হয় না এবং আনুষঙ্গিক নানাবিধ গোলযোগ ঘটিতে লাগিল দেখিয়া ১৭৮৬ খৃঃ অব্দে কোম্পানির ডিরেকটরেরা জমিদারদিগের সহিত দীর্ঘ কালের জন্য কিম্বা চিরকালের জন্য জমির বন্দোবস্ত করিবার আদেশ প্রদান করেন। তদনুসারে লর্ড কর্ণওয়ালিস্ ১৭৯৩ খৃঃ অব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সৃষ্টি করেন। এই ঐতিহাসিক বিবরণ দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, ভূমির উৎকর্ষ সাধনের ভার জমিদারের হস্তে অর্পিত হইয়াছে। কারণ ঐ বন্দোবস্ত দ্বারা জমিদারকেই প্রকৃত ভূস্বামী করা হইয়াছে। অতএব বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট অপেক্ষা বঙ্গদেশীয় জমিদারগণই ভূমির উৎকর্ষ সাধন বিষয়ে অধিকতর দায়ী। তবে জমীদারেরা আপনাদিগের কর্ত্তব্য

সাধন করিতেছেন কি না অথবা করেন না কেন, তাহার অনুসন্ধান করা, গবর্ণমেণ্টর অবশ্য কর্ত্তব্য ব'লিয়া বোধ হয়। কিন্তু এই কর্ত্তব্যতা কেবল তাঁহাদের প্রজা হিতৈষার উপর নির্ভর করিতেছে। প্রজার দুঃখ দেখিয়া যদি গবর্ণমেণ্টের প্রাণ কাঁদে এবং তাহাদিগের উন্নতি করিবার জন্য তাঁহাদিগের হিতৈষা বৃত্তি উচ্ছসিত হইয়া উঠে, তবেই তাঁহারা ঐ অনুসন্ধান লইতে পারেন; নতুবা ভূমির উৎকর্ষ সাধিত না হইলে প্রকৃত পক্ষে তাঁহাদের কোন ক্ষতি নাই। যেহেতু জমিদারের নিকট হইতে বার্ষিক নির্দ্দিষ্ট পরিমিত রাজস্ব আদায় করা ভিন্ন ভূমির সহিত তাঁহাদের আর কোন সম্বন্ধ নাই। জমিদারেরও, নির্দ্দিষ্ট সময়ে নিরূপিত রাজস্ব প্রদান করিতে পারিলে আর কোন দায় নাই। প্রত্যক্ষ স্বার্থই কার্য্যের প্রধান প্রবর্ত্তক। না গবর্ণমেণ্ট,—না জমিদার, কেহই ভূমির উৎকর্ষ সাধনে স্বার্থ দেখিতে পান না। বঙ্গীয় ভূমি কেবল তাঁহাদের দয়া-ধর্ম্মের উপর নির্ভর করিতেছে। বোধ হয়, এই জন্যই বঙ্গদেশীয় কৃষির অবস্থা এত শোচনীয়।

ভূস্বামিত্ব নিজ হস্তে না থাকিলে যে দেশীয় কৃষিকার্য্যের প্রতি রাজার মনোযোগ ও উৎসাহ থাকে না; বঙ্গ দেশ তাহার দৃষ্টান্ত এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও মান্দ্রাজ তাহার বিপরীত দৃষ্টান্ত স্থল। ঐ দুই প্রদেশে বাঙ্গালার ন্যায় জমিদারী বন্দোবস্ত নাই, তথায় "রাইয়তোয়ারি" বন্দোবস্ত প্রচলিত। গবর্ণমেণ্টই ঐ দুই প্রদেশের প্রকৃত ভূস্বামী। জর্জ বার্লোর শাসন কালে ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে মান্দ্রাজের তদানীন্তন গবর্ণর লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের উদ্যোগে মান্দ্রাজে এবং বেণ্টিঙ্ক বাহাদুর ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারল হইলে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ৯ আইন দ্বারা উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে উক্তবিধ বন্দোবস্ত প্রচলিত হয়। ঐ দুই প্রদেশের কৃষিকার্য্যের প্রতি প্রদেশীয় গবর্ণমেণ্টের যেরূপ উৎসাহ ও উদ্যোগ, তাহা দেখিয়া বোধ হয়, বাঙ্গালার রাজস্ব বন্দোবস্ত কর্ণওয়ালিসের হাতে না হইয়া, বেণ্টিঙ্কের হাতে হইলে বঙ্গ দেশীয় কৃষির অবস্থা এরূপ জঘন্য হইত না। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় কৃষির প্রতি তদ্দেশীয় গবর্ণমেণ্টের কিরূপ যত্ন ও উৎসাহ, অদ্য তাহারই কিঞ্চিৎ বর্ণন করিয়া এই প্রস্তাব শেষ করিব, পরে ক্রমশঃ মান্দ্রাজ ও বাঙ্গালার কৃষির অবস্থা প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিব।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় গবর্ণমেণ্টের খাস বন্দোবস্তে ঐ প্রদেশের অনেক স্থানে

কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। ঐ সমস্ত কৃষিকার্য্য সম্বন্ধীয় যাবতীয় কর্ত্তব্যানুষ্ঠান ও তত্ত্বাবধান জন্য উক্ত গবর্ণমেণ্টের অধীনে এক জন ডিরেকটর্ আছেন। ঐ কৃষিজাত দ্রব্যাদির বাণিজ্য বিভাগও তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীন। সাহরণপুর, মুসরি ও কাজ্‌রি এই তিন স্থানে পরীক্ষার্থ তিনটী বোটানিক্যাল গার্ডেন আছে। তদ্ব্যতীত প্রয় যাবতীয় প্রধান প্রধান জিলায় এক একটী আদর্শ ক্ষেত্রে (Model firm) আছে। তন্মধ্যে গাজীপুর ও পুষানামক স্থানের অনেক ভূমিতে তামাকের আবাদ এবং অন্যান্য বহুবিধ পরীক্ষা হইয়া থাকে। উপরি উক্ত কৃষিক্ষেত্র সকলের মধ্যে কয়েকটীতে কয়েকজন ইউরোপীয় ও আমেরিকান কৃষি বিজ্ঞানবিদ্ তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত আছেন। ঐ সকল তত্ত্বাবধায়কদিগের অধীনে কতকগুলি করিয়া মালী, কৃষি ও উদ্যান কার্য্য বিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া অন্যান্য স্থানে প্রেরিত হইয়া থাকে।

সম্প্রতি দেরাদুন্ নামক স্থানে একটী কৃষি বিদ্যালয় স্থাপিত হইবে। ঐ বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগকে দেশীয় ও ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা প্রদান করা হইবে। ছাত্রদিগকে যে পরীক্ষা দিয়া বিদ্যালয়ে নিযুক্ত হইতে হইবে, যাঁহারা সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন, তাঁহারা কিছু২ বৃত্তি পাইবেন। ঐ সকল ছাত্র কৃষি বিদ্যায় শিক্ষিত হইলে, তাহারা অরণ্য বিভাগে এবং অন্যান্য কৃষি ক্ষেত্রে প্রেরিত হইবে।

গবর্ণমেণ্টের উদ্যান সমূহে যে সকল শস্যাদির চাস আবাদ হইয়া থাকে, তন্মধ্যে কয়েকটীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ হরিদাস বাবুর পত্রে বিবৃত হইয়াছে। যথা,—

১। পরীক্ষার্থ বামিয়া (Bamia) নামক এক প্রকার কার্পাসের আবাদ করা হইয়াছিল। তাহাতে উৎকৃষ্ট তুলা জন্মিয়াছে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় মেওর মিল কোম্পানি বলেন, তাহার ⁄১ সের লিবারপুলে প্রায় ।।৵১৫ পৌনে এগার আনা মূল্যে বিক্রয় হইতে পারে।

২। সাহারন্‌পুরের বাগানে রিয়া (Rhea) নামক এক প্রকার ঘাসের প্রচুর পরিমাণে আবাদ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি এই ঘাস হইতে সুতা বাহির করিবার জন্য উৎকৃষ্ট যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে পারিবেন, উক্ত গবর্ণমেণ্ট

তাঁহাকে এক কালে ৫০,০০০ পঞ্চাশ হাজার টাকা পারিতোষিক দানের অঙ্গীকার করিয়াছেন। এরূপ পুরস্কার লাভের অদৃষ্ট লইয়া ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে কেহ বর্ত্তমান আছেন বলিয়া বোধ হয় না। তবে তাঁহাদিগের ভবিষ্যৎ বংশে এরূপ লোকের আবির্ভাব অসম্ভব নহে।

৩। তামাকের চাস্ আবাদ জন্য সবিশেষ যত্ন হইতেছে।

৪। মাঠ কলাই অর্থাৎ চিনের বাদামের (Earthnut) চাস আবাদের পরীক্ষার্থ বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। এই শস্যের বীজ হইতে ফ্রান্স দেশে এক প্রকার তৈল প্রস্তুত হয়। এই জন্য মার্সেলিস্ নগরে উহার বিস্তৃত বাণিজ্য হইয়া থাকে। কিছু দিন পূর্ব্বে বর্ত্তমান গবর্ণর জেনারল্ ঐ প্রদেশীয় লোকদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য বলিয়াছিলেন, যদি কেহ মাঠ কলাইয়ের চাস ও বাণিজ্য করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তিনি তাঁহার সহিত মার্সেলিস্ দেশীয় বণিক্‌দিগের সংস্রব ঘটাইয়া দিতে পারেন। শুনা যায়, বারাসতের অন্তর্গত পাইঘাটি পরগণার মধ্যে উহার চাস আবাদ হইয়া থাকে। যদি মাঠ কলাইয়ের চাস আবাদের বিষয়ে কাহার কিছু জানা থাকে, পত্র দ্বারা আমাদিগকে তাহা জানাইয়া বাধিত করিবেন।

৫। ইউক্যালিপ্টাস্ (Eucalyptus) নামে এক জাতীয় বৃক্ষ আছে। প্রায় একত্রিশ প্রকারের ঐ বৃক্ষ সংগ্রহ করা হইয়াছে। মধ্যে পাইওনিয়ার (Pioneer) পত্রিকায় উহার গুণ ও উপকারীত বিষয়ে কিছু প্রকাশ করাইয়াছিল। ইহার গঁদ লৌহে মাখাইয়া ঐ লৌহ জলে কিম্বা অনাবৃত স্থলে ফেলিয়া রাখিলে দীর্ঘ কালেও মরিচা ধরে না। পুস্তকের পাতায় কিম্বা অন্য কোন বস্তুতে উহার গঁদ ঘর্ষণ করিয়া রাখিলে, তাহাতে উই, ঘুণ কিম্বা পোকা কখনই ধরিতে পারে না। হরিদাস বাবু, কৃষিতত্ত্বের পাঠকদিগকে ঐ বৃক্ষের বাঙ্গালা নাম জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।

ইহার পর, হরিদাস বাবু, বঙ্গদেশীয় কৃষিকার্য্যের প্রতি গবর্ণমেণ্টের কিছুমাত্র যত্ন নাই;—ইত্যাদি উক্তি সহকারে আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন এবং ভারতবর্ষ যে রত্ন প্রসবিনী বলিয়া পৃথিবীতে বিখ্যাত ও বিদেশীয়বর্গের নিকট মহা গৌরবান্বিত, ভারতীয় শস্য সম্পত্তিই তাহার কারণ ইত্যাদি কয়েকটী কথার উল্লেখ করিয়া উহা হইতে কত টাকার কি২ শস্য

বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে, তদ্বিষয়ে পাইওনিয়ার হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

উপসংহারে হরিদাস বাবুকে আমাদের বক্তব্য এই যে, তিনি মধ্যে২ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় কৃষি বিষয়ক বিবরণ সকল প্রেরণ করিয়া কৃষিতত্ত্বের পুষ্টি বর্দ্ধন করিবেন।

পত্র প্রেরকের প্রতি।

জিলা ময়মনসিংহের অন্তর্গত সুসঙ্গ দুর্গাপুরস্থ শ্রীযুক্ত রাজা কমলকৃষ্ণ সিংহ বাহাদুর তত্ত্ব জিজ্ঞাসু হইয়া এক খানি পত্র দ্বারা কয়েকটী প্রশ্নোত্থাপন করিয়াছেন। নিম্নে উত্তর সহ যথাক্রমে তাঁহার প্রশ্নগুলি প্রকাশ করা গেল।

১। ফুল কপির বীজ এদেশে রাখা যাইতে পারে কি না? যদি পারা যায়, তবে কি কি উপায়ে রাখিতে হইবে?

যে সকল ফুল কপিতে বৃহৎ ও সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্ন ফুল জন্মিবে, তাহার কয়েকটী অতি যত্নের সহিত তুলিয়া পৃথক্ স্থানে রোপণ করিতে হয়। ঐ গাছ এরূপে তুলিতে হইবে যেন, পৃথক্ স্থানে রোপিত হইয়া কোনক্রমেই মারা না যায়। প্রতিদিন অধিক পরিমাণে জল সেচিতে হইবে। কিছু দিনের মধ্যেই ঐ ফুলের ভিতর হইতে মুলা বা সর্ষপের ন্যায় পুষ্প শাখা নির্গত হইয়া তাহাতে ফল ধরিবে। ঐ ফলের মধ্যেই ফুল কপির বীজ জন্মিবে।

২। কি উপায়ে গোলাপদলের হ্রাস বৃদ্ধি ও তাহা নানাবিধ বর্ণ বিশিষ্ট হইয়া থাকে?

গোলাপ গুল্মের মুলে সার দান ও তাহার পাইটের তারতম্যে দলের ও বর্ণৌজ্জ্বল্যের হ্রাস বৃদ্ধি হইতে পারে; কিন্তু এক বর্ণ হইতে অপর বর্ণোৎপাদনের কোন উপায় নাই। দ্বাদশ সংখ্যক কৃষিতত্ত্বে গোলাপ ফুলের যে রূপ পাইটের বিষয় লিখিত হইয়াছে, ঠিক্ সেইরূপে কার্য্য করিতে পারিলে গোলাপের যথোচিত উৎকর্ষ সাধিত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ একটী ক্রম নিম্ন সানুবাঁধান স্থানে গোময় রাশীকৃত করিয়া রাখিলে, তাহার যে রস ক্রমশঃ নির্গত হইয়া নিম্ন স্থানে সঞ্চিত হয়, সেই রস পৌষ মাসের শেষে কিম্বা মাঘের

অর্থাৎ দক্ষিণ বায়ু প্রবাহ আরম্ভের পূর্ব্বে গোলাপ মূলে সিঞ্চন করিতে পারিলে ফুল বড় ও উজ্জ্বলবর্ণ হইয়া থাকে।

৩। "বান্ধাকপি" এই নাম মাত্র লিখিত আছে। কিন্তু তাহা কিরূপে হইবে? যদি বাঁধিতে হয়, তবে চারার কোন্ অবস্থায় কিরূপে বাঁধিতে হইবে? কপি সতেজ ও বড় হইলে প্রায় বাঁধিয়া দিবার প্রয়োজন হয় না, আপনিই তাল বাঁধিয়া যায়। তাদৃশ কপি বাঁধিয়া দিলে আরও ভাল হয়। অর্থাৎ অনেক গুলি পাতা তালে সংযুক্ত হয় এবং তালের বাহিরের পাতা গুলিও অপেক্ষাকৃত শুভ্র ও কোমল থাকে। কপি অপেক্ষাকৃত ছোট ও নিস্তেজ হইলেই কলার ছোটা কিম্বা এলো কোষ্টা দিয়া একটা বেড় দিয়া দিতে হয়। যখন ২।৪টী পাতায় কোঁকড়া ধরে তখনই বাঁধিবার উপযুক্ত সময়।

৪। ঘাসের বীজ কোন্ সময় কি প্রকার মৃত্তিকায় বপণ করিতে হয়? তদ্দ্বারা গো-ঘোটকাদির কোন বিশেষ উপকার আছে কি না?

আটাল ও দোআঁশ মৃত্তিকার ভূমি সর্ব্ব প্রকার ঘাসের পক্ষে উপযোগী। ঐরূপ ভূমি উত্তমরূপে কর্ষণ করিয়া পুনঃ২ মই দিয়া মৃত্তিকা চূর্ণ ও সমান করিতে হয়। কার্ত্তিক বা অগ্রহায়ণ মাসে ঐরূপ জমিতে ঘাসের বীজ বপণ করা যায়। লুসারন্ ও ক্লোবার নামক দুই জাতীয় ঘাস অশ্ব গবাদির পক্ষে বিশেষ উপকারী। কাঁচা কি শুস্ক সকল অবস্থাতেই ঐ ঘাস বিশেষ পুষ্টিকর।

শ্রীযুক্ত বাবু তারিণীচরণ সেন,— আপনি যে সকল বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছেন, কৃষিতত্ত্বের প্রথম খণ্ডে সময়ে২ তাহার অধিকাংশই লিখিত হইয়াছে। অবশিষ্ট গুলি দ্বিতীয় খণ্ডের কোন২ সংখ্যায় দেখিতে পাইবেন। মনোযোগ পূর্ব্বক কৃষিতত্ত্ব-পাঠ করা থাকিলে আপনাকে এত অধিক প্রশ্নোত্থাপনের ক্লেশ স্বীকার করিতে হইত না। আপনি পূর্ব্বে আর একখানি পত্রদ্বারা আমাদিগকে কয়েকটী কথা জিজ্ঞাসা করেন, প্রথম খণ্ডের ১৪৭ পৃষ্ঠায় তাহার উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে। আপনি পুনরায় সেই সকল কথার উল্লেখ করিয়াছেন।

তামাক।

তামাক চাসের নিমিত্তে উর্ব্বরা বালিয়া মাটী অতিশয় উপযোগী যেহেতু যে পর্য্যন্ত চারা পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত না হয় সে পর্য্যন্ত উক্ত মৃত্তিকা তাহাকে স্নিগ্ধ ও আর্দ্র রাখে পরন্তু গাছ প্রস্তুত ও পাতা সকল পক্ক হইলে তাহা নীরস হইয়া যায়। এই চাসের জন্য ভূমিতে উত্তমরূপে সার মিশ্রিত করা কর্ত্তব্য। সচরাচর গোময় এবং নীল খাগড়ার সার দেওয়া যায় কিন্তু শেষোক্ত পদার্থের বিশেষ আদর আছে কারণ তদ্দ্বারা বহুতর বিস্তীর্ণ বালুকাময় মরুভূমি কৃষি কার্য্যের যোগ্য হইয়াছে। তাহা এইরূপে ব্যবহার হয়, যথা—প্রথমতঃ লাঙ্গল দ্বারা ক্ষেত্র সকল কর্ষিত করিয়া হৌজ হইতে নিক্ষিপ্ত আর্দ্রীভূত নীল খাগড়া সকল লইয়া ক্ষুদ্র২ স্তূপাকারে মৃত্তিকার তেজঃ বিবেচনা করিয়া কিঞ্চিৎ২ অন্তরে রাখিতে হইবেক। পরে ঐ সকল স্তূপের উপরে এক২ চাপড়া মৃত্তিকা দিবেক। অনন্তর কিঞ্চিৎ কালান্তে তাহা পচিয়া উঠিলে হল চালনা করিলে চারা রোপণার্থ মৃত্তিকা প্রস্তুত হইবেক।

চারা উৎপাদনের প্রকরণ।—সচরাচর আগষ্ট মাসের শেষে অথবা সেপ্টেম্বরের প্রথমে বীজ বপন হয়। বীজের কেয়ারী সকল উত্তম মৃত্তিকায় উচ্চ করিয়া সুন্দররূপে নির্ম্মিত করিবে যে তাহাতে কাঠী বা কোন কঠিন দ্রব্য না থাকিতে পায় অপর অতি গভীর খাতে বীজ বুনিতে হইবেক। যদি ভারি বৃষ্টি হয়, তবে তাহার ক্ষতিকর উৎপাত হইতে চারা সকলকে রক্ষা করণার্থ ক্ষুদ্র২ তৃণাচ্ছাদিত চালা অগ্রে প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হইবেক। কেহ২ এরূপ করে যে পর্য্যন্ত চারা সকল ভূমি হইতে উত্থিত না হয় তাবৎ পর্য্যন্ত পাতলা করিয়া পোআলীর ছাউনী দ্বারা আচ্ছাদন দেয়। বীজ বুননের ১৫ বা ২০ দিবস পরে চারা বহির্গত হয়। অপর কেয়ারীতে যখন চারা বৃদ্ধি হইবে তখন তৃণাদি নিড়াইয়া সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিতে হইবে এবং বৃষ্টির বিড়ম্বনা হইতেও রক্ষা করিতে হইবে।

চারা রোপণ এবং তদনন্তর যে রূপ বিধান করা আবশ্যক তদ্বিবরণ।—আকুটোবর মাসের প্রথম ক্ষেত্রে চারা লইয়া রোপণ করণের উপযুক্ত কাল।

তখন চারাতে ৫টি কিম্বা ৬টি পাত ধরে। এইরূপ রোপণের কার্য্য ডিসেম্বরের মধ্যভাগে সম্পূর্ণ হয়। তৎপরে যাহা রোপিত হয় তাহাতে উত্তম ফসল জন্মে না যেহেতু সে সময়ে মৃত্তিকা অতিশয় শুষ্ক হয় সুতরাং তাহাতে নবীন বৃক্ষের শিকড় প্রবিষ্ট না হওয়াতে তাহা বৃদ্ধি পায় না। এরূপ দেখা গিয়াছে যে নিম্ন জলাভূমিতে জানুয়ারি মাস পর্য্যন্ত রোয়া হইয়াছে ; কিন্তু এ প্রকার ভূমিতে মধ্যম প্রকার তামাকও জন্মে না। নীলকাঠী এবং গোবরের দ্বারা উক্তমত উত্তমরূপে সার দিয়া ক্ষেত্রে ভাল করিয়া লাঙ্গল দিতে হয়, এবং যে প্রকার শাকাদি জন্মাইবার নিমিত্ত উৎকৃষ্টরূপে মৃত্তিকার পাটী হইয়া থাকে, তামাকের ক্ষেত্রেও তদ্রূপ যত্ন করিতে হয়। ২। ৩ ফীট অন্তরে চারার শ্রেণী সকল স্থাপন করিবেক এবং প্রতি শ্রেণীতে এক চারা হইতে অপর চারা উক্তরূপ অন্তরে রোপণ করিবেক। যদি মৃত্তিকা শুষ্ক হইয়া যায় তবে যে পর্য্যন্ত শিকড় না নামিবেক তাবৎ পর্য্যন্ত জল দিতে হইবেক। রৌদ্র হইতেও চারাসকলকে রক্ষা করা পরামর্শ সিদ্ধ। এ নিমিত্ত কাঁচা কলা গাছের বাকুড়া এক২ ফুট লম্বা করিয়া কাটিয়া দেয়, তদ্দ্বারা অতি পরিপাটীরূপে সূর্য্যাতপ হইতে কোমল চারা সকল রক্ষিত হইয়া থাকে। এ স্থলে ইহাও বক্তব্য, যে কপি চারা স্থানান্তর করিবার সময়েও উক্ত প্রকারে আচ্ছাদন দিয়া থাকে। পরে চারা সকল বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে মৃত্তিকা উত্তমরূপে খুসিয়া ও বনগাছ নিড়াইয়া সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার রাখা কর্ত্তব্য, এই কার্য্য সহজে সাধনার্থ এক খানা ক্ষুদ্র বিদাকাঠী উভয় শ্রেণীর মধ্য দিয়া উভয় দিগে অর্থাৎ উত্তর হইতে দক্ষিণ এবং পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে সঞ্চালিত হয়। তাহাতে উক্ত যন্ত্র মূল সপর্শ না করিয়া কিঞ্চিৎ অন্তর দিয়া চলিয়া যায়। এই প্রকরণ পুনঃ২ করিতে হয়। বিদাকাষ্ঠ দ্বারা যে সকল আগাছা উৎপাটিত না হয় সে সকল পেষণ অথবা নিড়ানী দ্বারা নিরাকৃত হইয়া থাকে। যদি মৃত্তিকায় উপযুক্ত মত সার দেওয়া না হয় তবে খলী ও গোময় একত্র করিয়া তাহার গুঁড়া মূলের চতুষ্পার্শ্বে দিয়া মৃত্তিকায় মিশ্রিত করিয়া দিতে হয়। যে সময়ে চারায় বড়২ পাঁচ ছয় টা পাতা বাহির হয় সেই সময় তাহার বৃদ্ধি নিবারণ নিমিত্ত পুষ্প মঞ্জরী সকল ভাঙ্গিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য, তাহাতে নূতন২ ফেঁকড়ী ও পল্লব গজিয়া উঠিবে, সে সমুদায় নির্গত হইবা মাত্র যত্নপূর্ব্বক ভাঙ্গিয়া দিতে হইবেক। এরূপ করণের ফল এই যে তদ্দ্বারা অতি দীর্ঘ ও উত্তম গুণ শালি

পত্র সকল পাওয়া যাইবেক, যেহেতু চারার সমুদায় রস পত্র নি ঃরেই উম্খিত হয়। উক্ত প্রকরণ সমাপ্ত হইলে চারার নীচে যে সকল ক্ষুদ্র২ পাতা থাকে, তত্তাবৎ ভাঙ্গিয়া লইয়া কিয়দ্দিবস মৃত্তিকার উপর রাখিয়া শুখাইয়া ছোট২ আটী বাঁধিয়া ছাদের নিম্নে ঝুলাইয়া রাখা যায়। এই সকল পাতা দুঃখি লোকেরা হুকায় সাজিয়া খায়।

পাতা কাটুনী ও প্রস্তুত করণ।—যখন পত্র সকল সুপক্ক অর্থাৎ হরিদ্বর্ণের পরিবর্ত্তে ঈষৎ পীত বর্ণ ও আশু ভঞ্জনীয় হয় এবং তাহার সমুদয়াংশ অসমান তথা কুঞ্চিত হয় তখনি কাটুনীর কর্ম্মারম্ভ হইয়া থাকে। কাটিবার সময় কিঞ্চিৎ২ বৃক্ষের ছাল সুদ্ধ কাটিয়া লইতে হয়। পরে পত্র সকল কাটা হইলে ভূমির উপর এরূপ নিয়মে বিস্তৃত করিয়া শুখাইতে হইবেক যে তাহারদিগকে নোয়াইলে না ভাঙ্গে অর্থাৎ মড়্‌মড়িয়া না হয়। অনন্তর সে সকল লইয়া ছায়ায় রাখিবেক। পরন্তু প্রয়োজনানুসারে ২ কি ৪ টা করিয়া পাতা লইয়া আটি বান্ধিয়া বাখারির উপর হালি গাঁথিয়া পুনশ্চ তত্তাবৎ স্বল্প তৃণাচ্ছাদিত চোঙ্গা চালের নীচে ঝুলাইয়া রাখিতে হইবেক তথায় ঈষৎ পিঙ্গলবর্ণ হইলে সে সকল লইয়া এক গৃহের চালের নীচে ঊর্দ্ধ স্থান হইতে অধোভাগ পর্য্যন্ত একটার পর আর একটা, এইরূপ সারি করিয়া সাজাইতে হইবেক। সেখানে সে সকল উত্তম রূপে শুষ্ক হইলে নামাইয়া লইয়া নানাবিধ আকারে আটিবন্ধ করে কিন্তু ঐ বিষয়ে এরূপ সতর্কতার আবশ্যক যেন মেঘাচ্ছন্ন দিনে এই কর্ম্ম সম্পন্ন হইতে পারে যেহেতু রৌদ্রের সময় পত্র সকল শুখাইলে ঠুনকা হইয়া উঠিবাতে নষ্ট হয়। এ দেশে পাতা ঘামাইবার ও গাঁজিবার প্রথা নাই কিন্তু এখানে যে সামান্য নিয়মে পাতা নির্দ্দোষ করা যায়, তৎপরিবর্ত্তে কিউবা দেশের প্রচলিত নিয়মাবলম্বন করিলে অত্যুৎকৃষ্ট তামাক উৎপন্ন হইতে পারে। অপর আটি বাঁধিবার সময় নুতন বিচালীর লঘু আচ্ছাদন ব্যবহার করা যায়।

কৃষি এবং উৎপত্তির পরিমাণ প্রভৃতি।—এ বিষয়ের পরিমাণ নিশ্চয় রূপে স্থির করা যায় না অনুমান হয় প্রতি বৎসর লক্ষ মোন উৎপন্ন হয়। এতৎ পরিমাণ বিঘা করিয়া অবধারিত হইল। এই জিলায় আনুমানিক তিন লক্ষ বিঘায় তামাক চাস হয়; তামাকের সহিত নীল চাসের তুলনা করাতে দেখা

গিয়াছে যে স্থলে নীলের চাস এক বিঘা সে স্থলে তামাকের চাস তিন বিঘা ভূমিতে আছে সুতরাং ঐ জিলায় নীলের চাস এক লক্ষ বিঘায় হইয়া থাকে। সেরাজগঞ্জ, পাবনা, কালনা এবং বাঙ্গালা দেশের নিম্ন প্রদেশের যাবতীয় বন্দর ও গঞ্জের মহাজনদিগের হস্তেই রঙ্গপুরীয় তামাকের ব্যবসা রহিয়াছে, তাহারা বর্ষাকালে বড়২ নৌকা করিয়া আসিয়া ভরপূর বোঝাই লইয়া উপরি উক্ত স্থান সকলে লইয়া যায়। মগেরাও নৌকা করিয়া আসিয়া বহুল পরিমাণে ক্রয় করে। উৎপত্তি এবং অন্যান্য কারণানুসারে ২ টাকা হইতে ৩ টাকা পর্য্যন্ত বাজার দরে প্রত্যেক মোনের মূল্যের ন্যূনাতিরেক হয়। যদবধি ঐ জিলায় নীলের ব্যবসা চলিয়াছে তদবধি নীল খাগড়ার উর্ব্বরাকারত্ব গুণ বিধায় প্রচুর পরিমাণে সার পাওয়াতে তামাকের চাস বৃদ্ধি হইয়াছে। প্রজারা এই দ্রব্যের কৃষির নিমিত্ত দিবা রাত্রি পরিশ্রম করে। তাহাতেই তাহারা ভূম্যধিকারি এবং মহাজনদিগের গুরুতর দাবী দিতে সক্ষম হয়। কোন্ সময়ে তামাক এদেশে চলিত হইয়াছে তাহা নিশ্চয় বলা যায় না কিন্তু বাঙ্গালা তামাক শব্দের সহিত পর্ত্তুগীস তাবাকা শব্দের ঐক্য বিধায় বোধ হয় পর্ত্তুগীস জাতিরাই আনিয়া থাকিবেক। পাতা পাকিবার সময় যদি ঐ জিলার ভারি শিলা বৃষ্টি হয় তাহা হইলে তামাকের পত্র আশু ভঙ্গনীয় বিধায় অত্যন্ত ক্ষতি হইয়া থাকে তাহাতে অনেক প্রজার সর্ব্বনাশ হইয়া যায়।—ভারতবর্ষীয় কৃষি বিষয়ক বিবিধ সংগ্রহ।

কৃষিতত্ত্বের মূল্য প্রাপ্তি।

১।	শ্রীযুত বাবু পূর্ণচন্দ্র রায়, সোদপুর, ফরিদপুর, ...	২,
১।	,, কেদারনাথ বাগচি, কৃষ্ণনগর, ...	৩।৶০
৩।	শ্রীযুত রায় ধনপৎ সিংহ বাহাদুর, আজিমগঞ্জ, ...	২॥০
৪।	শ্রীযুত রাজা রাজেন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর, জয়দেবপুর, ঢাকা,	৩।৶০
৫।	মেং বি, আর, টেকসিরা, চট্টগ্রাম, ...	৫,
৬।	শ্রীযুত বাবু শ্যামাপ্রসাদ রায় চৌধুরী, কাশিপুর ধামরাই, ঢাকা,	২,
৭।	শ্রীযুত গোলাম লালুবাই, ডেপুটি কালেক্টার, কিষ্ণগঞ্জ, পূর্ণিয়া,	২,
৮।	শ্রীযুত বাবু ভুবনমোহন সেন, আ[illegible]নপুর, ...	৩।৵০
৯।	শ্রীযুত রাজা দুর্গানাথ রায়, কু[illegible]ঘাটা, বহরমপুর, ...	২,
১০।	শ্রীযুত বাবু মদনমোহন তেও[illegible]রি, মুরাদপুর, বর্দ্ধমান, ..	৩॥/১০
১১।	শ্রীযুত রাজা কৃষ্ণেন্দর রা[illegible] বাহাদুর বলিহার, রাজসাহি, ...	২,
১২।	শ্রীযুত ডাক্টার রা[illegible]দাস সেন, বহরমপুর, ...	১॥/০
১৩।	শ্রীযুত বাবু হরি[illegible]চন্দ্র দাস গুপ্ত, বৌ বাজার, ...	৩।৶০
১৪।	,, বাবু [illegible]রাপ্রসন্ন সান্যাল, খালিসপুরা, কাশী, ...	৪৸৶০
১৫।	,, যশোদালাল রায়, বেলিয়াটি, ...	৩,
১৬।	,, নবীনচন্দ্র রায়, ব্রহ্মগ্রাম, মুণ্ডি, ...	২,
১৭।	,, হরনাথ বসু, কলিকাতা, ...	১,
১৮।	,, শিবকালি বন্দ্যোপাধ্যায়, হুগলী, ...	৫,
১৯।	শ্রীযুত রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ রায়, জেমুয়াকান্দি, ...	২,
২০।	শ্রীযুত বাবু হরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য চৌধুরী, মুক্তাগাছা, মাইমনসিংহ, ...	২,
২১।	,, গোবিন্দচন্দ্র বসাক, শ্রীহট্ট, ...	১,
২২।	,, দুর্গাপ্রসন্ন ঘোষ, কলিকাতা, ...	২,

পাইকপাড়া নর্শরির নিয়মাবলি।

বার্ষিক চাঁদা বীজের প্যাকিং খরচা সমেত ১৩, টাকা।

কলিকাতা ও তন্নিকটস্থ গ্রাহকগণের বার্ষিক চাঁদা তদ্বাদে ১২, টাকা [illegible]াহাদের বীজের প্যাকিং খরচা লাগে না।

যাঁহারা নর্শরির গ্রাহক হইবার ইচ্ছা করেন ইস্তক জানুয়ারি নাগাইদ মার্চ [illegible]সের মধ্যে শ্রেণীভুক্ত হইলে তাঁহারা বৎসরের বেবাক বীজাদি ও সমস্ত [illegible]খ্যা কৃষিতত্ত্ব পাইবেন।

যাঁহারা পূর্ব্ব হইতে নর্শরির গ্রাহক শ্রেণিভুক্ত আছেন, তাঁহারা অগ্রিম ১৫, [illegible] চাঁদা দিলে সময়২ যেরূপ বীজাদি পান তদ্ব্যতীত কৃষিতত্ত্বও পাইবেন.

৩ সংখ্যা।

কৃষিতত্ত্ব।

মাসিক পত্রিকা।

দ্বিতীয় খণ্ড।

চৈত্র, ১২৮৬।

পাইকপাড়া নর্শরি হইতে প্রকাশিত।

সূচী।

Serampore:

PRINTED BY B. M. SEN, AT THE "TOMOHUR" PRESS.

1880.

বিজ্ঞাপন।

কৃষিতত্ত্ব সম্পাদকের বিশেষ উক্তি।

এ দেশীয় শস্যাদির আবাদ বিষয়ক পত্র ও কৃষি বিষয়ক প্রচলিত প্রবাদ সকল যিনি আমাদিগের নিকট প্রেরণ করিবেন, আমরা তাহা সাদরে গ্রহণ ও কৃষিতত্ত্বে প্রকাশ করিব। কৃষি কি উদ্যান কার্য্য সম্বন্ধীয় কোন প্রশ্ন আমাদিগের নিকট পাঠাইলে, আমরা সাধ্যানুসারে কৃষিতত্ত্বে তাহার উত্তর দিবার চেষ্টা করিব।

কৃষিতত্ত্বে প্রকাশিত প্রবন্ধ সকল, সম্পাদকের বিনানুমতিতে কেহ পুস্তক বা পত্রিকাকারে প্রকাশ করিতে পারিবেন না।

মূল্যের নিয়ম।

		মূল্য।	ডাক মাসুল।	মোট।
অগ্রিম বার্ষিক,	...	৩৲	।৵০	৩।৵০
পশ্চাদ্দেয়,	...	৩॥০	।৵০	৩৸৵০

ডাকের টিকিট পাঠাইলে ফি টাকায় এক আনা হিসাবে কমিসান স্বতন্ত্র দিতে হইবে।

এই পত্রিকা প্রতি বাঙ্গালা মাসের মধ্যে বাহির হইবে।

কৃষিতত্ত্বের চাঁদা অগ্রিম দেয়। গ্রাহকগণ মূল্য না পাঠাইলে এক খণ্ডের অধিক পাঠান যাইবে না। এই পত্রিকাতেই গ্রাহকগণের প্রদত্ত মূল্যের প্রাপ্তি স্বীকার করা যাইবেক।

মাঘ ও ফাল্গুন মাসে রোপণ যোগ্য হরেক রকমের সবজির বীজ যথা, চৈতে শসা, কাঁকুড়, ফুটি, তরমুজ, খেঁড়ু চাঁপা-নটে ও অন্যান্য শাকের বীজ, দেশী ও বিলাতী কুমড়া, উচ্ছে ইত্যাদির বীজ সকল বিক্রয়ার্থ নর্শারিতে মজুত আছে, মূল্য মায় প্যাকিং ১৲ টাকা।

হরেক রকমের ফল ফুলের ও ২০০ রকম গোলাপের কলম, সুগন্ধ পাতার গাছ, বাটী সাজাইবার টবের গাছ নর্শারিতে পাওয়া যায়, গাছের মূল্যের তালিকা, এবং গাছ ও বীজের জন্য কৃষিতত্ত্ব সম্পাদকের নিকট লিখিতে হইবে।

নিম্ন লিখিত কৃষি বিষয়ক পুস্তক পাইকপাড়া নর্শারিতে পাওয়া যায়।

কৃষি চন্দ্রিকা, উমেশচন্দ্র সেন গুপ্ত প্রণীত;

মূল্য ॥০ আট আনা, ডাক মাসুল ৵০

ভারতবাসীদের এইক্ষণ প্রধান কর্ত্তব্য কি

(গত প্রকাশিতের পর।)

যে জাতির যে বিষয়ে ঐকান্তিকী-স্পৃহা, তদনুরূপ কার্য্য সাধনেই সেই জাতি সমধিক পারদর্শী এবং তাহাতেই তাহাদের অসীম গুণবত্তার পরিচয় দেদীপ্যমান রহিয়াছে। ফ্রান্সের যাহা কিছু দেখ, সমস্তই অবিশ্রান্ত-রক্তপাত ও তরবারি ফলক। ইংলণ্ড কি অন্যান্য উন্নতি-শীল-স্বাধীন জাতির সমস্ত কার্য্য কলাপেই বীরত্ব ও একাগ্রতা বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রাচীন-ভারতে বিশেষতঃ উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ-বাসীদেরও "কালে" কোন দিন তাহাই পরিলক্ষিত হইত। পরন্তু একটী বিষয়ে সমস্ত ভারতীয় আর্য্য-জাতিরই ঐকান্তিকী-শ্রদ্ধা ও আন্তরিক অভিপ্রায় বিরাজমান রহিয়াছে। সেটী— ধর্ম্মভাব ও ধর্ম্মভক্তি। তাঁহাদের প্রত্যেক কার্য্য পরম্পরাতেই অপরিসীম ধর্ম্মভাব ও ধর্ম্ম-ভীতি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। গৃহের বাহির হইতে ভাল দিনদেখিয়া বাহির হইতে হয়। কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে শুভ দিন নির্দ্ধারিত না করিলে চলে না। অধিক কি, নিয়ত শয়নে, উপবেশনে ও অশনে সমস্ত কার্য্যেই অকাট্য ধর্ম্মভাব দেদীপ্যমান রহিয়াছে। সায়াহ্ন-শয়নে ও প্রভাতে শয্যা পরিত্যাগ করিবার সময়ও প্রত্যেক ভারতবাসী ঈশ্বরের নাম করিয়া থাকেন। সামান্য চিঠি পত্র কি দৈনিক জমা খরচ লিখিতেও প্রথমে ঈশ্বরের নাম না লিখিলে কোন কার্য্যই সুসিদ্ধ হয় না। এ সকল কি অনুচিত? এ সকল কি দোষের? তাহা বলিতেছিনা। এইক্ষণ এ সকলে কিছুই হইবেক না। এখন সে সময় নাই। ভারতের সে দিন কালের অতল-বারিধি-গর্ভে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে। শুনিয়াছি পুরাকালে দেব দেবীর আরাধনা করিয়া মনুষ্য-মণ্ডলী স্বকীয় অভীষ্ট সংসাধন করিতেন। কিন্তু এইক্ষণ আর তাহাতে কিছুই হইবার নহে। কাজেই এখন প্রত্যেক ভারত-হৃদয়ে জাতীয় জীবন প্রবেশ করাইয়া একতা সংস্থাপন না করিলে আর আমাদের কোনই উপায় নাই। সুতরাং কিসে সেই একতা সংস্থাপন হইতে পারে? সেই চিন্তা ও সেই ভাবনাতে মনোনিবেশ করাই আমাদের

সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর। অনেকে একত্রিত হইয়া কার্য্য বিশেষ সম্পন্ন করিতে কৃত সঙ্কল্প হইলেই না পরস্পর সহানুভূতি জন্মে? এবং সেই সহানুভূতিই যে ভবিষ্যৎ উন্নতির এক মাত্র নিদান, তাহারও সন্দেহ নাই। তাই বলিতেছি একমাত্র কৃষি শাস্ত্রে মনোনিবেশ ব্যতীত আমাদের উপায়ান্তর নাই। একথা পূর্ব্ববারেই বিশেষ যুক্তি প্রদর্শনে প্রমাণাকৃত হইয়াছে, সুতরাং তদ্বিষয়ে অধিক বাক্যব্যয় নিষ্প্রয়োজন।

আমরা বঙ্গবাসী, আমরা বাঙ্গালি। পরের গোলামীর প্রতি আমাদের এখনও যেরূপ প্রগাঢ় ভক্তি রহিয়াছে, তাহাতে ভবিষ্যতে মঙ্গল আশা অতি দূরে অবস্থিত। জনক জননী সন্তানের বিদ্যা শিক্ষার্থ যত্ন করিনা অনেক অর্থ ব্যয় করিতেছেন; কেননা সন্তান দাসত্ব করিয়া পরের নিকট দেহ বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইবেন। দাসত্ব, দাসত্ব লোকের মুখে কেবল একমাত্র রব হইয়াছে। দাসত্বপদ প্রাপ্ত হইলে পিতা মাতা সন্তুষ্ট, প্রতিবেশীগণ সন্তুষ্ট, এ ভারত সুদ্ধ সকল লোকই সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। দাসত্ব যেন কি ইন্দ্রত্ব-পদ, ঐ রূপ সকলের ধারনা ও বিশ্বাস। হায় রে! বাঙ্গালি উমেদারী কার্য্যে যেরূপ মজবুত, তৎপর এবং অধ্যবসায়শীল, যদি সমস্ত বাঙ্গালি ও সমস্ত ভারতবাসী একমাত্র কৃষি-ব্যবসায়ে সেইরূপ মনোযোগের সহিত সম্পাদন করিতে শিখিতেন, তাহা হইলে আর কিছু না হউক, অন্ততঃ প্রত্যেক পরিবারই অপরিমিত সুখ-স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন, সন্দেহ নাই।

আজ কাল হয়তঃ শিক্ষিত সমাজের অনেকেই মুখে বলিয়া থাকেন, পরের গোলামি করা নিতন্তই নিকৃষ্ট কার্য্য। চাকরী বৃত্তি, পশুর বৃত্তি। পরের গোলাম হইয়া থাকিলে মানসিক বৃত্তি সমস্ত ক্রমে ক্রমে নিস্তেজ হইয়া যায়। যে দিবসে তাহারা এইরূপ মমতার স্বরে এইরূপ বাক্‌জাল বিস্তার করিলেন, তৎপর দিবসই দেখ যে তাহাদের মধ্যে কোন মহোদয় হস্তে আবেদন-পত্র-সহ গ্রেহেম কোম্পানীর ঘরে ভ্রমণ করিতেছেন কেহ বা কোন হাই কোর্টের জজের সহিত সাক্ষাৎ করণাভিলাষী হইয়া নির্দ্দিষ্ট সময় প্রতীক্ষা করিতেছেন। কেহ বা শ্বেতাস্য দেখিলেই সেলাম করিতেছেন। কেনন একবার কোন সাহেবের নজরে পড়িতে পারিলে, তিনি ইহ জীবন পরম সুখে অতিবাহিত করিতে পারিবেন। কি উপায়ে একবার ছোট লাট্ সাহেবের সহিত দেখা

হইবার সম্ভাবনা, কেহ বা তাহারই তদ্বির করিতেছেন। চারি দিকেই এই প্রকার বিপরীত ব্যাপার দৃষ্ট হইবে। ছোট বড়, উত্তম অধম সকলেই চাকরীর জন্য নিয়ত ব্যতিব্যস্ত। দেখিয়া শুনিয়া বোধ হইতেছে যেন দাসত্ব ভিন্ন জীবিকা নির্ব্বাহের অন্য কোন উপায়ই নাই।

চাকরী ব্যতীত, অন্য কি উপায়ে যে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়, বাঙ্গালি বাস্তবিক সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। গোলামি পাইলে বঙ্গবাসীগণ যেন করতলে সুপক্ক কদলী প্রাপ্ত হয়েন। অবোধ দেশের লোক চাকরী করা-কেই সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবের কার্য্য মনে করেন। একমাত্র গোলামী ব্যতীত অন্যবিধ প্রকারে অর্থ সঞ্চয় ও পরিবার প্রতিপালন করা, ইতরের ও ছোট লোকের কার্য্য বলিয়া বঙ্গের সর্ব্বত্র পরিগণিত ও বিবেচিত হইয়া থাকে। এস্থলে একটী সামান্য গল্প মনে পড়িল। পাঠকবর্গকে সে কথাটী না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। প্রস্তাবটী এই—কোন কায়স্থ বংশোদ্ভব সম্ভ্রান্ত গৃহস্থের দুইটী জামাতা ছিল। তন্মধ্যে এক জন থানার দারোগা, অন্য জন চাউলের ব্যবসায়ী। শ্বশুর গৃহে নিয়তই উভয়ের প্রতি যত্নের তারতম্য দৃষ্ট হইত। শয়ন গৃহের, ভোজন সামগ্রীর, বসিবার আসনের ইতর বিশেষ দিবানিশিই পরিলক্ষিত হইত। দারোগা মহাশয় পরিজনবর্গের পরমপূজনীয় শ্রীলশ্রীযুক্ত বাবু স্বরূপ হইলেন। আর হতভাগ্য ব্যবসায়ীকে যেন কৃষাণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিলন। প্রতিবেশী মণ্ডলে তিনি "দোকান-দার জামাই" নামে অভিহিত হইলেন। একদা সেই হতাদর ব্যবসায়ীর পত্নী রজনী যোগে প্রিয়তম স্বামীর করযুগল ধরিয়া বলিতে লাগিল, "দেখ তুমি আর কখনও তোমার শ্বশুর গৃহে আসিও না, এবং আমাকেও আর কখন পিত্রালয়ে পাঠাইও না। এত অপমান ও লাঞ্ছনা সহ্য করা অপেক্ষা বিষ পানে প্রাণ ত্যাগ করা সহস্রগুণে স্বীকার্য্য"। অবশেষে উল্লিখিত ব্যব-সায়ী স্বামী সমস্ত গূঢ় বৃত্তান্ত বুঝিতে পারিয়া, পর দিবস প্রাতে নিজ সহধর্ম্মি-ণীকে নিজ ভবনে লইয়া গেলেন। এবং শ্বশুরের সহিতও সেই অবধি সম্পর্ক রহিত হইয়া গেল। সমাজের তো এইরূপ সোচনীয় অবস্থা। দোকানে বসিয়া খাতালেখা ও তুল দাড়ি ধরিতে শেখা আর ক্ষেত্রে নামিয়া কৃষি কার্য্যা-দির পর্য্যবেক্ষণ ও তদুন্নতি বিধান বাঙ্গালীর পক্ষে মহাপাপ ও ছোট লোকের কার্য্য বলিয়া দৃঢ় প্রতীতি। অন্যপক্ষে প্রভু মস্তকোপরি লৌহদণ্ড

ধরিয়া আছেন, গ্রীবা উত্তোলন করিবার যো নাই। তুমি তদ্গত চিত্তে বেলা ১০টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত আফিসে বসিয়া কেবল অবিশ্রান্ত কলম চালাইতেছ, ক্ষণকাল বিশ্রাম নাই। কার্য্য সমাধার পর প্রভুর বা শ্বেতাস্যের রক্তলোচন ভ্রূকুটী ও সুমধুর বাণী তোমার পুরস্কার হইল। এরূপ কার্য্যে বঙ্গ সমাজে তোমাদের যশ, মান, খ্যাতি ও প্রতিপত্তি আছে। তাই বলি সকলে মিলিয়া যে কার্য্য করিবে, তাহা অবশ্যই সময়ে কার্য্যে পরিণত হইবেক, সন্দেহ নাই।

ক্রমশঃ।

দক্ষিণ বর্দ্ধমান অঞ্চলে রবি শস্যের বিবরণ।

এ অঞ্চলের লোকেরা ফসলকে সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করে। (১ম) ধান্য ফসল (২য়) রবি ফসল। হৈমন্তিক, আশু, কেলে এই তিন প্রকারের ধান্য চাস এখানে হইয়া থাকে। এই প্রণালীর ফসলকে সাধু ভাষায় "নীর-ফসল" বলা যাইতে পারে। কেননা, জল না পাইলে এই ফসল কোন প্রকারেই জন্মে না। এই ফসলে হেমন্ত বর্ষা ও শরতের জল আবশ্যক। "বোরো" ধান জল না পাইলেও পাকিয়া থাকে। ইহা সাধারণতঃ জলাশয়, সরোবর, খাল প্রভৃতিতে জন্মে। কিন্তু দক্ষিণ বর্দ্ধমানে ইহা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। ফাল্গুণ চৈত্র মাসে ইহা ফলে। দ্বিতীয় প্রকারের ফসলের নাম রবি ফসল। রবি শব্দের অর্থ সূর্য্য। অর্থাৎ যে ফসল প্রখর রৌদ্র কিরণের সময় ফলে বা জন্মে তাহাকে রবি ফসল কহা যায়। শরৎ, হেমন্ত ও শীতের প্রখর মার্ত্তণ্ড কিরণ রবি ফসলের জন্মদাতা। তৎসঙ্গে শিশির ও বৃষ্টির সহায়তা পাইলে রবি ফসল প্রচুর জন্মে।

এ অঞ্চলে রবি ফসল প্রধানতঃ এই কয়েক প্রকার, যথা—(ক) তিল, (খ) গম, (গ) যব, (ঘ) সর্ষপ, (ঙ) নানা প্রকারের কলাই, (চ) কার্পাশ। কোন কোন স্থানের লোকেরা দুই এক প্রকার তরী তরকারীকেও রবি ফসলের

মধ্যে গননা করিয়া থাকে। আমার মতে তরী তরকারী রবি ফসলের মধ্যে না ধরিয়া, স্বতন্ত্র শ্রেণীতে ধরিলে ভাল হয়।

সর্ষপ,—এদেশে চারি প্রকার সরিষা জন্মে। তোড়া, ঝুনি, রাই এবং শ্বেত। দক্ষিণ বর্দ্ধমানে ঝুনির অধিক পরিমাণে আবাদ করা হয়। ইহাতে তৈল হয় এবং রন্ধনের সময় তরকারীতে দেওয়া যায়। ঐ অঞ্চলের লোকেরা অনেক পরিমাণে ঝুনী ব্যবহার করে। শ্বেত সর্ষপ সামান্য জন্মে। অপর দুই প্রকারের আবাদ প্রায় নাই। কাজলা নামে আর এক প্রকারের সরিষা হয়।

তিল,—এদেশে তিন প্রকার জন্মে। কৃষ্ণ, সাঁকী ও ছাঁচি। শেষোক্ত প্রকারের তিলের আবাদ প্রায়ই হইয়া থাকে। সাঁকি ও কৃষ্ণ তিলের সামান্য আবাদ হয়। কোন কোন স্থানে সাঁকির আবাদ একেবারেই নাই। ছাঁচির দ্বারা তৈল প্রস্তুত হয়। এই তৈল অত্যন্ত শীতল।

কার্পাশ,—দুই প্রকার। রাম কার্পাশ ও থার কার্পাশ শেষোক্ত প্রকারের কার্পাশ বৃক্ষ অতি ক্ষুদ্র। ইহারই আবাদ অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। প্রথম প্রকারের বৃক্ষ অতি দীর্ঘ হয়। কখন কখন বট বৃক্ষের ন্যায় হইয়া থাকে। ইহাতে সম্বৎসর তুলা থাকে। রাম কার্পাশের আবাদ হয় না, ইহা আপনা হইতেই জন্মে। রায়না থানার অন্তঃপাতী মাদানগর গ্রামে ১৷৷০ কাঠা জমি ব্যাপিয়া একটি রাম কার্পাশ বৃক্ষ আছে।

মুগ কলাই,—সোণামুগ, কালমুগ, ঘোঁড়ামুগ।

বুট,—শ্বেত ও লাল।

মটর,—ছোট ও বড়।

খেঁশারী,—ছোট ও বড়। অন্য নাম, তেওড়া।

বিরি কলাই,—কাল, শাদা, পেরো।

বরবটে,—অপর নাম হনুমান কলাই বা রম্ভা কলাই।

গম,—খেড়ী, দুদে (বা গঙ্গাজলে।)

যব,—এক প্রকার।

গমে ময়দা এবং যবে ছাতু হইয়া থাকে।

কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে রবি ফসল জন্মে। পৌষ মাঘ মাসে ফলে। কেবল তিল ফাল্গুণ মাসে আবাদ হয়, জ্যৈষ্ঠ মাসে ফলে।

প্রথমে জমি কর্ষণ করিতে হইবেক। তাহার পরে মই দিয়া বীজ বপন

করিতে হইবে। তৎপরে আবার চাস দিয়া পুনরায় মই দিতে হইবে। এই রূপে রবি ফসলের কৃষি কার্য্য শেষ হয়। কখন কখন বৃক্ষের গোড়ার মৃত্তিকা "খুসিয়া" বা আলগা করিয়া দিতে হয়। বৃক্ষগুলি মেঘের জল না পাইলে শোয়াতী অর্থাৎ ছিঁচ দিতে হইবে।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ দত্ত।

দক্ষিণ বৰ্দ্ধমান অঞ্চলে রাইয়তী বন্দোবস্ত।

এ অঞ্চলের প্রকৃত জমিদার শ্রীযুক্ত বৰ্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ বাহাদুর। ১৭৯৩ অব্দে লর্ড কর্ণোয়ালশ বাহাদুর যখন ১০ শালা বা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথার সৃষ্টি করেন, তখন ইনিই সর্ব্ব প্রথম লাট সাহেবের উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করেন। বাঙ্গালা দেশে বর্দ্ধমানাধিপতি সর্ব্ব প্রথম ও প্রধান জমিদার। রাইয়তদিগের সহিত ইহার জমি-বন্দোবস্ত ভাল। চতুরস্র ভাবে দেখিলে, ইনি রাইয়তী বন্দোবস্ত বিষয়ে যে প্রথা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে প্রজা সাধারণ সুখ ও শান্তিতে আছে। জমিদার ইচ্ছা করিলে কিম্বা পত্তনিদার ইচ্ছা করিলে প্রজার শোষক হইতে পারেন না।

এ অঞ্চলে জমির প্রধানতঃ চারি প্রকার বন্দোবস্ত হইয়া থাকে। (১ম) নিজ জোৎ (২য়) ভাগ জোৎ (৩য়) সাজাবিলী (৪র্থ) জমাকর। নীর ফসল সম্বন্ধে এই চারি প্রকার বন্দোবস্ত হয়। রবি ফসল সম্বন্ধে তিন প্রকার; তদ্যথা (১) পাতকর জমা (২) নিজহস্ত জমা (৩য়) বিলী জমা। এই সকল জমা সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। যে জমি নিজের তত্ত্বাবধারণে থাকে, কাহাকেও বিলী করা হয় না, তাহাকে নিজজোতী জমি কহে। যে জমির ফসল অপরের ব্যয়ে উৎপন্ন হয়, কিন্তু জমির অধিকারী অৰ্দ্ধেক ভাগ পাইয়া থাকে, তাহাকে ভাগ জোতী জমি কহে। যে জমির ফসল সম্বন্ধে জোতদারের সহিত যদৃচ্ছা বন্দোবস্ত থাকে, তাহাকে সাজা কহে। "ভাগ" ও "সাজা" এ উভয়ে প্রভেদ এই যে, ভাগের জমিতে ঠিক অর্দ্ধেক ফসল পাওয়া যায় কিন্তু "সাজাতে" তাহা হয় না। যদুর জমি রাম গোয়ালা সাজা লইয়াছে। বন্দোবস্ত এই যে,

ফসল হউক আর না হউক, অধিক হউক বা কম হউক, যদু, রামের নিকট (মনে কর) ২ কাহন ধান পাইবে। ইহাকেই সাজা কহে। জমা করের সহিত ফসলের সম্পর্ক নাই, কেবল খাজানা (টাকা) দিতে হয়। রবি ফসল সম্বন্ধে নিজ হস্ত জমা—অর্থাৎ যাহা নিজে করা হয়। বিলী জমা—যাহাতে কেবল টাকা (খাজানা) পাওয়া যায়। পাতকর জমা—যাহাতে জোতদারের নিকট হইতে ঠিক অর্দ্ধেক ফসল পাওয়া হইবে। এ সকল ভিন্ন "ফুরাণী" নামে এক প্রকার বন্দোবস্ত পূর্ব্বে এ অঞ্চলে খুব প্রচলিত ছিল। তাহা এই প্রকার, যথা—অর্থাৎ কৃষক নিজের অর্থ, যত্ন ও পরিশ্রমে আমার জমি আবাদ করিবে এবং ফসল কাটিয়া আমরাই বাটীতে স্তূপীকৃত করিবে। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত যে ব্যয় তাহা ঐ কৃষকই দিবে। ফসল মাপ হইয়া গেলে, কৃষকের সহিত আমার যে বন্দোবস্ত ছিল, তদনুসারে আমি (মনে কর) ৩ কাহন ধান লইলাম। বাকী কৃষক পাইল। যদি জমিতে দৈব দুর্বিপাক বশতঃ ৩ কাহন ধান না হয়, তাহা হইলে যে ফসল হইয়াছে, তাহার ৬ আনা রকম ফসল আমি এবং ১০ আনা রকম কৃষক পাইবে। তাহাতে যদি কৃষকের ব্যয় না পোষায়, তাহা হইলে কৃষককে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইল। এতদ্ভিন্ন "মহাজনী" নামে এক প্রকার বন্দোবস্ত ছিল। আবাদের জন্য মনে কর গোপালের নিকট আমি ৬৭, টাকা ঋণ গ্রহণ করিলাম। আমার জমিতে যে ফসল হইবে, তাহা হইতে মহাজন অগ্রে ৬৭, টাকার ফসল লইয়া যাইবে, তাহার পরে যাহা থাকিবে আমি পাইব। যদি ফসল মহাজনের টাকার মূল্যের মত না হয়, তাহা হইলে যত দিন না ঐ টাকা শোধ যায়, তত দিন পর্য্যন্ত আমি জমির ফসল অগ্রে লইতে পারিব না। ইতি।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ দত্ত।

গরু ক্রয় করিবার সঙ্কেত।

কৃষকদিগের পক্ষে গরু অতি প্রয়োজনীয়। ইহা তাহাদের পক্ষে অতি অমুল্য সম্পত্তি। "গরু" বলিতে গেলে, পুং এবং স্ত্রী উভয়ই বুঝায়। পুং গরু মোটে তিন প্রকার, তদ্যথা—(১) দামড়া, (২) আঁটুড়া, এবং (৩) এঁড়ে; স্ত্রী জাতির গরু দুই প্রকার (১) বক্না, এবং (২) গাই অর্থাৎ

গাভী। তিন জাতি পুরুষ গরুর মধ্যে যে সকল গরু চাসে ব্যবহৃত হয়, সাধারণতঃ তাহাদিগকে "হেলে" কহে। হেলে শব্দ অপভ্রংশ মাত্র। কিন্তু কোন্ শব্দের ইহা অপভ্রংশ বলা যায় না।

স্ত্রী জাতির গরু যত দিন পর্য্যন্ত সন্তান প্রসব না করে, তত দিন তাহাকে বকনা কহে। সন্তান প্রসব করিলেই 'গাই' কহে। গাই শব্দ গাভী শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। কৃষকেরা সাধারণতঃ "গাই" নামে অভিহিত করিয়া থাকে। যৌবন কালে যে গরুর অণ্ডকোষ খুলিয়া দেওয়া হয়, তাহাকে আঁটুরা কহে। শৈশব কালে অণ্ডকোষ খুলিয়া দেওয়া হইলে তাহাকে দামড়া কহে। যাহার অণ্ডকোষ কখন খুলিয়া দেওয়া হয় না, তাহাকে এঁড়ে কহে। এ সকল ভিন্ন "ষাঁড়" আখ্যাধারী এক প্রকার গরু আছে। হিন্দুরা শ্রাদ্ধের সময় বৃষোৎসর্গ উপলক্ষে বা কোন ব্রতোপলক্ষে যে গরুকে চিহ্নিত করিয়া একেবারে পরিত্যাগ করা হয়, তাহাকে "ষাঁড়" কহে। ষাঁড় কোন কাজে লাগে না; লোকে কথায় বলে "বাবুটী যেন ষাঁড়ের গোবর"। ষাঁড় শব্দ ষণ্ডা বা ষণ্ড শব্দের অপভ্রংশ মাত্র।

গরু ক্রয় করিতে হইলে গরুর চেহারা দেখিয়া তাহার মূল্য ঠিক করা অবিধি। যাহারা চেহারা দেখিয়া গরু খরিদ করেন, তাঁহারা গরু কিনিতে জানেন না। গরুর দাঁত দেখিয়া গরু কিনিতে হয়। যে গরুর দুই দাঁত, তাহার বয়স নরম অর্থাৎ অল্প। দুই দাঁত বয়সের গরুকে চাসে নিযুক্ত করা অন্যায়। ৪ দাঁত বয়সের গরুকেও চাসে নিযুক্ত করা অন্যায়। ৬ দাঁত বয়সের গরুকে চাসে নিযুক্ত করিতে পারা যায়। ৮ দাঁত বয়সের গরু সবল, পরিশ্রমী, কার্য্যদক্ষ এবং চাসের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী। চাস করিতে করিতে গরুর মধ্যস্থানের দাঁত যখন ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাকে আর পরিশ্রম করিতে দেওয়া উচিত হয় না। ক্রমে ক্রমে যখন অন্যান্য দাঁত ক্ষয় পাইতে থাকে, তখন গরুটি একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে এবং মৃত্যু মুখে পতিত হয়। এই সময়কে "দশমাসা" কহে। গরুর মধ্যের দাঁতকে "আড়দাঁত" কহে। অতএব গরুর মূল্য দাঁত লইয়া। দাঁত দেখিয়া গরু কিনিবে ও তাহার মূল্য স্থির করিবে। ইতি।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ দত্ত।

কৃষি সংক্রান্ত রাজকীয় পত্র।

(Official Paper.)

অনুবাদ।

(ক)

প্রেরক—শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রনাথ দত্ত। এফ্, সি এল, এস্।

রায়না, জেলা বর্দ্ধমান।

মাননীয় বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের কৃষি সম্বন্ধীয় সেক্রেটারি মহোদয় সমীপে—

কলিকাতা।

মহাত্মণ!

খ্রীষ্টীয় ১৭৯৩-৯৪ অব্দে ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনেরল শ্রীযুক্ত লর্ড কর্ণোয়ালীশ সাহেব মহোদয় যখন দশশালা বা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রথা সর্ব্ব প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন, তখন বর্দ্ধমানাধিপতি মহামাননীয় মহারাজ বাহাদুর সর্ব্বাগ্রে তাহাতে অনুমোদন করিয়া কর্ণোয়ালীশের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করেন। বর্দ্ধমানাধিপতি এই দক্ষিণ বর্দ্ধমানাঞ্চলের সর্ব্বেসর্ব্বা। ইনিই প্রকৃত জমিদার বা ক্ষুদ্র রাজা। কয়েক খানি গ্রাম বা কয়েক বিঘা জমি ব্যতীত, এ অঞ্চলের সর্ব্বত্রই মহারাজের করায়ত্ত। তাঁহারই নিকট হইতে অত্রত্য সমৃদ্ধশালী লোকেরা মহল পত্তনি, দর-পত্তনি বা সে-পত্তনি লইয়া থাকে। এই সকল পত্তনিদারের সহিত মহারাজার কিম্বা তদীয় প্রতিনিধি পুরুষদিগের যেরূপ বন্দোবস্ত চলিয়া আসিতেছে, এবং তাহার ভূত-বর্ত্তমান-ভাবী ফল যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে বোধ হয়, এ অঞ্চলে কৃষি বিদ্যার এতদূর অবনতি এবং কৃষিজীবি লোকদিগের এতদূব দুরবস্থা, কেবল এই প্রকার বন্দোবস্তের দোষে হইয়াছে। প্রথমতঃ, এই বন্দোবস্তের গুণে জমিদারের এত লাভ যে, পত্তনিদারদিগকে অনেক সময়ে বিপদে পতিত হইতে হয়। পত্তনিদার কি দর-পত্তনিদারের সর্ত্তে প্রজার মত বলিয়া, প্রজারাও বিপদে পড়ে। (২য়) জমিদার জানেন, গবর্ণমেণ্ট তাঁহার সহিত এই বন্দোবস্ত চির-কালের জন্য করিয়াছেন, সুতরাং তিনি নিশ্চন্ত। প্রজার রক্ত শোষণ করিলেও তিনি নির্ভীক এবং নিরাপদ। আমি জানিনা, এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরিবর্ত্তন হয় কি না। যদি ইহার প্রতীকার থাকে, তবে নিম্ন-লিখিত কয়েক পংক্তি পাঠ এবং তদ্বিষয় বিশেষ বিবেচনা করিয়া, তাহার

অনুসন্ধান করিলে, এ অঞ্চলের হতভাগ্য রাইয়ত এবং পত্তনিদারগণ বিপদ জাল হইতে মুক্তি পাইয়া চির সুখী হইতে পারে। নতুবা এ অঞ্চলের কৃষিজীবির আশা ভরসা বৃহৎ দামোদরের গর্ভশায়ী হইতে চলিল।

এ স্থলে প্রথমে আমি একটি দৃষ্টান্ত দিব। মনে করুন বিদ্যাপুর একখানি মহলের নাম। ইহার জমিদার বর্দ্ধমানের রাজা, পত্তনিদার নিবারণ অধিকারী। বন্দোবস্ত এই যে প্রতি বৎসর ২রা জ্যৈষ্ঠ তারিখের সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে ৪ শত এবং ২রা অগ্রহায়ণ তারিখের সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে ২ শত টাকা রাজবাটীতে দিতে হইবে। না দিলে মহল নীলাম হইবে, অথবা রাজা স্বয়ং গ্রহণ করিবেন। ইহাকে ১৭৯৬-৯৭ সালের Sunset Law কহে। নিবারণ বাবুর তিন সহোদর। মহল সুতরাং তিন অংশ। এক জনের টাকা যোগাড় হইয়া উঠিল, দুই জনের হইল না। রাজা সমুদায় টাকা না হইলে মালগুজারী লইবেন না। সুতরাং মহল নীলাম হইল। এক জন যদি বাকী দুই জনের টাকা দিতে পারেন, তাহা হইলেই মহল থাকিবে, নতুবা থাকিবে না। সে ব্যক্তি যদি কেবল নিজের টাকা দিতে যায়, রাজা লইবেন না। যাহাদের ২০ সহস্র টাকার মহল, তাহার এক তৃতীয়াংশাধিকারীকে এরূপ সময়ে ৬৬৬৬৸৶১৩।— টাকার পরিবর্ত্তে সমুদয় টাকাটি দিতে হইবে। দর-পত্তনিদারদিগের অবস্থা আরও শোচনায়। ইহাঁরা পত্তনিদার মহাশয়কে রাজবাটীর সূর্য্যাস্তের দিনের অন্ততঃ ৩ দিন পূর্ব্বে আপনাদের দেয় দিবেন, এইরূপ বন্দোবস্ত আছে। মনে করুন, তাহা তাঁহারা দিলেন, কিন্তু পত্তনিদারের টাকার যোগাড় হইয়া উঠিল না, অথবা কোন মন্দ অভিপ্রায় বশতঃ রাজবাটীতে খাজানা দিল না। তাহা হইলে বিনাপরাধে দর-পত্তনিদারকে ধনে প্রাণে মরিতে হইল। মনে করুন, দর পত্তনিদার যেন রাজবাটীতে হাজির থাকে এবং পত্তনিদার টাকা না দিলে আপনি টাকা দিয়া, শেষে উহাঁর নামে অভিযোগ করে। শ্যাম বাবু দর-পত্তনিদার, খাজানা ৩০০, শত টাকা। যদু বাবু পত্তনিদার, লাটু শখেলী তাঁহার পত্তনি, ইহাতে ৬৯টী মৌজা আছে। মালগুজারী লক্ষ টাকা। শ্যাম বাবুর দর-পত্তনি এই পত্তনির অন্তর্ভূত, এবং তাঁহার সহিত রাজার কোন সম্বন্ধই নাই। তাহা হইলে শ্যাম বাবু লক্ষ টাকা দিতে না পারিলে তাহার মহল নীলাম হইবে। কেননা, যদু বাবুর সর্ত্তে শ্যাম বাবুর সর্ত্ত জন্মিয়াছে। তাহার পর নিরিখ, জরিপ, নুতন তালুক-

স্থায়ী বন্দোবস্ত—এ সকল প্রজার রক্ত শোষক অথচ আইন সঙ্গত। যত দিন না, সর্ব্ব প্রথমে ভূম্যধিকারীর অধিকার দৃঢ়ীকৃত হয়, তত দিন পর্য্যন্ত প্রজার বা কৃষকের ভূমির উপর অধিকার থাকিতে পারে না। * * *

(খ)

উত্তর।

মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রনাথ দত্ত, F. C L. S.

মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! আপনার ৩০২ নম্বরের পত্র যথা সময়ে বঙ্গদেশের মহামান্য লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে। তাঁহার নিকট হইতে আদেশ পাইলে, আপনাকে তাহা জানাইব। ইতি।

আপনার অনুগৃহীত।

HORACE JAMES JONATHAN,

For Offg Secretary to the A. D. B. G.

(গ)

নং ১৬২।

এগৃহরটি কল্‌চরাল সোসাইটি।

মেট্‌কাফ্ হল। কলিকাতা।

শ্রীযুত বাবু রাজেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় সমীপেষু।

রায়না।

মহাশয়! আপনার ২১১ সংখ্যক পত্র যথা সময়ে সোসাইটির সভ্যাদিগের হস্তগত হইয়াছে। আপনি দক্ষিণ বর্দ্ধমান অঞ্চলের কৃষক বৃন্দের অবনতি ও দুর্দ্দশা সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা সোসাইটীর জর্ণালে সত্বরেই প্রকাশিত হইবে। মহামান্য বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের কৃষি বিভাগীয় সেক্রেটারি মহাশয় সমীপে আপনার পত্র ও প্রবন্ধের প্রতিলিপি প্রেরণ করিলাম। আপনাদের অঞ্চলে কৃষি বিদ্যার যত অধিক চর্চ্চা হয়, ততই মঙ্গলের বিষয়। কৃষি বিদ্যার অবনতিতে, সমাজের অবনতি হয়, ইহা বোধ হয় আপনি স্বীকার করেন।

এক্ষণে নুতন দুই প্রকার লাঙ্গল উঠিয়াছে। তাহার বিস্তারিত বিবরণ পরে পাঠাইব। আপনি কৃষিতত্ত্ব নামক যে মাসিক পত্রের উল্লেখ করিয়াছেন আমরা তাহার শুভ কামনা করি। ইতি।

বশম্বদ

A. H. BLECHYNDEN,

সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ।

পুঃ—এক্ষণে ইহা বলিয়া রাখা আবশ্যক যে মার্টিন এবং চিক্ নামে দুই জন সাহেব সম্প্রতি দুইটি লাঙ্গলের আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রথমটির বিবরণ ১৭ই মার্চ তারিখের দিল্লী গেজেটে এবং শেষোক্তটির বিবরণ ষ্টেট্‌স্‌মানের বিজ্ঞাপন স্তম্ভে দেখিবেন।—এ, এইচ্, বি।

আঙ্গুর গাছ রোপণের বিষয়।

কলিকাতাস্থ এগ্রিকলচুরেল সোসাইটির মিসেলেনি হইতে উদ্ধৃত করিয়া কতক গুলি মহোপকারী কৃষি সম্পর্কীয় বিষয় আমরা প্রকাশ করিতে মানস করিলাম ঐ সকল বিষয় দেশস্থ সাধারণদিগকে জানাইবার জন্য তাহা সোসাইটি হইতে প্রকাশিত হইয়াছে;—পাঠকগণ তাহা পাঠ করিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট ও উপকৃত হইবেন তদ্বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এবারে আঙ্গুরের বিষয় প্রকাশ করিলাম। এই সুস্বাদু ফলের বিবরণ কোন সাহেবের লিখিত।

ইংরাজী ১৮২৯ সালে দানাপুরে একখানি ক্ষুদ্র তালুক অধিকার করিলে তাহার মধ্যে একটি আঙ্গুরের ক্ষেত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলাম; ঐ ক্ষেত উত্তর দক্ষিণে লম্বা এবং পুর্ব্ব পশ্চিমে খোলা, আর দীর্ঘে ১১০ ফিট, প্রস্থে ১৫ ফিট ও উচ্চে ৭ ফিট, ছিল। তাহার পুর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে ৮২ টা করিয়া গাছ ছিল কিন্তু ঐ সকল গাছ অধিক বড় ছিল না। উক্ত বৎসরে ঐ ক্ষেত্রে আঙ্গুর ফল উৎপন্ন হইয়াছিল কি না নিশ্চয় বলিতে পারি না কিন্তু যদি ফল হইয়া থাকে তবে অত্যল্প ফলিয়া থাকিবেক কেননা সে সময় ঐ সকল গাছের বয়ক্রম দু বৎসরের অধিক হয় নাই। উক্ত বৎসরের নবেম্বর মাসে ঐ সকল গাছ জাফরি হইতে নামাইলাম পরে ডগা ছাঁটিয়া ও পাতা কাটিয়া কতকগুল জাফরির উপরে কতকগুলা পাশে বিস্তীর্ণ করিয়া দিলাম। তাহার প

গাছের গোড়া খুঁসিয়া শিকড় সকল বাহির করিয়া দিলাম। এরূপ করিবার তাৎপর্য্য এই যে ঐ সময় শীত ঋতু না হইলেও ঐ সকল গাছে শীত ঋতুর কার্য্য হইবে অর্থাৎ রাত্রিতে শিশির লাগিয়া গোড়া সকল শীতল থাকিবে তাহাতে গাছের রস ক্রমে শিকড়ের নীচে পতিত হইয়া সে সময় গাছের বৃদ্ধি স্থগিত রাখিবে এবং তৎকালে এই প্রকারে বৃদ্ধি স্থগিত থাকিলে পরে বসন্তকালে ঐ সকল গাছ আপাদমস্তক বলবান হইয়া উঠিবে। আমি ঐ অভিপ্রায়ে সমুদায় ডিসেম্বর এবং জানুয়ারির কএক দিন পর্য্যন্ত ঐ সকল শিকড় খোলা রাখিলাম পরে মাছ গুড় এবং ভাঁটির কাল মাটি একত্র করিয়া সার প্রস্তুত করত ঐ সকল শিকড়ের চতুর্দ্দিকে দিলাম এবং তাহার উপর মাটি চাপা দিয়া কতক দিন তদবস্থায় রাখিলাম। ঐ সকল গাছে কখন ফুল ধরিয়াছিল আমি অনুপস্থিত থাকাতে জানিতে পারি নাই, কিন্তু ১৮৩০ সালের ফিব্রুয়ারি মাসের মধ্যে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলাম গাছ সকল অতিশয় তেজাল এবং অতি সুলক্ষণাক্রান্ত হইয়াছে। তাহার পরে মার্চ মাসের শেষে সারণ হইতে আসিয়া দেখিলাম সকল গাছে মূল অবধি অগ্র পর্য্যন্ত ফল ধরিয়াছে. এত অধিক থোলো আঙ্গুর হইয়াছিল যে ঐ জেলার সন্নিকটে কোন আঙ্গুর গাছে তদ্রূপ অধিক হইতে কেহ কখন দেখে নাই। ঐ সকল গাছ অধিক ঘন হওয়াতে ডাল পালা কাটিয়া পাতলা করিয়া দিলাম, কিন্তু ফলের থোলো একটাও কাটিলাম না, ঐ কাটা ডাল পালায় তিনটা ঝুড়ি পরিপূর্ণ হইয়াছিল। মালী কহিল যৎকালে ঐ সকল গাছে ফল ধরে তখন সে উত্তমরূপে জল দিয়াছিল, দুই দিন অন্তর অধিক জল দিয়া প্লাবিত করিত। মে মাসের শেষে পুনর্ব্বার ঐ সকল গাছ দেখিলাম, তখন ফল সকল পাকিবার উন্মুখ হইয়াছিল সে সময় আঙ্গুর ক্ষেত্রের পরম শোভা হইয়াছিল। মালির হিসাব মতে তাহাতে তিন হাজারের অধিক থোলো ফল জন্মিয়াছিল ফলতঃ ঐ গাছের জাফরি ফলের ভারে নত হইয়া পড়িয়াছিল। ঐ সকল আঙ্গুর শাদা অথবা সামান্য জাতীয় ছিল। আমার ইচ্ছা হইল এই চাসে যে ফল দর্শিল এতদ্বিষয়ের বিবরণ এগ্রিকলচুরেল সোসাইটীর সুগোচর করি, কিন্তু ডাক্তর চার্লস হণ্টর সাহেব অধিক ফল দেখিয়া আশ্চর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক আমাকে নিবারণ করত বলিলেন এই সকল গাছের প্রতি সমধিক বল প্রকাশ দ্বারা এ বৎসর এত ফল হইয়াছে আগামিতে এতাদৃক্ অধিক ফল

হওয়া সুকঠিন। তদনন্তর প্রতিজ্ঞা করিলাম ক্রমিক তিন বৎসর পরীক্ষা করিয়া দেখিব অতএব ১৮৩১ শালের নবেম্বর মাসে তৎপূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় চাস আরম্ভ করিলাম। প্রথমতঃ গাছের শিকড় খুলিয়া দিয়া ধোয়াইয়া দিলাম তৎপরে কসাইখানা হইতে রক্তের সার আনিয়া এবং মরা জন্তু বিশেষতঃ কুকুর মেষ ইত্যাদির মৃতদেহ যাহা পাইলাম সার করিয়া ঐ সকল গাছের গোড়ায় দিলাম, পরে পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় ঐ সকল শিকড়ে বাতাস লাগিবার নিমিত্ত সে সকল খোলা রাখিলাম এবং পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় নিয়মিত সময় পর্য্যন্ত তদবস্থই রহিল। কিন্তু তখন আঙ্গুর জন্মিবার সময় ছিল না এবং ক্ষুদ্র২ ফলে এক প্রকার রোগ ধরিল তাহাতে প্রায় অর্দ্ধেক ফল নষ্ট হইয়া গেল তথাপি নিকটবর্ত্তি আঙ্গুর ক্ষেত্রের ফলের সহিত তুলনা করিলে আমার ক্ষেত্রে অধিক ফসল হইল অর্থাৎ ১৭০০ সতের শত থোলোর অধিক ফল জন্মিয়াছিল এবং সকল ফল সুগঠন ও সুস্বাদ হইয়াছিল। উক্ত বৎসরে আমি আঙ্গুরের ক্ষেত্র বৃদ্ধি করিলাম এবং কান্‌ষ্টানসীয়া দেশের আট টী আঙ্গুরের গাছ এক২ দিকে চারি২ টী করিয়া দুই দিকে পুতিয়া দিলাম। ঐ কএকটী গাছ শারন হইতে আনাইয়াছিলাম তখন ঐ সকলের বয়ঃক্রম বারো মাস এবং সে সকল কাটি কলম হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। নবেম্বর মাসে ঐ সকল গাছ জাফরি হইতে নামাইলাম এবং ডগা ও পাতা ছাঁটিয়া দিয়া পুনর্ব্বার জাফরিতে বিস্তীর্ণ করিয়া দিলাম, আর যত দূর পর্য্যন্ত খুলিয়া দিলে গাছের পক্ষে কোন হানি না হয় তত দূর গোড়া খুলিয়া দিলাম, পরে শিকড় ধুইয়া দিয়া অধিক মাছের সার দিলাম ও তাহার দুর্গন্ধ নিবারণ নিমিত্ত উপরে মাটি চাপা দিলাম। যদিও অধিক শীত এবং বায়ু অত্যন্ত শীতল হইয়াছিল তথাচ গাছের গোড়া অধিক খুঁড়িয়া দিতে পারা গেল না, ফলতঃ এত অধিক শীত হইয়াছিল যে ফেব্রুয়ারি মাস অতীত হইয়া গেল তথাপি গাছ গজাইবার কোন চিহ্ন দৃষ্ট হয় নাই এবং ৮ই বা ৯ই এপ্রেলের পূর্ব্ব ঐ সকল গাছে কুঁড়িও ধরে নাই কিন্তু ১৫ ই এপ্রেলের পরে গাছ সকল একেবারে কুঁড়িতে পরিপূর্ণ হইল। ঐ সময়ে হঠাৎ এক পশলা গুরুতর শিলাবৃষ্টি হওয়াতে গাছের পক্ষে অতিশয় ক্ষতি হইল তৎকালে ফল ধরিয়াছিল। অপর আঙ্গুর ক্ষেত্রের উপরি ভাগের এবং পশ্চিমাংশ হইতে ঝড় আসাতে ঐ দিকের গাছের বিস্তর হানি হইল, অধিক আঙ্গুরের থোলো

এবং গাছের কেঁকড়ী ভাজিয়া গেল, আগামী বৎসরের জন্য যে সকল বীজ চারা হইতে পারিত তাহারও অধিকাংশ বিনষ্ট হইল। কিন্তু সেই সকল নষ্ট চারা তাজা থাকাতে আগামী বৎসরে যদি তাহা হইতে গাছ হয় এই আশ্বাসে সে সকলের প্রতিপালন করা গেল। ঝড় বৃষ্টির প্রতিবন্ধকতায় ঐ বারে কেবল ক্ষেত্রের পূর্ব্ব ভাগের ফল প্রাপ্ত হইলাম এবং তাহা ৮৬৫ থোলো হইয়াছিল। কানষ্টানসীয়া দেশের আট টা গাছের মধ্যে কেবল দুইটা ফলবান্ হইয়াছিল একটার প্রধান ডালে ১৮ থোলো এবং অন্যটাতে ৭ থোলো ফল হয়। কিন্তু তৎকালে ঐ কএকটা গাছ ৩॥০ সাড়ে তিন ফিটের অধিক উচ্চ হয় নাই।

যাহা হউক তিন বৎসর চাস করাতে যে প্রকার ফল হইল তাহা গড় করিলে প্রত্যেক বৎসর ১৫২১ থোলো জন্মিয়াছিল, অতএব নিকটবর্ত্তি আঙ্গুর ক্ষেত্রের ফসলের সহিত তুলনা এবং গাছের বয়স ও জমির নূতনতা বিবেচনা করাতে সপ্রমাণ হইল যে প্রথমতঃ আঙ্গুর গাছের শিকড় খুঁড়িয়া দেওয়া, ধৌত করা, এবং যত কালে গাছের রস নীচে নামিয়া গাছের গজান রহিত করে তাবৎ সময় ঐ সকল শিকড়ে বাতাস পাইতে দেওয়া অত্যন্ত আবশ্যক, পরে উত্তমরূপে সার প্রস্তুত করিয়া গোড়ায় দেওয় এবং বসন্ত ঋতুর প্রথম কালেই মাটি দিয়া গোড় ঢাকিয়া দেওয়া ও শেষে গাছের ডাল জাফরির উপর বিস্তৃত করিয়া দেওয়া অঙ্গুর চাসের পক্ষে অতিশয় উপকারক। জাফরির উপর বিস্তীর্ণ করিয়া দেওনের তাৎপর্য্য এই যে তাহাতে সর্ব্বত্র সমরূপে আলো ও উত্তাপ পাইবে। অঙ্গুরের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার সর্ব্বাগ্রে পূবে বাতাস হইতে গাছ রক্ষার উপায় করা অত্যন্ত আবশ্য। কারণ ঐ বাতাসে ফলের রোগ আসে, সেই রোগের চিহ্ন এই অঙ্গুরের গাত্রে এবং পত্রে লোহার মরিচার কালং বিন্দু হয় তাহাতে তৎক্ষণাৎ পাতা শুকাইয়া যায় এবং ফলে ঐরূপ দাগ হইলে তাহা আর বৃদ্ধিশীল হয় না বরঞ্চ রোগ না ধরা ফল যেমন বাড়িতে থাকে উহারা তেমনি বিবর্ণ মটরের ন্যায় হইয়া ক্রমে শুষ্ক হইয়া যায়। দানাপুরে উত্তম অঙ্গুর গাছ নাই, যদি কেপ হইতে কিছু আনাইতে পারি, ইচ্ছা আছে গ্রীষ্মে ঢাকিয়া রাখিয়া উক্ত প্রকারে চাস করিব তাহাতে মার্চ এপ্রেল এবং যে মাসে ফল হইতে পারিবে এবং এক্ষণে জলে যে প্রকার নষ্ট হয় বৎসরং তদ্রূপে বিনষ্ট হইতে পারিবেক না।

বাইরেল।

বিশ্ব-পতির বিশ্ব রচনা অতি অদ্ভুত-কৌশলে বিরচিত। তাঁহার সৃষ্টির চতুর্দ্দিকে কোথায় যে কত প্রকার অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য-কলাপ সংঘটিত হইতেছে, তাহা কেহই অনুধাবন করিতে সমর্থ নহেন। আমাদের গৃহের প্রাঙ্গনে, অথবা নিকটবর্ত্তী বন-ভূমিতে যে কত প্রকার মহোপকারী পদার্থ সমস্ত ও তরু গুল্মাদি সংরোপিত রহিয়াছে,—কে, তাহার সম্যক্ তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া থাকেন? তথাপি আমাদের প্রাচীন আর্য্যগণ বহু-অনুসন্ধানে তদ্বিষয়ে যতদূর সফলমনোরথ হইয়া গিয়াছেন, এইক্ষণ আর তদ্রূপ নূতন আবিষ্কার অতি কমই সম্পন্ন হইয়া থাকে। সে যাহা হউক, আমরা বহু-অনুসন্ধানে উপরে লিখিত গুল্মের বিষয় যাহা জানিতে পারিয়াছি, অদ্য আমরা তাহা পাঠকদের অবগতির জন্য যথাযথ বিজ্ঞাপন করিতেছি।

বাইরেল, তুলসী জাতীয় এক প্রকার গুল্ম বিশেষ। বঙ্গদেশের প্রায় সর্ব্বত্রই জন্মিয়া থাকে। আমাদের দেশের আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ প্রায়ই উহার মূল, কণ্ড ও পত্রাদি ঔষধরূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু উহা দ্বারা, মনুষ্য জগতের আর কোন ইষ্ট সাধন হইতে পারে কি না? তাহা বোধ হয়, অনেকেই জানেন না। আমাদের দেশে, কৃষকগণ, কি কৌশলে পাট প্রস্তুত করিয়া থাকে তাহা অনেকেই অবগত আছেন। উক্ত গুল্ম সকলও সেই প্রকার ছেদন করিয়া চারি পাঁচ দিন জলে ফেলিয়া রাখিলেই পচিয়া উঠে; এবং তৎপর অতি পরিষ্কাররূপে ধৌত করিয়া লইলেই, পাটের ন্যায় অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম এক প্রকার সূত্র প্রস্তুত হইতে পারে। সেই সূত্র সকল অতি দৃঢ় ও অতি সূক্ষ্ম। উহা দ্বারা এক প্রকার অতি উৎকৃষ্ট বস্ত্র ও তিব্বৎ দেশীয় ছাগলের লোমের সহিত মিশ্রিত করিয়া, এক প্রকার শাল প্রস্তুত হইয়া থাকে। কৃষকগণ উক্ত পাট প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিলে, দেশীয় পাট অপেক্ষা অনেক-গুণ বেশী মূল্যে বিক্রয় করিতে পারে সন্দেহ নাই। এবং উহা হইতে যে বস্ত্র নির্ম্মিত হয়, তাহা আমাদের দেশীয় কাপড় হইতে অনেক উৎকৃষ্ট ও অধিক কাল স্থায়ী। মূল্য ও অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী। আমরা 'বাইরেল' সম্বন্ধে যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহা পাঠকবর্গকে উপহার প্রেরণ করিলাম। পরে যাহা জানিতে পারিব, তাহা আগামীতে প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল।

কৃষিতত্ত্বের মূল্য প্রাপ্তি।

১। শ্রীযুত মহারাজা রাজকৃষ্ণ সিংহ বাহাদুর, সুসঙ্গ, মাইমনসিংহ, ... ৪৲
২। শ্রীযুত বাবু শশীভূষণ গোহ, পানবাস লক্ষ্মপুর, ... ১৷৹
৩। শ্রীযুত রাজা রাসবেহারিলাল সিংহ বাহাদুর, ছারিয়া, ... ২৲
৪। শ্রীযুত বাবু কালিদাস বাগচি কৃষ্ণনগর, ... ২৲
৫। শ্রীযুত কুমার তাড়েসচন্দ্র পাঁড়ে, পাকুর, ... ২৲
৬। শ্রীযুত কুমার নিলকৃষ্ণ দেব, সভাবাজার, ... ৩।৶৹
৭। শ্রীযুত বাবু প্যারিমোহন রায়, আমারেহেষ্ট ষ্ট্রীট, বারশিমলা, কলিকাতা, ... ২৲
৮। শ্রীযুত বাবু কানাইলাল দাস, কলিকাতা, ... ৩।৶৹
৯। শ্রীযুত বাবু শ্রীনাথ দত্ত রায়, উত্তরসন্দর, বাজিতপুর, ইবিগঞ্জ, ঢাকা, ... ৩৲
১০। শ্রীযুত বাবু প্রতাপচন্দ্র দাস ঢাকা, ... ২৲
১১। শ্রীযুত বাবু কালিরাম চৌধুরী বি, এল, গৌহাটি, ... ৷৶৹
১২। শ্রীযুত বাবু সঙ্করলাল মিশ্র বালি দেওয় নগঞ্জ, ... ২৲
১৩। শ্রীযুত বাবু ভুবনমোহন সেন, আমনপুর, ... ৷৹

পাইকপাড়া নর্শরির নিয়মাবলি।

বার্ষিক চাঁদা বীজের প্যাকিং খরচা সমেত ১৩৲ টাকা।
কলিকাতা ও তন্নিকটস্থ গ্রাহকগণের বার্ষিক চাঁদা তদ্বাদে ১২৲ টাকা তাদের বীজের প্যাকিং খরচা লাগে না।
যাহারা নর্শারির গ্রাহক হইবার ইচ্ছা করেন ইস্তক জানুয়ারি নাগাইদ মার্চ মাসের মধ্যে শ্রেণীভুক্ত হইলে তাঁহারা বৎসরের বেবাক বীজাদি ও সমস্ত সংখ্যা কৃষিতত্ত্ব পাইবেন।
যাহারা পূর্ব্ব হইতে নর্শরির গ্রাহক শ্রেণিভুক্ত আছেন, তাঁহারা অগ্রিম ১৫৲ টাকা চাঁদা দিলে সময়২ যেরূপ বীজাদি পান তদ্ব্যতীত কৃষিতত্ত্বও পাইবেন, তাতে তাঁহারা ১।৶৹ হিসাব মত বাদ পাইবেন, যাঁহারা এক কালে নর্শরি ও তত্ত্বের নুতন গ্রাহক হইবেন তাঁহাদিগের প্রতিও ঐ নিয়ম।
নর্শরির গ্রাহকগণ নিম্ন লিখিত বীজাদি প্রতি সন পাইয়া থাকেন—যথা, মাসে চৈতে শসা, কাঁকুড়, ফুটি, তরমুজ নানা প্রকার শাক, বীরভুমের ও কাঁকড়ি, কুমড়া করলা ইত্যাদি। বৈশাখ মাসে নানা প্রকারের দেশী সবজি, ঝিঙ্গে, ভেণ্ডি, বেগুন, লাউ, শিম, শাঁকআলু, ইত্যাদি নানা প্রকার বর্ষায় উৎপন্ন নানা প্রকার ফুলের বীজ। শ্রাবণ বা ভাদ্র মাসে বিলাতী মারকিনের সবজি, হরেক রকমের কপি, মটর, শিম, বিট, গাজর, এণ্ডামুলা,

সুরতি মুলা, ছালাদ, ছেলেরি, শসা, কুমড়া, মরিচ, লঙ্কা ব ইত্যাদির এবং অতি মনোহর নানা প্রকার হৈমন্তিক কুসুমের বীজ গ্রাহ মিত সময়ে পাইয়া থাকেন।

নর্শরির বা কৃষিতত্ত্ব বিষয়ক পত্র এবং উভয়ের মুল্য আ ইতে হইবে।

শ্রীনৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায়।
পাইকপাড়া নর্শরি, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত কালীময় ঘটক প্রণীত নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে এবং চীনাবাজার পদ্মচন্দ্র নাথের দোকানে পাওয়া যায়।

পুস্তক।	মূল্য।
প্রথম চরিতাষ্টক	।০
দ্বিতীয় চরিতাষ্টক	॥০
পদ্যময় (প্রথম ভাগ)	৵০
কৃষি প্রবেশ	৵০
কৃষি শিক্ষা	॥০

NOTICE FOR PARTICULAR ATTENTION.

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

গ্রাহকগণের মধ্যে যাঁহারা কৃষিতত্ত্বের গত সনের মুল্য গত পৌষ পর্য্যন্ত প্রেরণ করেন নাই আমরা আর তাঁহাদিগকে পত্রিকা পাঠাইতে বিরত হইলাম। অগ্রিম মুল্য না দিয়া যাঁহারা পত্রিকার গ্রাহক হইবেন তাঁহাদের দুই সংখ্যার অধিক পাঠান যাইবে না। যাঁহারা দ্বিতীয় খণ্ডের মূল্য এপর্য্যন্ত পাঠান নাই তাহা অবিলম্বে প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন। আমরা সকলকে গত মাঘ ও ফাল্গুনের সংখ্যা দিয়াছি। কৃষিতত্ত্বের সামান্য চাঁদা আমরা বারে২ লইতে প্রস্তুত নহি, সকলকে তাহা এক কালিন পাঠাইয়া দিতে অনুরোধ করি। ভরসা করি উপরোক্ত নিয়মানুসারে গ্রাহকগণ কার্য্য করিতে কোন মতে ত্রুটি করিবেন না। পত্রিকার মুল্য টিকেট না পাঠাইয়া কলিকাতা পোষ্টাপিসে মনি অর্ডার করিয়া আমার নামে পাঠাইয়া দিবেন।

শ্রীনৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায়।
পাইকপাড়া নর্শরি, কলিকাতা।

৪ এবং ৫ সংখ্যা।

কৃষিতত্ত্ব।

মাসিক পত্রিকা।

দ্বিতীয় খণ্ড।

বৈশাখ ও জৈষ্ঠ ১২৮৭

পাইকপাড়া নর্শরি হইতে প্রকাশিত।

সূচী।

কলিকাতা।

১৬৭ নং, কর্ণোয়ালিস ষ্ট্রীট্,—কর প্রেসে

শ্রীঅধর নাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

বিজ্ঞাপন।

কৃষিতত্ত্ব সম্পাদকের বিশেষ উক্তি।

এ দেশীয় শস্যাদির আবাদ বিষয়ক পত্র ও কৃষি বিষয়ক প্রচলিত প্রবাদ সকল যিনি আমাদিগের নিকট প্রেরণ করিবেন, আমরা তাহা সাদরে গ্রহণ ও কৃষিতত্ত্বে প্রকাশ করিব। কৃষি কি উদ্যান কার্য্য সম্বন্ধীয় কোন প্রশ্ন আমাদিগের নিকট পাঠাইলে, আমরা সাধ্যানুসারে কৃষিতত্ত্বে তাহার উত্তর দিবার চেষ্টা করিব।

কৃষিতত্ত্বে প্রকাশিত প্রবন্ধ সকল, সম্পাদকের বিনানুমতি — কেহ পুস্তক বা পত্রিকাকারে প্রকাশ করিতে পারিবেন না।

মূল্যের নিয়ম।

	মূল্য।	ডাক মাসুল।
অগ্রিম বার্ষিক, ...	৩৲	।৵০
পশ্চাদ্দেয়, ...	৩॥০	।৵০

ডাকের টিকিট পাঠাইলে ফি টাকায় এক আনা হিসাবে কা... তত্ত্ব দিতে হইবে।

এই পত্রিকা প্রতি বাঙ্গালা মাসের মধ্যে বাহির হইবে।

কৃষিতত্ত্বের চাঁদা অগ্রিম দেয়। গ্রাহকগণ মূল্য না পাঠাই... এক খণ্ডের অধিক পাঠান যাইবে না। এই পত্রিকাতেই গ্রাহকগণে... প্রদত্ত মূল্যের প্রাপ্তি স্বীকার করা যাইবেক।

কৃষিতত্ত্ব।

গৃহ পাল্য পশ্বাদি পরিপালন।

আমরা সম্প্রতি উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে একখানি সুদীর্ঘ পত্রিকা প্রাপ্ত হইয়াছি। পত্রিকা খানিতে যে সকল বিষয় লিখিত আছে, তৎসমুদায়ের যথাযথ উল্লেখ না করিয়া কেবল কৃষিতত্ত্বের উপযোগী বিষয় গুলির সঙ্কলন করা গেল।

ভারতবর্ষের নানা স্থানে নানাবিধ সভা সমাজাদির সংগঠন হইতেছে ও সেই সকলে নানা বিষয়িনী সুদীর্ঘ বক্তৃতা সকল হইয়া থাকে এবং "গবর্ণমেণ্ট কেন বড় বড় চাকরীতে আমাদিগের অধিকার দেন না" প্রায়ই এই কথা বলিয়া সকল বক্তৃতার উপসংহার হইয়া থাকে। অবশ্য চাকরী করিবার ও বক্তৃতা করিবার জন্য লোক থাকা আবশ্যক, তাহাতে সংশয় নাই; কিন্তু চাকরী দ্বারা যে চিরকাল সকল লোকের অভাব মোচন হইবে না, ইহাও মনে থাকিলে ভাল হয়। এমন স্থলে সকলেই কৃষি, বাণিজ্য বা শিল্পের ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। এই সকলের ন্যায়, পত্র প্রেরক হরিদাস বাবু নিজ পত্রে আর একটী লাভ জনক ব্যবসায়ের উল্লেখ করিয়া- ছেন। তাহার নাম, গৃহ পাল্য পশ্বাদি পরিপালন।

বহুদিন হইতে অশিক্ষিত ও অনভিজ্ঞ লোকের হস্তে ন্যস্ত থাকায় যেমন এদেশীয় কৃষির অবস্থা হীন হইয়া আসিয়াছে, সেইরূপ ঐ সকল লোকেরই হস্তে উক্ত কার্য্যেরও ভার থাকায় গৃহপাল্য পশু পক্ষীর আকৃতি

ও প্রকৃতির ক্রমশঃই অধঃপাত হইয়া আসিতেছে। কেবল যে বঙ্গদেশেই এরূপ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা নহে; হিন্দুস্থান ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলেও পশ্বাদির ঐ রূপ দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে; তবে ঐ সকল দেশের কোন কোন স্থানে পশ্বাদির জন্য একটু যত্ন হইয়া থাকে এবং তদ্দেশীয় গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি সাধারণ্যে পশ্বাদির উন্নতি জন্য চেষ্টা করিতেছেন।

পশু পক্ষ্যাদির উৎকর্ষ সাধন জন্য যে সকল অনুষ্ঠান আবশ্যক, তন্মধ্যে বৈজিক নিয়ম সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ফলোপধায়ক। এই নিয়মের অনুসরণ দ্বারা জীবের এত উৎকর্ষ সাধিত হয় যে, ডার উইন্ সাহেব তাঁহার (Origin of Species নামক) গ্রন্থে মেষ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন— যেন প্রথমে নির্দ্দোষ আকৃতি প্রাচীরে অঙ্কিত করিয়া পরে তাহার প্রাণ দান করিয়াছে।" বৈজিক নিয়মে যে জীবাদির কত পরিবর্ত্তন হইতে পারে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। যতদিন একবস্তু এক অবস্থায় রহিবে, ততদিন তাহার কোন পরিবর্ত্তন হয় না। কিন্তু যখনই অবস্থান্তর করা যায়, তখনই তাহার পরিবর্তন হইয়া থাকে। পরিবর্ত্তন, ভোগ ও ক্রিয়া জন্য সংঘটিত হয়।

এই ভারতবর্ষে পশু পক্ষ্যাদি যে এক কালে চরম উন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহার অনেক প্রমাণ আছে! যাঁহারা মহাভারত পাঠ বা শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই অবগত আছেন যে, বিরাট রাজ্য উৎকৃষ্ট গো জাতির জন্য বিখ্যাত হইয়াছিল এবং সেই গোধন হরণ জন্য দুর্য্যোধন বিরাটরাজের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এই ভারতেই সাগর মন্থন কালে সুরভি গো, উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব ও ঐরাবত হস্তী উৎপন্ন হইয়াছিল। কিন্তু এখন সে সুরভি কোথায়? আর গো হরণ জন্য সেই যুদ্ধ বিবাদই বা কোথায়? সেই উচ্চৈঃশ্রবা ও সেই ঐরাবতের আর সেরূপ প্রাদুর্ভাব নাই। অনেকে হয়ত বলিবেন, এ ভারতে আর সেরূপ পশ্বাদি জন্মাইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু এ সংস্কার অমূলক। যদি পুর্ব্বমত বৈজ্ঞানিক প্রথানুসারে পালন করা যায়, তাহা হইলে অবশ্যই পশ্বাদির পুর্ব্বমত উৎকর্ষ হইতে পারে। পুর্ব্ব কালে এদেশে যে, পশ্বাদি তাদৃশ

উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, বিজ্ঞ ও সুপণ্ডিত ঋষি ও রাজ গণের যত্নই তাহার কারণ।

বর্ত্তমান কালে এদেশীয় পশু পক্ষীর অবস্থা অবলোকন করিলে সকলকেই দুঃখিত হইতে হয়। যে বঙ্গদেশ নাতিশীতোষ্ণ, যে বঙ্গদেশ বার মাসেই হরিত শোভা বিস্তার করে,—সেই বঙ্গদেশে পশুপক্ষীর এরূপ হীনাবস্থা বড়ই আক্ষেপের বিষয় বলিতে হইবে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অনেক ভূমি বৎসরের মধ্যে প্রায় চারি মাস তৃণাদি শূন্য পড়িয়া থাকে, তথাপি দেশীয়-দিগের যত্নে ঐ প্রদেশের কোন কোন স্থানে উৎকৃষ্ট গবাদি পশু প্রাপ্ত হওয়া যায়। দিল্লীর অন্তঃপাতী হিসার নামক স্থানে এমন উৎকৃষ্ট গবাদি পশু জন্মিয়া থাকে যে, তথায় বৎসরের মধ্যে এক এক বার মেলা হইয়া তিন চারি লক্ষ টাকার গো বিক্রয় হইয়া থাকে। এই সকল গোরুর অধিকাংশ তদ্দেশীয় গবর্ণমেণ্টের দ্বারা ক্রীত লইয়া কমিসরিয়েটের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া থাকে। বঙ্গদেশের প্রান্তবর্ত্তী ভাগল পুরের গোরুও বিখ্যাত। যাঁহারা গো জাতির উন্নতি করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগের ঐ স্থান হইতে উৎকৃষ্ট ষাঁড় আনাইয়া গো উৎপন্ন করা উচিত।

কৃষির উন্নতি গবাদির উন্নতি সাপেক্ষ; এই জন্য উত্তর পশ্চিমাঞ্চলায় গবর্ণ মেণ্ট্ গো জাতির উৎকর্ষ সাধনার্থ বিশেষ যত্ন করিতেছেন। ঐ দেশে দাগা ষাঁড়কে ব্রাহ্মণি ষাঁড় কহে। ঐ দেশে এইরূপ নিয়ম প্রচারিত হইতেছে যে, কোন কৃষক ষাঁড়কে কৃষি কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারিবেনা। দ্বিতীয়তঃ দাগা ষাঁড়ের মধ্যে যে গুলি নিকৃষ্ট ও হীনতেজ, তাহাদিগকে যথেচ্ছ বিচরণ করিতে দেওয়া হইবে না। তৃতীয়তঃ গবর্ণ-মেণ্ট ও জমিদারগণ উত্তম উত্তম ষাঁড় রাখিয়া গো বংশের উৎপাদন করা-ইবেন। চতুর্থতঃ দেশের সর্ব্বত্র কেহ এরূপ ষাঁড় দ্বারা গোরু উৎপাদন করাইতে না পারে। হরিদাস বাবুর পত্রে বঙ্গ দেশীয় জমিদারদিগকে পশু পালন সম্বন্ধে ঐ রূপ আচরণ করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে।

যেমন গো, অশ্ব, মহিষ, ছাগ, মেষাদি জন্তুর পরিপালন আমাদের আব-শ্যক ও লাভ জনক; সেই রূপ কতকগুলি গৃহ পালিত বিহঙ্গমের পরিপালনও লাভজনক ব্যবসায়। যেমন কপোত হাঁস, মোরগ, গিনি ফাউল ইত্যাদি।

সহর ও যে সকল পার্ব্বতীয় প্রদেশে সর্ব্বদা সাহেবেরা যাতায়াত করেন, সেই সকল স্থানে উপরিউক্ত পক্ষিগণের যেরূপ প্রয়োজন দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে, সুতরাং ক্রমশঃই ঐ সকলের অভাব দাঁড়াইতেছে; তাহাতে স্পষ্টই বোধ হয় যে, ঐ ব্যবসায়ের অবলম্বনে কতকগুলি উদ্যোগী লোকের ভাগ্য অবশ্যই প্রসন্ন হইতে পারে।

আজি কালি কপোত সম্বন্ধে ইউরোপে যেরূপ অনুসন্ধান হইতেছে, তাহা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। কপোত জাতির বাহ্য গঠনের তার তম্য সম্পাদন মনুষ্যের এত আয়ত্ত হইয়া উঠিয়াছে যে, যিনি যেরূপ আকারের কপোত পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে সেইরূপ আকারের কপোত দেওয়া যাইতে পারে। কপোতের মাংস ভক্ষণ, উহা লইয়া ক্রীড়া করুণ ইত্যাদি প্রয়োজন ব্যতিরেকেও উহার আর একটী গুরুতর প্রয়োজন আবিষ্কৃত হইয়াছে। দেশ শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে কপোত দ্বারা সম্বাদাদি প্রেরণ সহজ হইয়া উঠিয়াছে। ফ্রাঙ্কো প্রসিয়ান্ যুদ্ধের সময় কপোত দ্বারা বহুল পরিমাণে সম্বাদ পরিচালিত হইয়াছিল। এজন্য এখন ইয়ুরোপের প্রায় সমস্ত প্রধান প্রধান দুর্গে এক এক দল কপোত পালন করা হইয়া থাকে। ঐ সকল সম্বাদ বাহক কপোতের দ্রুতগতি রেলের গাড়ি অপেক্ষাও অধিক। কতকগুলি কপোত ৪০ ক্রোশ অন্তর হইতে ২॥ ঘণ্টার মধ্যে বার্লিনে আসিয়াছিল। রেল্ গাড়ি সচরাচর ২॥ ঘণ্টায় ৩০ ক্রোশ গমন করিয়া থাকে। ফ্রান্সে হাঁস, মোরগাদি সম্বন্ধে বিশেষ যত্ন ও তত্ত্বানু—সন্ধান করা হয়। তথায় জননী মোরগেরা প্রায় ডিমে তা দেয়না, এজন্য ডিম ফুটাইবার নিমিত্ত এক প্রকার উষ্ণ কুটীর নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। তথায় কৃত্রিম উপায়ে ডিম ফুটান হইয়া থাকে। জননী বিহঙ্গে বা পতঙ্গে ডিমে তা না দিলেও যে ডিম ফুটিতে পারে, পলু কীটের ডিম ফুটানের বিষয় মনে করিলেই তাহা সকলে সহজে বুঝিতে পারিবেন।

পশু পক্ষীর পরিপালন যে কেমন লাভজনক ব্যবসায়, আমেরিকা তাহার দৃষ্টান্ত স্থান। তথাকার গাভী দুগ্ধজাত মাখন, পনিরাদি, বিক্রয়ার্থ ইয়ুরোপে রপ্তানি হইয়া থাকে। আমেরিকেরা মাংস রক্ষা করিবার

বৈজ্ঞানিক কৌশল আবিষ্কার ও তদ্দ্বারা মাংস রক্ষা করিয়া ইয়ুরোপাদি নানা স্থানে প্রেরণ করে। ইংলণ্ডে যে পূর্ব্বাপেক্ষা মাংস সুলভ হইয়াছে, আমেরিকার আমদানিই তাহার কারণ। কলিকাতায় দুগ্ধাদি যেরূপ মহার্ঘ; অন্যান্য স্থান হইতে দুগ্ধ ও তজ্জাত নানাবিধ দ্রব্য তথায় প্রেরণ করিতে পারিলে বিশেষ লাভ হইতে পারে। মাংসের নিমিত্ত যত পশু পক্ষীর প্রয়োজন হইয়া থাকে, মাংস ব্যতীত তাহাদের অস্থি, চর্ম্ম পশমাদি হইতেও অনেক টাকা উৎপন্ন হইয়া থাকে। ফলে সতর্কতার সহিত কাজ করিতে পারিলে পশু পক্ষীর পালন দ্বারা লাভবান্ হইবার সম্ভাবনা আছে।

কৃষির উপকারিতা।

একথা বলা বাহুল্য যে কৃষি, জীবমাত্রের জীবন ধারণের একমাত্র উপায়, কেন না কোন প্রকার উদ্ভিদের সাহায্য ভিন্ন জীবন ধারণ করিতে পারে এরূপ জীব আছে কি না সন্দেহ। কৃষি যেমন উপকারী তেমন মনের সন্তোষ প্রদ, কৃষক তাহার ক্ষেত্র অর্জ্জিত শস্যের অঙ্কুর পত্র, শাখা, প্রশাখা, ফল মূল, মুকুল দেখিয়া নবপ্রসূতি সন্তানের মুখাবলোকন করিয়া এবং দিন দিন অবয়বের পরিবর্ত্তন ও উন্নতি দেখিয়া যেরূপ আনন্দানুভব করিয়া থাকেন, তদপেক্ষাও অধিক সুখ ভোগ করে। বাহ্যবস্তু ভিন্ন সুখ যদি মানব হৃদয়ের কোন আভ্যন্তরিক পদার্থ বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবে কৃষকই প্রকৃত সুখী, কৃষক জীবনে দূষিত স্বার্থ পরতার ভাব এবং হিংসা থাকেনা, গাভী যেমন কাহার কোন হিংসা নাকরিয়া বনের তৃণ ভক্ষণ করিয়া দুগ্ধের দ্বারা মনুষ্যের পুষ্টি সাধন করে, কৃষকও অন্যের স্বার্থের ব্যাঘাত নাকরিয়া স্বীয় যত্ন পরিশ্রমে উদ্ভিদ উৎপন্ন করিয়া সমুদয় সংসারের জীব মাত্রের পুষ্টি সাধন করিয়া থাকে।

কৃষক তাহার ক্ষেত্র রোপিত তরুর একটি পত্র-উদ্গম হইলে, একটি ফুল ফুটিলে, একটি ফল ধরিলে প্রতিদিন যে নব নব সুখানুভব করে; কোন রাজা একটি নূতন রাজ্যাধিকার করিয়াও তত সুখী হইতে পারেন কি না বলিতে

পারিনা। রাজা যদি স্বার্থপর, হিংসক এবং পরস্বাপহারক, হইয়া সহস্র সহস্র জীবন হত্যা করিয়া, পৃথিবীকে নর রুধিরে প্লাবিত করিয়া রাজ্য লাভ করেন, তথাপি কি মনে প্রকৃত সুখ সম্ভাবনা হইতে পারে, এতুলনা সকলের পক্ষে অনুভব করা কষ্টকর। এক জীবনে এই উভয় অবস্থা যাঁহার ঘটিয়াছে, তিনি তাঁহার প্রকৃত জীবন চরিত লিখিয়া গেলে তৎপাঠেই কতক উপলব্ধি হইতে পারে।

কৃষক জীবনে এইকয়টী প্রধান গুণের প্রয়োজন, নিরালস্য, পরিশ্রম, উদ্যম, উৎসাহ, এবং অধ্যবসায়, আর একটু অনুসন্ধিৎসা বৃত্তি থাকা আবশ্যক, কারণ এদেশে কৃষিকার্য্য শিক্ষার এপর্য্যন্ত কোন উপায় হয় নাই, সুতরাং নিজের অনুসন্ধানের দ্বারাই অনেক জানিয়া লইতে হয়, এদেশের কৃষিকার্য্য যাহাদের প্রতি ন্যস্ত রহিয়াছে তাহারা নিতান্ত অজ্ঞ, তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে কতকগুলি সাধারণ প্রণালী মাত্র বলিতে পারে, কারণ জিজ্ঞাসা করিলেই নিরুত্তর, কাযেই সে গুলি নিজের অনুসন্ধিৎসার দ্বারা চিন্তা করিয়া স্থির করিতে হয়, এবং ক্রমে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য পরীক্ষা করিতে হয়। যেপর্য্যন্ত এদেশে কৃষি শিক্ষার কোন সাধারণ উপায় নাহইতেছে, সেপর্য্যন্ত এদুর্দ্দশা ভোগ করিতেই হইবে। অভাবই সমুদয় কার্য্যের জনক, যখন সাধারণের মনেই এ অসুবিধা বোধ হইয়া উঠিতেছে তখন ইহার উপায় ও নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিয়াছে, ইহা এক প্রকার সাধারণ সিদ্ধান্ত।

কৃষির উপকারিতা সম্বন্ধে ভূত পূর্ব্ব ভারত সুহৃদ নামক মাসিক পত্রিকায় কতক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছি; অদ্য এতৎ সম্বন্ধীয় আলোচনা ত্যাগ করিয়া, কৃষি প্রণালি সম্বন্ধে কিছু লিখিতে ইচ্ছা করিতেছি।

নারিকেল।

বোধ হয়, একথা কাহারই অবিদিত নাই যে, স্বভাব শক্তিতে সকল দেশে সকল ফসল জন্মে না, তাহার কারণ সকল দেশের জল, বায়ু, মৃত্তিকা

এবং শস্যের কার্য্য সমান নয়, কোন কোন শস্য কোন দেশে যে উত্তম রূপ জন্মে তাহার কারণ আমরা ক্রমে প্রকাশ করিব, অদ্য নারিকেল সম্বন্ধে লিখিত হইতেছে।

দ্রব্য গুণ নির্ব্বাচক এবং শরীরতত্ত্ব বিদ্‌পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, কোন এক বস্তু ভক্ষণ করিয়া শরীরের পুষ্টিরক্ষা করত জীবন ধারণ করা যাইতে পারে, এরূপ বস্তুমাত্র দুইটী, দুগ্ধ এবং নারিকেল। যদিও দুগ্ধের ন্যায় নারিকেলে সকল গুণ নাই, এবং ততদূর পুষ্টিকর নয়, তথাচ অধিকাংশ গুণ আছে এবং জীবন রক্ষা হইতে পারে, এই পরম উপকারী ফল, যে যে উপায়ে সর্ব্বত্রে জন্মিতে পারে, তাহাই অদ্যকার লিখিতব্য।

বোধহয়, অনেকেই অবগত আছেন যে আমাদের নিকটস্থ বঙ্গীয় প্রদেশ সমূহে নারিকেল উত্তম জন্মে। জল বায়ু মৃত্তিকা এই তিনের সহিত উদ্ভিদের উপযোগীতা অনুপযোগীতানুসারে সকল দেশে সকল উদ্ভিদ জন্মে না, ইহার অন্যথায় জন্মিলেও উত্তমরূপ ফলবান এবং দীর্ঘ জীবি হয় না সেই সম্বন্ধ এবং গুণাগুণ না জানিয়া যত্ন চেষ্টা করিলেও কোন ফল হইতে পারে না।

বঙ্গীয় অখাতের নিকটস্থ একশত মাইল দূরবর্ত্তী স্থান ব্যাপিয়া নারিকেল জন্মিতে দেখিতে পাওয়া যায়, কারণ সেই জল বায়ু যতদূর পর্য্যন্ত সঞ্চালিত হয় ততদূর পর্য্যন্তই পর্য্যায় ক্রমে উত্তমাধম হইয়া থাকে, যেখানের জল লবণাক্ত, এবং জোয়ার ভাঁটার গতি সবল সেই দেশই নারিকেলের পক্ষে অধিক উপযোগী।

যে মৃত্তিকায় বালির ভাগ অল্প এবং হেমন্ত ঋতুতে ফাটিয়া যায়, তাহাই নারিকেলের উপযোগী। নারিকেল গাছের মূলদেশের মৃত্তিকা রসাল থাকা আবশ্যক, কিন্তু যে মৃত্তিকায় বালির ভাগ কম থাকে তাহা প্রায় রসাল থাকেনা, কাযেই এমন কোন পদার্থ সেই মৃত্তিকার সহিত যোগ করা চাই যাহাতে মৃত্তিকার কঠিনাংশকেও আর্দ্র ও রসাল রাখিতে পারে। বালি না থাকিলেও যে মৃত্তিকায় লবণের ভাগ থাকে তাহা আঠাল হইলেও রসযুক্ত থাকে, এই জন্যই সুন্দর বন ও তন্নিকটস্থ স্থানে নারিকেল বৃক্ষ

জন্মাইবার জন্য বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা করিতে হয় না, আবার অত্যন্ত লবণ থাকিলেও সেখানে গাছ জন্মে না।

অন্য দেশে নারিকেলের বাগান করিতে হইলে যে মৃত্তিকায় বালির ভাগ কম ও দোআশা হয়, এরূপ স্থান নির্ব্বাচন করিয়া ১০ হাত অন্তর ২ ফীট্ পরিসর ও ২ ফীট্ গভীর এক একটী গর্ত্ত খনন করিয়া, দশসের লবণ ও পাঁচ-সের সোরা মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত করিয়া পুনরায় গর্ত্ত ভরাট করিয়া রাখিতে হইবে, পরে অন্যূন তিন মাস অনধিক ৬ মাসের মধ্যে তাহাতে চারা পুতিতে হইবে, ঐরূপ শারি শারি করিয়া গর্ত্ত করা হইলে, দুইটী শারির মধ্যে ক্ষেত্রের পূর্ব্ব পশ্চিম লম্বে এক একটী নালা কাটিতে হয়, উত্তর দক্ষিণ লম্বের নালা কাটা কোন ক্ষেত্রের পক্ষেই উচিত নহে, কারণ তাহাতে সমস্ত দিনই উভয় দিক হইতে বৃক্ষের মূলে সূর্য্যের তাপ অধিক লাগিয়া বৃক্ষের ক্ষতি করে, ঐরূপ নালা কাটিয়া তাহার মধ্যে ৮ হাত ব্যবধান করিয়া অর্থাৎ দুই দুইটি নারিকেল গাছের মধ্যে এক একটী কলা-গাছ পুতিতে হইবে, নালা কাটা ও কলাগাছ লাগানতে নারিকেল গাছের বিশেষ উপকার হয়, বৃষ্টি হইয়া নালার জল বদ্ধ হইয়া থাকে তাহাতে গাছের মূল দেশ শীতল ও রসাল থাকে, কলাগাছ থাকায় নারিকেল গাছে তাপাংশ কমলাগে এবং কলাগাছের শক্তি মৃত্তিকাকে রসর্যুক্ত রাখে, কলা হইয়া গেলে গাছ কাটিয়া ঐ নালার মধ্যে ফেলিয়া রাখিতে হয়, কলাগাছেও লবণের ভাগ আছে, পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে একসের কলাগাছের ছাইতে এক ছটাক পরিমাণ লবণ পাওয়া যাইতে পারে, সুতরাং ঐরূপ কলাগাছ ফেলিয়া রাখাতে ক্রমে তাহা পচিয়া নারিকেল গাছের উপযোগী একরূপ সার জন্মে, মধ্যে মধ্যে নারিকেল গাছের মূল দেশের মাটি খনন করিয়া নালা হইতে ঐ সারমাটি তুলিয়া দিতে হয়, তাহাতে গাছের অত্যন্ত উপকার হইয়া থাকে।

বরিসাল প্রভৃতি স্থানে যেখানে নারিকেল গাছ অধিক ও উত্তম জন্মে, সেখানকার প্রণালী দেখাগিয়াছে, তাহারা ঐরূপ নালা কাটিয়া নারিকেলের বাগান করে, মধ্যে কলাগাছ ও এক জাতীয় মান্দার গাছ লাগাইয়া থাকে ১ বৎসর পর কলাগাছ কাটিয়া ফেলে, এবং ৪।৫ বৎসরের সময় মান্দারগাছ

ও কাটিয়া দেয়। ৬।৭ বৎসরে নারিকেল ধরিতে থাকে। কলা এবং মান্দার লাগানর কারণ জিজ্ঞাসা করায় সন্তোষ জনক উত্তর পাওয়া যায়নাই; পূর্ব্বাপর প্রথা আছে বলিয়াই লাগাইয়া থাকে। উহার, প্রধান কারণ এই লক্ষিত হয়, মান্দারগাছ থাকায় সূর্য্যের তাপ কম লাগে, এবং পাতা পচিয়া যে সার জন্মে তাহা নারিকেল গাছের উপযোগী। পূর্ব্বে এই দেশে যে ধাতু সারও ব্যবহৃত ছিল এবং তাহা নারিকেল বৃক্ষের অধিক উপযোগী তাহার প্রমাণ এই, বরিসাল অঞ্চলে নারিকেল চারা পুতিবার সময় অতি অল্প একটু একটু সোণা কি রূপার গুড়া (রেতেঘসা গুড়া) দিয়া থাকে।

বৈশাখ মাসে যে নারিকেল, ঝুনা (পাকা) হইয়া গাছে থাকে কি পড়িয়া যায়, তাহাই বীজের পক্ষে উত্তম। অতি প্রাচীন গাছের নারিকেলই বীজরূপে ব্যবহার করা উচিত। মধ্যে মধ্যে এরূপ দেখা যায়, নারিকেলগাছ ৫।৭।হাত কি ১০।১২ হাত উচ্চ হইয়া মরিয়া যায়, তাহার কারণ, এইরূপ প্রবাদ আছে নারিকেল সুপারি যতবড় গাছের বীজ ব্যবহার করা যায় ততবড় হইয়াই প্রায় মরিয়া যায়, এই প্রবাদ নিতান্ত অযুক্ত কি অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে না। অপক্ক বীজের বৃক্ষ যে দীর্ঘ জীবী হইবে না ইহা সঙ্গতকারণ বোধ হইতেছে, এই সূত্রানুসারেই বর্ত্তমান সময়ে সকলে বাল্যবিবাহের বিদ্বেষী। ঐ রূপ ঝুনা নারিকেলের একদিকের একখানা ছোবড়া ফেলিয়া এবং বোঁটার নীচে যে একটা খোষা থাকে তাহা ফেলিয়া ঘরে রাখিয়া দিলে, অনধিক একমাসের মধ্যেই গজ বাহির হইয়া চারা হইয়া থাকে। মুখের খোষাটা না ফেলিলে গজটা শীঘ্র বাহির হইবার পক্ষে বাধা জন্মায়, গজ বক্র ভাবে উঠিলে তাহার অনেক চারা বাঁচে না, একদিগের খোষা ফেলিয়া রাখাতেও চারা পুতিবার পক্ষে সুবিধা হয়, নারিকেলের চোখ দক্ষিণাভিমুখে রাখিয়া রোপণ করিতে হয়, সমুদয় নারিকেলই ছোবড়ায় আবৃত থাকে, তাহাতে চোখ কোন দিকে, তাহা কিরূপে জানা যাইবে? কিন্তু যে দিগের ছোবড়া একটু ফেলিয়া রাখা হইয়াছে সেইদিকেই নারিকেলের চোখ, ইহা বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে। কোন অস্ত্রাদি দ্বারা নারিকেলের যে দিকে প্রথম আঘাত করিয়া ছোবড়া তোলা যায়

সেদিগেই চোখ পাওয়া যায়, যদিও ইহার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ প্রদর্শন করিতে পারিলাম না কিন্তু একশতের মধ্যে ইহার দুইটীতে ব্যতিক্রম ঘটে নাই, এ অতি সহজ কথা বরং সকলে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

চৈত্র কি বৈশাখ মাসে ঐরূপ নালা কাটিয়া গর্ত্ত করিয়া রাখিয়া আষাঢ় শ্রাবণ মাসে তাহাতে নারিকেলের চারা পুতিতে হয়। পুষ্করিণীতে যে পানা কি শেওলা জন্মে তদ্দ্বারা নারিকেল গাছের মুলদেশ ঢাকিয়া দিতে হয়, তাহাতে গাছের গোড়া শীতল থাকে এবং পচিয়া সারের কার্য্য করে, দুই দুই বৎসর অন্তর পূর্ব্বোক্ত প্রকারে লবণ ও সোরা মিশ্রিত করিয়া অনূ্যন, তিন মাস রাখিয়া, পরে নারিকেল গাছের গোড়ার মাটি কোদালির দ্বারায় কোপাইয়া তদুপরি ঐ সার মাটি দিয়া রাখিতে হয়। এইরূপ যত্নের সহিত লালন পালন করিলে অনধিক ৭।৮ বৎসরের মধ্যে বৃক্ষ ফলবান হইতে পারে; গাছ ফলবান হইলেও মধ্যে মধ্যে ঐরূপ সার ব্যবহার করিলে ভাল হয়।

নারিকেল গাছ একস্থানে চারা দিয়া ২।১ বৎসর পরেও স্থানান্তর করিয়া লাগান যাইতে পারে,তাহাতে কোন ক্ষতি হয় না। একটু সতর্ক হইতে হয়। যে চারার যে দিক পূর্ব্বাভিমুখে ছিল সেইদিক পূর্ব্বাভিমুখে রাখিয়াই লাগাইলে ভাল হয়, এই প্রণালিতে ফলবান বৃক্ষকেও স্থানান্তর করিয়া দেখাগিয়াছে তাহাতেও কোন ক্ষতি হয় নাই।

ফলবান হইবার উপযুক্ত হইয়াও যে গাছে ফল নাধরে, তাহার শাখাগুলি (ডিগা) পাড়াইয়া নীচ মুখে নাগাইয়া দিতে হয়, এবং ডিগার অগ্রভাগে কোনরূপ ভারী পদার্থ বান্ধিয়া দিতে হয় যে, ঐ রূপ নিম্নাভিমুখে থাকে, তাহা হইলেই ফল ধরিতে পারে। কোন কোন গাছ অত্যন্ত সরল হইলে তাহাতে ও ফল জন্মিবার ব্যাঘাত ঘটনায়, সেই সকল গাছে একটি বাটালি কি তদ্রূপ অন্য কোন অস্ত্র দ্বারা, মৃত্তিকা হইতে অনধিক দেড় হস্ত পরিমাণ উচ্চ স্থানে, অঙ্গুলি প্রবেশ করিতে পারে, এই রূপ পরিমাণ একটি ছিদ্র করিতে হয়, একেবারে ভেদ করিতে হয় না, একদিকের কঠিন অংশ পর্য্যন্ত খনন করিয়া দিতে হয়, তাহা হইলেই বলের কতক হ্রাস করিয়া ফল হইবার

উপযোগী করিয়া দেয়, এই রূপ প্রণালি অবলম্বন করায় অনেক বৃক্ষেই ফল বাধিতে দেখা গিয়াছে।

নারিকেল গাছের মধ্যে মধ্যে ৮ হাত অন্তর করিয়া সুপারি গাছও লাগান যাইতে পারে, তাহাতে কোন ক্ষতি হয় না।

নারিকেলের প্রতি গাছে অন্যূন একশত, অনধিক ২৫০, শত, পর্য্যন্ত ফলিতে দেখা গিয়াছে।

শ্রীশশিভূষণ গুহ
সিলেট কাল্‌টিবেটিং কোঃ লিমিটেডের
ইনস্পেকটর।

প্রাপ্ত।

——oo——

কৃষিকার্য্যে বিজ্ঞানের আবশ্যকতা।

...ত কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে, স্বল্প ব্যয়ে, প্রচুর পরিমাণে, অল্পকাল মধ্যে, ক্ষেত্রকে বিশেষ তেজঃশূন্য না করিয়া, উপকারক শস্য উৎপন্ন করিতে পারা যায়, তদ্বিষয় লক্ষ্য করিয়া কৃষক দিগের কৃষিকর্ম্ম করা কর্ত্তব্য। এই কয়েকটি মধ্যে কোনটির অবনতিদ্বারা অপর গুলির উৎকর্ষসাধন কদাচ শ্রেয়ঃ নহে। এই সকল বিশেষ ব্যাপার সিদ্ধ করিতে বিজ্ঞানের সাহায্য সর্ব্বতোভাবে আবশ্যক। যখন আমরা ইয়ুরোপের কিম্বা আমেরিকার কৃষিবিদ্যালোচনা ও তত্ত্বদালোচনার ফল সকল স্মরণ করি, তখন আমাদিগের উৎসাহহীন মনোমধ্যে সাহস সঞ্চার হয়। এক্ষণে এতদ্দেশে ইংরাজি ভাষা ও বিদ্যার বহুল প্রচার হইয়াছে। বহুবিধ বিজ্ঞান শাস্ত্র শিক্ষার জন্য অনেক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে এবং বৎসর ২ অনেক কৃতবিদ্য যুবক বঙ্গদেশ উজ্জ্বল করিতেছেন। বিজ্ঞান অন্বেষণে তাঁহাদের আগ্রহ দেখিলে মনে আশার সঞ্চার হয়। কিন্তু তদ্দ্বারা

তাঁহারা ভারতের কি অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়াছেন? কতকগুলি মহোপকারক শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করিতে পারিলেই তাহাদের যথার্থ সার্থকতা সম্পাদন হইল না। যাহাতে ঐ সকল শাস্ত্র কার্য্যে পরিণত করিয়া সমাজের ও দেশের শ্রীবৃদ্ধি হয়, তাহা প্রত্যেক জ্ঞানবান্ ও স্বদেশহিতৈষীর প্রধান কর্ত্তব্য কার্য্য।

আবার অনেক মহোদয় জন সাধারণকে কৃষিকার্য্যের মহোপকারিতা সম্বন্ধে অবিরত উপদেশ দিতেছেন, কিন্তু হয়ত আবশ্যক হইলে স্বয়ংই সামাজিক কুসংস্কার বন্ধন ছিন্ন করিতে সক্ষম হয়েন নাই। যদ্যপি বিজ্ঞান চর্চ্চার দ্বারা সমাজের কোন উপকার সংসাধিত না হইল, তবে শৈশবাবস্থা হইতে প্রচুর পরিশ্রম সাধ্য গূঢ়ব্যাপার সমুদায় অবগত হইবার প্রয়োজন কি? ভারত প্রকাণ্ডস্থান পড়িয়া রহিয়াছে। যদ্যপি একটি সামান্য বিষয় লইয়া কার্য্য আরম্ভ করা যায়, তাহা হইলে যত্ন, আয়াস ও অধ্যবসায় গুণে কৃতকার্য্য হওয়া কিঞ্চিন্মাত্রও অসম্ভব নহে।

যত দিবস এ দেশের লোকেরা বিজ্ঞানজনিত ফলের রসাস্বাদনে পরাঙ্মুখ থাকিবে, ততদিবস দেশের যথার্থ শ্রীবৃদ্ধি আশা করা দুরাশামাত্র। সত্য বটে, এতদ্দেশীয় কৃষকেরা বিজ্ঞান সাহায্য ব্যতীত আপাততঃ উত্তমরূপ ফসল উৎপন্ন করিতেছে—তথাচ যদি বিশেষ মনোযোগের সহিত দেখা যায়, তবে নিশ্চয়ই প্রতীয়মান হইবে যে, অনেক স্থানের মৃত্তিকা তেজোহ্রাস কারণ অল্পকাল মধ্যে বহুবিধ ফসলোৎপাদনে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছে। আমেরিকা প্রদেশের অনেকস্থান যাহা এককালে অতিশয় উর্ব্বরা ছিল, তাহা হইতে রীতিমত আবাদ প্রণালী অভাবে এক্ষণে সামান্য ফসলও জন্মে না এবং প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভূমিখণ্ড সকল পুনরায় সজীব অবস্থায় আনয়নে আপাততঃ অসাধ্য ভাবিয়া পরিত্যক্ত রহিয়াছে। সেই সকল ভূমিখণ্ডের পূর্ব্বতেজঃ সংগ্রহ করিতে কত সময়, কত পরিশ্রম, সার, ও সুদক্ষকার্য্যপরিচালকতা শক্তি আবশ্যক হয়! এ দেশে ও এরূপ অবস্থার অসদ্ভাব নাই। প্রায় শুনা যায় কৃষকেরা বলিয়া থাকে যে পূর্ব্বে অর্থাৎ ১০ বৎসর পূর্ব্বে যে জমিতে যে পরিমাণে ফসল উৎপন্ন হইত, এক্ষণে তাহার চতুর্থাংশ জন্মাইতে বহুল আবাদ ও ব্যয় স্বীকার করিলেও

সকল হওয়া যায় না। তাহারা অজ্ঞানতঃ কালের কঠোরতাকে দুর-বস্থার কারণ নির্দ্দেশ করে। কিন্তু ঐ ১০ বৎসর সেই সকল জমিতে কি প্রকার আবাদ দ্বারা কি কি ফসল জন্মাইয়া লইয়াছে, দেখিলে তাহার যথার্থ কারণ একেবারে প্রত্যক্ষ হয়। অতএব কৃষিকার্য্যে কৃতকার্য্য হইতে ইচ্ছা করিলে বিজ্ঞানের সহায়তা গ্রহণ ব্যতীত অপর আশা নাই।

কৃষি বিষয়ক কতকগুলি প্রশ্নোত্তর।

১। কোন কোন জমিতে সকল প্রকার ফসল জন্মে না কেন?

ভিন্ন ভিন্ন ফসল ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ দ্বারা উৎপন্ন হয়।

আমরা কোন একটি ফসল পাইতে ইচ্ছা করি; ঐ ফসল জন্মিতে অনেক ক্ষার আবশ্যক করে। কিন্তু মনে করুন যে জমিতে ইহার আবাদ করা যাইতেছে সে জমিতে ক্ষারের পরিবর্ত্তে যথেষ্ট চূণ আছে, তাহাতে উক্ত ফসল আদৌ জন্মিবেনা। আবার যে ফসলে চুণ আবশ্যককরে, সে ফসল উক্ত জমিতে উত্তমরূপ জন্মিবে।

২। কখন কখন দুই তিনটী ফসল একত্রে উত্তমরূপ জন্মিতে দেখা যায়। ইহার কারণ কি?

কারণ যদি দুই জাতীয় ফসল একত্রে রোপণ করা যায়, তাহাদের শিকড় ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে ভিন্ন ভিন্ন তেজস্কর পদার্থ শোষণ করিতে থাকে। যখন তাহাদের মধ্যে এক জাতীয় ফসল ক্ষেত্রের এক প্রকার তেজস্কর পদার্থ গ্রহণ করিতে থাকে, অপরটি অন্য প্রকার তেজস্কর পদার্থ গ্রহণ করিয়া বর্দ্ধিত হয়। এই জন্যে উভয় জাতীয় ফসল দ্বিবিধ তেজস্কর পদার্থে এককালে পরিপুষ্ট হয়। আবার অনেক সময় একটি ফসল তাহার আবশ্যক পদার্থ গ্রহণ করে ক্ষেত্র হইতে অন্য প্রকার তেজ-স্কর পদার্থ বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। এই জন্যে সেই সময়ে সেই ক্ষেত্রে উক্ত বহিষ্কৃত পদার্থ শোষণকর ফসল উত্তমরূপ জন্মে।

আর এক উপায়ে এই ফল সংঘটিত হয়। যদি কোন দ্বিবিধ ফসল

ভিন্ন ভিন্ন সময়ে জন্মে, অথবা একটি হয়ত শীঘ্র ও অপরটি ধীরে ধীরে জন্মে। তাহা হইলে যখন একটি, ক্ষেত্রের কোন এক প্রকার তেজস্কর-পদার্থ গ্রহণ করিতে থাকে, তখন অপরটি এক প্রকার নিষ্কর্ম্মার ন্যায় থাকে। একারণে মৃত্তিকাও যথাসময়ে প্রত্যেকের তেজস্কর পদার্থ স্বচ্ছন্দে প্রদান করে।

৩। কেন এক জাতীয় ফসল কিছু কাল অন্তর অন্তর এক ক্ষেত্রে রোপণ করিলে উত্তমরূপ জন্মে ?

প্রত্যেক ফসল, বৃদ্ধির জন্য এক প্রকার বিশেষ তেজস্কর পদার্থ নির্দ্দিষ্ট ভাগে ভূমি হইতে গ্রহণ করে। অন্যান্য ফসল সেই পদার্থ সেই ভাগে গ্রহণ করে না। যদ্যপি কয়েক বৎসর উক্ত ফসল সেই জমিতে রোপণ করা না যায়, তবে উক্ত তেজস্কর পদার্থ ক্রমশঃ ক্ষেত্রে সঞ্চিত হইতে থাকে এবং এই জন্যই কয়েক বৎসর পরে পুনর্ব্বার সেই ফসল রোপণ করিলে তাহার পুষ্টিসাধনে কোন ব্যাঘাত হইবে না।

৪। কেন ফসল সকল কোন জমিতে পর্য্যায়ক্রমে রোপণ করা উচিত ?

কোন ভূমিখণ্ডের মৃত্তিকায় অনেক প্রকার তেজস্কর পদার্থ কিয়ৎ পরিমাণে আছে। যদি কোন এক জাতীয় ফসল ঐ ক্ষেত্রে ক্রমাগত কয়েক বৎসর রোপণ করা যায়, তাহা হইলে ঐ ফসল এক প্রকার পদার্থ গ্রহণ করিতে করিতে ক্ষেত্রকে উক্ত পদার্থ বঞ্চিত করে। অতএব ভূমি ঐ ফসল আর জন্মাইতে পারে না।

যদিও আমাদের দেশের কৃষকেরা পর্য্যায়ক্রমে চাসের বৈজ্ঞানিক ঔচিত্য অবগত নাই, তথাচ তাহারা যে জমিতে এ বৎসর ইক্ষুরোপণ করে, পর বৎসর তাহাতে ইক্ষুরোপণ করে না, কিন্তু তাহার পর বৎসর ইক্ষুরোপণ করিয়া থাকে। অধিকাংশ বিস্তীর্ণ মাঠ সকল শুদ্ধ ধান্য জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহাতে কৃষকেরা অনেক সময় ধান্য পরিমাণের স্পষ্ট হ্রাস বৃদ্ধি দেখিতে পায় না। তাহার কারণ এই যে, তাহারা কেবল হৈমন্তিক ধান্য প্রায় ৭ মাস মধ্যে জন্মাইয়া লইয়া বৎসরের অবশিষ্ট মাস সমুদায় জমিতে মধ্যে মধ্যে চাস দিয়া রৌদ্র লাগাইতে থাকে। ইহাতে মৃত্তিকাভ্যন্তরস্থ ধান্যোপযোগী অনেক পদার্থ

রৌদ্রের উত্তাপে বহির্গত হইয়া আবার আষাঢ় শ্রাবণ মাসে ধান্যের পুষ্টি করে। ৫।৬ মাস মধ্যে ধান্য-তেজস্কর পদার্থ অল্প পরিমাণে সঞ্চিত হয়। এই জন্য বৎসর বৎসর প্রচুর সার খৈল না দিলে উপযুক্ত পরিমাণে যথাকালে ধান্যোৎপাদিকা শক্তি সংগৃহীত হয় না। এই অনিষ্ট সংঘটনের আর এক কারণ আছে। অধিকাংশ বিস্তীর্ণ মাঠে সংবৎসর জল পাওয়া যায় না। এজন্য কৃষকেরা রবিফসল ইত্যাদি জন্মাইতে অসমর্থ হয়।

ক্রমশঃ।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়
হুগলি কলেজ।

প্রেরিত।

কৃষিতত্ত্ব সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! নিম্নলিখিত বিষয়টী আপনার কৃষিতত্ত্বের এক পার্শ্বে স্থান দান করিলে নিতান্ত বাধিত হইব। ইহার দোষ গুণের বিষয় আপনার উপর নির্ভর, যাহা ভাল বিবেচনা হয়, তাহাই করিবেন।

আফিমের চাস।

মধ্য ভারতবর্ষের মধ্যে মালওয়া আফিমের জন্য যেমন বিখ্যাত এরূপ এই ন্য কোন প্রদেশ নহে! কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ এ বৎসর ইহার ফসল গত কর্ি ৎসর অপেক্ষা অর্দ্ধেকেরও ন্যূন পরিমাণে জন্মিয়াছে। ইহার কারণ নির্দ্দিষ্ট করিবার পূর্ব্বে আফিমের চাস্ কিরূপে করিতে হয় এবং আফিমই বা কি প্রকারে প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা বলা আবশ্যক, এহেতু যথাসাধ্য বর্ণনা করিতে প্রয়াস পাইলাম। কৃষিতত্ত্বজ্ঞ পাঠকগণ! ক্ষমা করিবেন। কারণ আমার লেখনীর তাদৃশ ক্ষমতা নাই যে, এই বিষয়টী

উপযুক্তরূপে লিখিয়া সাধারণের মনোরঞ্জন করিব। যাহা লিখিতে বাধ্য হইয়াছি, তাহা স্বচক্ষে দেখা এবং যত্নসহকারে কৃষকদিগের নিকট হইতে অনুসন্ধান করা হইয়াছে।

আফিমের চাস্ অগ্রহায়ণ মাসে আরম্ভ হয়, কিন্তু ইহার দুই তিন মাস পূর্ব্ব হইতে ক্ষেত্র খনন করিয়া পরিষ্কার রাখা আবশ্যক। এ প্রদেশের কাল মৃত্তিকা স্বাভাবিক উর্ব্বরা এবং ইহাতেই আফিম উত্তমরূপ আবাদ হইয়া থাকে। বীজ বপণ করিবার সময় কিছু জলের আবশ্যকতা হয়, তাহার পর ঐ সকল বীজ্ অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমশঃ যখন পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে, সেই সময় অতিশয় জলের প্রয়োজন। গাছগুলি উর্দ্ধে প্রায় দুই হাত পরিমাণ হইলে ফুল হইতে আরম্ভ হয় এবং এই ফুল হইতে ফল হইলে ফুলগুলি পড়িয়া যায়। সম্পাদক মহাশয়, আফিমের ফুল দেখিতে যেরূপ চমৎকার, তাহা আপনাকে বর্ণনা করিয়া কি দেখাইব। যদ্যপি কেহ কখন এ স্থানে আসিয়া স্বচক্ষে এই ক্ষেত্র পরিপূর্ণ সাদা এবং লাল ফুলগুলি মন্দ মন্দ বায়ু সঞ্চালনে হেলিতে দুলিতে একবার দর্শন করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহার হৃদয় আনন্দরসে পরিপ্লুত হইবে, সন্দেহ নাই। এই ফুল হইতে যে ফল উৎপন্ন হয়, তাহা পরিপক্ক হইলে কৃষকেরা কোন তীক্ষ্ণ অস্ত্রের দ্বারা একে একে চিরিয়া দেয়। একটী ফল ৩। ৪ বারের অধিক স্থানে স্থানে চেরা যায় না। ইহার ভিতর হইতে যে রস নির্গত হয় তাহাকে আফিম বলে। প্রতি দিবস কৃষকেরা এবং কৃষককন্যাগণ অতি প্রত্যূষে এই রস কোন পাত্রে একত্রিত করিয়া আফিম জমায়। ইহা অতিশয় তেজস্কর এবং ইহার বর্ণ পাপড়ি খয়েরের মত।

কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে যে আফিম বিক্রয় হয়, তাহাতে ভ্যাজাল আছে কিন্তু এস্থানীয় আফিমে তাহা নাই। এখানে প্রতি টাকায় দশ কিম্বা ব ভরি আফিম পাওয়া যায়; কিন্তু এবার অতি মহার্ঘ হইবে। তাহার কা‍ প্রথমতঃ গাছগুলি অতিশয় সুখী ও কোমল, তাহাতে এবার পালা পড়িয়া ইহাদিগের শৈশব অবস্থায় তেজোহানি করিয়াছে, দ্বিতীয়তঃ কৃষকেরা অসামান্য পরিশ্রম সহকারে ইহাদিগকে পুনর্জ্জীবিতকরিলেও আফিম তুলিবার সময় একেবারে অতিশয় রৌদ্রের উত্তাপ হওয়াতে

আফিম উত্তমরূপ বাহির হইতেছে না। এখন মহাজনদিগের অদৃষ্ট এবং কৃষকদিগের হাতযশ। এত অর্থ ব্যয় এবং পরিশ্রম স্বীকার করিয়াও যখন উত্তমরূপ ফসল জন্মিল না, তখন অদৃষ্টের দোষ ব্যতীত কি হইতে পারে?

যে ক্ষেত্রে আফিম্ জন্মায় তাহাতে মক্কা ব্যতীত আর কিছুই হয় না। এই আফিম তুলিবার সময় আরও রৌদ্রের উত্তাপ বৃদ্ধি হইলে ইহার গাছগুলি শুখাইয়া যাইবে।

মোঃ ১০ই এপ্রেল ১৮৮০

বশম্বদ

শ্রীঅমূল্য চরণ চট্টোপাধ্যায়

মোঃ বঙ্গসমাজ কার্য্যাস্পদ।

প্রেরিত।

গোলাপ দল সম্বন্ধীয় প্রশ্নের উত্তর।

দ্বিতীয় খণ্ড মাঘ ফাল্গুন মাসের কৃষিতত্ত্বে দেখিলাম শ্রীযুক্ত রাজা কমল কৃষ্ণ সিংহ প্রশ্ন করিয়াছেন যে, গোলাপ দলের বর্ণ রূপান্তর করার কোন উপায় আছে কিনা? সম্পাদকীয় উত্তরে দেখিলাম কোন উপায় নাই; এই মতের সহিত আমি ঐক্য রাখিতে পারিলাম না, আমার বিশ্বাস যে, চেষ্টা করিলে তাহা হইতে পারে, তবে এক পুষ্পের দল ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ হইতে পারে কিনা? ইহার উত্তর আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির সাধ্যায়ও নহে।

কি মানব জগৎ, কি পশ্বাদি জগৎ, কি উদ্ভিদ জগৎ, এতৎ সম্বন্ধে যিনি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া থাকেন, তিনিই দেখিতে পাইবেন যে, প্রকৃতির নিয়ম সকলের সম্বন্ধেই একরূপ, মানব জগৎ যেমন শিক্ষার দ্বারা মনোবৃত্তির চালনা না করিতে পারিলে, সুসভ্য সদ্বংশ জাত সন্তানের

বংশ পরম্পরায় ক্রমে বন্য পশুর ন্যায় প্রকৃতি হইয়া পড়ে, তেমন শিক্ষা প্রভাবে মনোবৃত্তির চালনাদ্বারা, অসভ্য অসদ্বংশ জাত সন্তানেরাও ক্রমে উৎকর্ষ লাভ করিয়া শ্রেষ্ঠ জীব বলিয়া পরিচিত হইতে পারে, ইংলণ্ড আর ভারতবর্ষই ইহার উত্তম দৃষ্টান্ত। ইংলণ্ড জয় করিতে গিয়া জুলিয়স্ সিজর যাহা বলিয়াছিলেন এবং ভারতবর্ষ জয় করিতে আসিয়া সেকেন্দর যাহা যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই যথেষ্ট।

যেমন শিক্ষার ... মানসিক বৃত্তি সকলের উৎকর্ষ ... ক্ষার অভাবে অপকর্ষ হইয়া থাকে. তেমন আবার জল, বায়ু, মৃত্তিকা, এবং আহার ব্যবহারের দ্বারা বাহ্য আকার প্রকারের বৈলক্ষণ্য ঘটে। ইহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না যে. আদিম সৃষ্টিতে মানব যে একই রূপ আকার প্রকার এবং একই রূপ স্বভাব সম্পন্ন ছিল, ক্রমে তাহার বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। পশ্বাদি জগতেও এইরূপ, বরং পশু পক্ষীর মধ্যে কতক নূতন আবিষ্কৃত হইতেও দেখা যাইতেছে। খচ্চরের জন্ম বিবরণ বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন। কবুতর ও ঘুঘু এই উভয় জাতীয় পক্ষীর সংযোগে একজাতীয় পক্ষী আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার নাম রাখা হইয়াছে কুরকুচ। এইরূপ চেষ্টা করিলে বোধহয় আরও হইতে পারে।

উদ্ভিদ জগতে এইরূপ জল, বায়ু, মৃত্তিকা কর্ষণ, সার ব্যবহার এবং যত্নানুসারে উদ্ভিদের গুণাগুণ ও বাহ্য আকার প্রকারের বৈলক্ষণ্য ঘটিয়া থাকে এবং ঘটিতে পারে। মনে করুন আঁব একজাতীয় উদ্ভিদ, আদিম সৃষ্টিতে অবশ্য ফজলি, লেঙ্গরা, গোপালিয়াধোবা ইত্যাদি ইত্যাদি যে ছিলনা একথা বোধহয় কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। বিশেষত নামেতেই তাহা ব্যক্ত হইতেছে, এই সকলের রূপান্তর ... কিরূপে ঘটিল, আমরা পাহাড়ের জঙ্গলের মধ্যে সময় সময় অনেক আঁবের গাছ দেখিতে পাই, সেই সকল গাছের ফলে আঁবের ন্যায় কোন ঘ্রাণ বা স্বাদ নাই, একরূপ বনুয়া ঘ্রাণ আসে এবং ভয়ানক টক, আরবার সেই সকল গাছেরই চতুর্দ্দিগের জঙ্গল কাটিয়া পরিষ্কার করিয়া গোড়ার মাটি খুঁড়িয়া পরিবর্ত্তন করিয়া ডাল পালা ছাটিয়া দেওয়াতে

তাহাই আরবার ক্রমে ভাল হইতেছে, এতদ্দ্বারা নিশ্চয় স্থির করা যাইতে পারে যে উদ্ভিদের রূপান্তর গুণান্তর হওয়া সম্ভব, রক্তবর্ণ জবাপুষ্পের ডাল উল্‌টা করিয়া রোপন করিলে তাহা হইতে পাণ্ডুবর্ণ জবা ফুল হইয়া থাকে। পুনরায় সেই গাছের ডাল উল্টা করিয়া রোপণ করিবে তাহা হইতে শ্বেতবর্ণ জবা হইয়া থাকে, হরিদ্রার গাছ বহুকাল একই ভাবে একই মাটিতে থাকিলে তাহার বর্ণ এবং ঘ্রাণ অন্যরূপ হইতে থাকে ক্রমে দীর্ঘকাল পরে তাহাই ষটি হইয়া যায়।

আমার কোন একটি উদ্যান উৎসাহি-বন্ধুর সহিত উদ্যান সুসজ্জিত করা সম্বন্ধীয় আলাপ হইতেছিল। প্রসঙ্গ ক্রমে তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন গোলাপ পুষ্প অন্যবর্ণ অর্থাৎ সবুজ কি নীল কি শ্বেতবর্ণ আছে কি না? অথবা কোন উপায়ের দ্বারায় হইতে পারে কি না। আমি কখনও অন্য বর্ণের গোলাপ দেখি নাই বটে; কিন্তু আমার বিশ্বাস যে চেষ্টা করিলে বোধহয় হইতে পারে। শেষ আমার অনুমিত উপায়টি তাঁহাকে বলিলাম।

গোলাপকে শ্বেতবর্ণ করিতে হইলে, শ্বেতবর্ণ বিশিষ্ট বস্তু (খড়িমাটি কি ফুলখড়ি) জলের সহিত উত্তমরূপ মিশ্রিত করিয়া একটি টবের মধ্যে কতক সারমাটির সহিত মিশ্রিত করিতে হইবে এবং মধ্যে ২ ঐরূপ জল সেই টবে দিতে হইবে। ক্রমে যেন টবের সমুদয় মৃত্তিকাই শ্বেতবর্ণ ধারণ করে, ঐরূপ মৃত্তিকা প্রস্তুত হইলে গোলাপের ডাল তাহাতে উল্টা করিয়া রোপণ করিতে হইবে, এবং প্রতিদিন তাহাতে ঐরূপ শ্বেতবর্ণ বিশিষ্ট জল দিতে হইবে টবটি এমন ভাবে রাখিতে হইবে যে, তাহাতে অধিক তাপ নালাগে, তাহা হইলে পুষ্প মুঞ্জরি বাহির হইবার পূর্ব্বে গন্ধকের দ্বারা প্রতিদিন ঐ গাছে ধূমা দিতে হইবে, এইরূপে প্রথম বারে যে গাছ জন্মিবে পুনরায় তাহার ডাল কাটিয়া ঐরূপ মৃত্তিকায় উল্টা করিয়া পুর্ব্ব প্রণালী অনুসারে যত্ন করিতে হইবে। এইরূপ পুনঃ পুনঃ করিলে শেষ তাহা হইতে শ্বেতবর্ণ গোলাপ হওয়া সম্ভব।

তিনি আমার সেই কল্পনা প্রসূত উপদেশের প্রতি উপেক্ষা না-করিয়া ঐরূপ প্রণালী অনুসারে ৫ বার গাছের পরিবর্ত্তন করিয়া আমাকে

লিখিয়াছেন, ক্রমেই গাছের পুষ্প শ্বেত বর্ণ হইয়া আসিতেছে, কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন ভরসায় তাঁহার উৎসাহ সমধিক বৃদ্ধি হইয়াছে। আমিও ভরসাকরি, অনধিক ১০ বারের মধ্যে তাঁহার গাছের গোলাপ উত্তম শ্বেত বর্ণ হইতে পারিবে।

শ্বেত ভিন্ন অন্য বর্ণও হইতে পারে, তাহাতেও যে বর্ণ করিতে ইচ্ছা হয়, পূর্ব্বোক্ত প্রণালী অনুসারে সেই বর্ণ বিশিষ্ট মৃত্তিকা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে সেই বর্ণ বিশিষ্ট জল সেক করিতে হইবে, অর্থাৎ সমুদয়ই পূর্ব্ব প্রণালী অনুসারে করিতে হইবে। অধিকন্তু (নীল কি সবুজবর্ণ করিতে হইলে) গন্ধকের ধূমা নাদিয়া তুতিয়ার দ্বারা ধূমা দিতে হইবে।

যদিচ এই বিষয়টি আমার কল্পনা প্রসূত সন্দেহ নাই, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে অবশ্যই রূপান্তর হইবে। বিশেষ কোন ব্যয়সাধ্য বিষয় নহে, নর্শরির কর্ত্তৃপক্ষ গণকে আমি অনুরোধ করি যে, এইরূপ প্রণালী অনুসারে চেষ্টা করিয়া দেখিবেন, পাঠকগণকেও অনুরোধ করি যদি কেহ কৃত কার্য্য হন এবং অনুগ্রহ করিয়া সংবাদ লেখেন কি ঋষি-তত্ত্বে প্রকাশ করেন? তবে বাধিত হইব। আমার পূর্ব্বোল্লিখিত বন্ধুবর কৃতকার্য্য হইলেও আমি বিজ্ঞাপন করিব।

কাঁঠাল গাছের বিবরণ।

এই উদ্ভিদ স্বভাবতঃ পার্ব্বত্য ভূমিতে উত্তম এবং অধিক জন্মে শ্রীহট্ট, ময়মন সিং, এবং ঢাকার অন্তঃপাতী ভাওয়াল পরগনার মধ্যে টাঙ্গরে (পাহাড়ে) অধিক জন্মিতে দেখিতে পাওয়া যায়। অন্য দেশে সমধিক যত্ন সহকারে যে ফল লাভ করা না যায়, এই সকল দেশের অরণ্য মধ্যে বিনা যত্নে যে সকল গাছ রহিয়াছে, তাহাতে তদপেক্ষা অধিক ফল ফলিয়া থাকে।

ইহার দ্বারা এই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, যে ভূমি কখনও

বর্ষার জলে প্লাবিত হয় না, মাটি দোআঁশ হয় এবং বহুকাল পতিতা· বস্থায় থাকিয়া কাঠিন্য ধারণ করে, তাহাই কাঁটাল গাছের পক্ষে উত্তম উপযোগী। যে মাটি সর্ব্বদা অধিকতর রসযুক্ত অথবা কর্দ্দমিত থাকে কি বর্ষার জলে প্লাবিত হয়, তাহাতে কাঁটাল গাছ হইতে পারে না, কদাচিৎ হইলেও দীর্ঘ জীবী হইবে না এবং তাহাতে অধিক ফল ফলিবেনা। কাঁটালের আবাদ করিতে হইলে মৃত্তিকার ঐ রূপ গুণ পরীক্ষা করিয়া স্থান নির্ব্বাচন করা উচিত।

মেদ, অস্থি, খৈল, মল মূত্রাদি, এবং উদ্ভিদ এই গুলি হইতে যে সার প্রস্তুত হয়, সাধারণতঃ কাঁটালগাছে তাহাই ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এতভিন্ন বিশেষ বিশেষ উদ্ভিদের জন্য আরও কতকগুলি সার আছে, কিন্তু সকল সারই সকল উদ্ভিদের উপযোগী নহে। যেমন সকল পশু পক্ষীতে সকল বস্তু আহার করিতে পারে না, সর্ব্ব দেশীয় সমুদয় লোকই যেমন এক বস্তু আহার করিয়া আত্ম-রক্ষা করিতে পারে না, সেইরূপ সকল উদ্ভিদসকল সারের দ্বারা পরিবর্দ্ধিত কি পরিপোষিত হইতে পারে না।

কৃষিতত্ত্বের পাঠক মাত্রেই বোধ হয় উদ্ভিদ সারের বিষয় এবং তাহা প্রস্তুতের প্রণালী অবগত আছেন। সেই উদ্ভিদ সার কাঁটাল গাছের পক্ষে উত্তম পরিপোষক। কাঠালের বীজ বপণের পূর্ব্বেই উদ্ভিদ সার প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হয়। কারণ যথা সময় উদ্ভিদ সার পাওয়া যায় না অথবা প্রস্তুত করা যায় না।

বীজবপণের অন্যূন একমাস পূর্ব্বে ১৬ হাত অন্তর একহাত দীর্ঘ প্রস্থ এবং এক হাত গভীর গর্ত্ত, করিতে হয়। তৎপরে ১৫ দিন অন্তে উদ্ভিদ সারের দ্বারা গর্ত্ত পূরণ করিয়া উপরে অল্প (তিন ইঞ্চি) পরিমাণ মৃত্তিকা চাপা দিয়া রাখিতে হয়, পরিশেষে অঙ্কুরিত বীজ সেই গর্ত্তে বপণ করিতে হয় এরূপে বীজ যেন গর্ত্তস্থিতসার মাটিতে উপ্ত হয়, বীজের উপরি ভাগে একইঞ্চি পরিমাণ সার ও দুই ইঞ্চি পরিমাণ মাটি থাকা চাই সার মৃত্তিকায় অধিক তাপ লাগিলে তাহার গুণের হ্রাস হইয়া যায়।

যে উদ্ভিদের যত রস আকর্ষণ করিবার শক্তি আছে, তাহা সেই পরিমাণ ব্যবধানে রোপন করা উচিত। সাধারণতঃ লোকে বলে এক বৃক্ষের শাখার অন্য বৃক্ষের সহিত ঘর্ষণ হইলে ফল ধরেনা অথবা কম ধরে, তাহার অন্য কারণ নাই, বৃক্ষ সকল নিকটবর্ত্তী থাকায় মৃত্তিকার রস অধিক আকর্ষণ করিতে পারে না এবং পরস্পর আচ্ছাদনের গতিকে বায়ু তাপ আলো উপযুক্ত রূপ পাইতে পারে না। তাহাতেই ফল ধরেনা কি কম ধরে। এই জন্য উদ্ভিদের প্রকৃতি বুঝিয়া তাহা সেই পরিমাণ ব্যবধানে রোপণ করিতে হয়।

প্রায় সকল বৃক্ষেরই যে ফল সর্ব্ব প্রথমে বৃক্ষে সুপক্ক হয়, তাহা হইতে বীজ রাখা উচিত। যে কাঠাল, বৃক্ষে সুপক হয় (অনেক সময় বৃক্ষে কাঠাল থাকিতেও তাহার মধ্যে বীজ অঙ্কুরিত হইয়া থাকে) কাঠালের মধ্যে যতগুলি বীজ থাকে তাহার সমুদয় গুলিই বীজের উপযোগী নহে। দুই প্রকার বীজ থাকে, সাধারণতঃ চেপ্‌টা গুলিকে স্ত্রী এবং সুগোল গুলিকে পুং বলে। পুং জাতীয় বীজে গাছ ভাল ও দীর্ঘজীবী হয় না।

কাঠালের বীজ একস্থানে রোপণ করিয়া গাছ হইলে স্থানান্তর করিলে সেই গাছের কাঠালে কোষ (কোয়া) থাকে না, সমুদয় ভুচরা হইয়া যায়, অতএব কাঠাল গাছ কদাপি স্থানান্তর করা বিধেয় নহে।

এক স্থানে উৎপন্ন কাঁটালের চারা স্থানান্তর করিয়াও তাহাতে উত্তম কোষযুক্ত কাঁটাল জন্মিয়াছে, আমরা ইহারও প্রমাণ পাইয়াছি।

কাঠাল গাছ রোপণের আর এক প্রণালী আছে, সুপক কাঠাল, গাছ হইতে পাড়িয়া, তাহার মধ্যের সাষ (মাইজ) টানদিয়া ফেলিয়া দিতে হয়, পরে পূর্ব্ববৎ গর্ত্তের মধ্যে আস্ত কাঠালটি রোপণ করিয়া মাটি চাপা দিতে হয়, তাহা হইতে অনেক গুলি চারা একত্রে জড়ি হইয়া উঠে, কেমন কোনটা বিচ্ছিন্ন ভাবে বাহির হইলে, তাহাও কোন রূপ কোমল বস্তুর দ্বারা জড়িত করিয়া দিতে হয়, তাহা হইলে সমুদয় গুলি জড়িত হইয়া একটী গাছ হইয়া উঠে, এই গাছের কাঠাল আকারে বড় হয় না, কিন্তু ঐ গাছে বহুতর ফল ধরে, সাধারণতঃ

ইহাকে হাজারী কাঠাল গাছ বলে, অনেক ধরে বলিয়া হাজারি নামে অভিহিত হয়।

কাঠাল যত্ন সহকারে পালন করিলে ৫ কি ৬ বৎসরে ফলবান হইয়া থাকে। চারি বৎসরেও কাঁটাল গাছ ফলিতে দেখা গিয়াছে। গাছ একটু বড় হইলেই অগ্র ভাগটি কাটিয়া দিতে হয়, পরে বৃহদাকার হইলেও মধ্যে মধ্যে শাখা গুলি কাটিয়া দেওয়া উচিত। ইহা প্রায় সমুদয় গাছের পক্ষেই সুবিধান। তাহাতে গাছের নূতনত্ব থাকিয়া যায়, প্রাচীনত্ব জন্য ফল ছোট কি কম হয় না।

উদ্ভিদের আর একটী সাধারণ নিয়ম এই যে, যে গাছের ফল কিম্বা মূল বড় করিতে হইবে, তাহার শাখা প্রশাখা অধিক বৃদ্ধি হইতে দেওয়া উচিত নহে শাখা প্রশাখা বৃদ্ধি হইয়া অধিক রস আকর্ষণ করিতে পারিলে ফল কি মূল বড় হইতে পারে না।

আমাদের নিয়মানুসারে কাঠাল গাছের বাগিচা করিলে প্রতি বিঘায় ৩০টী করিয়া গাছ হইতে পারে। অন্তত গড়ে ২০টী করিয়া কাঁঠাল প্রতি গাছে ফলিলেও এবং ৵০আনা করিয়া মূল্য ধরা গেলে ৭৫ ৲টাকা উৎপন্ন হইতে পারে। ঐ বাগিচা অধিক শ্রম বা ব্যয় সাধ্য নহে গাছ ফলবান হইলে আর কিছুই করিতে হয় না। মাত্র বৎসর একবার কোদাল পাড়িয়া দিলেই হয় এবং বৎসরের ফল শেষ হইয়া গেলে ২।৩ বৎসর পর এক একবার ডাল গুলি কাটিয়া দিতে হয়।

এ ভিন্ন কাঠালের তক্তা অতি আদরের জিনিষ, গাছ অনেক পুরাণ হইলে কাটিয়া তক্তা করিলে ও মূল্যবান্ বস্তু হইতে পারে।

শ্রীশশিভূষণ গুহ

সিলেট কাল্‌টি ভেটিং কোং লিঃ

ইনেস্পেকটর

প্রেরিত।

—ঃ—

কোন বন্ধু হইতে প্রাপ্ত।

"ও ভাগে এত দিনের পর তোর ধার শুধলে রে" এই বলিয়া ব্রাহ্মণ কুমার সাহেবের সবুট পদাঘাত খাইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। সভ্যতা মদে মত্ত হইয়া পুরা কালীন হিন্দুরা অপর জাতিদের ম্লেচ্ছাদি যবন, উপাধি দিয়া অনাদর এবং পরাজিত দাসদিগকে অনেক সময় পশু অপেক্ষা নিকৃষ্ট রূপে ব্যবহার করিতেন। উচ্চ শ্রেণীতে দ্বিজরা আপানাদিগকে দেবতাপেক্ষা বড় বুঝিতেন এবং অন্যের কথা দূরে থাকুক স্বয়ং অষ্টম-অবতারের বুকে যমদগ্নি লাথি মারিতে কিছুমাত্র কিন্তু করেন নাই। কিন্তু ভগবান কর্ম্মের ফলদাতা। তিনি দুর্ব্বৃত্তের দর্পহারী। ৮০০ বৎসর পরাধীন রাখিয়া আমাদিগের সে অহঙ্কার চূর্ণ করিয়াছেন। আর কোথায় সে রূপ, সে বল, সে সাহস—সে একতা!—সকলই এক কালে অন্তর্হিত হইয়াছে। নিকৃষ্টতার শেষ পদবীতে (ধাপে) আমরা পদার্পণ করিয়াছি। পূর্ব্ব আর্য্যগণ অবনীতে আসিয়া আমাদিগকে স্ব বংশ বলিয়া বোধ হয়, এখন আর চিনিতে পারেন না। আমাদিগের চরিত্র সং ক্রু সে কাল যাহা লিখিয়াছেন, তাহা যদিও শুনিতে কর্কশ কিন্তু নিতান্ত অমূলক নহে। রোগের চরমাবস্থায় পৌঁছন হইয়াছে। এখন আর উপায়ান্তর নাই। হয় মৃত্যু,—নতুবা আরোগ্য লাভ,—পুনর্জ্জীবন।

"ন দেবাঃ সৃষ্টিনাশকাঃ।" ঈশ্বর আমাদিগের পিতা। তিনি একেকালে আমাদের নষ্ট করিবেন না। সংশোধনার্থে শাস্তিদেন।

অপরিসীম কষ্ট ভোগে বোধ হয় আমাদের পাপের পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। বিধাতা করুণা পরতন্ত্র হইয়া ইংরাজকে এ মহারাজ্যের অধীশ্বর করিয়াছেন। এত কাল সুষুপ্তি অবস্থা হইতে তাঁহারাই আমাদিগকে জাগাইতেছেন। সতেজ ও নব জীবনের চিহ্ন চারি দিকে লক্ষিত হইতেছে। বিদ্যাসাগর, মাইকেল দত্ত, দীন বন্ধুর গদ্য পদ্যরচনায় বাঙ্গালা-

ভাষা নব রূপধারণ করিয়াছে। মহানগরীতে ২টী নাট্যশালার সংস্থাপন এবং তথায় বিবিধ নাটকাভিনয় হইয়া লোকের মনোরঞ্জন ও সময়ে সময়ে কোন কোন কুসংস্কারও নষ্ট হইতেছে। নব গোপালের যত্নে জাতীয় মেলার সৃষ্টি এবং বৎসর বৎসর উহার উন্নতি হওয়ায় পরস্পরের মধ্যে একতার বিলক্ষণ সম্ভবনা দেখা যাইতেছে। বিধবা বিবাহ শাস্ত্র সম্মত ইহা পক্ষপাতশূন্য সুবোধ মাত্রের বিশ্বাস এবং ইহার সূত্র পাত ও হইয়া রহিয়াছে। এখন ইচ্ছা হইলে পতিহীনা বামার পুনঃ পরিণয় পাশে বদ্ধ হইবার কোন প্রতিবন্ধক নাই। বহুবিবাহ দিন দিন কম পড়িতেছে। কেবল মাত্র কুলীনত্বের আর সে রূপ আদর দেখা যায় না, এরূপ নহে, উদ্বাহ ব্যবসায় অনেক স্থলে নিন্দনীয় কার্য্য বলিয়া গণ্য হইতেছে। এদিকে দয়ানন্দ সরস্বতী একমাত্র ঈশ্বর বেদের উপপাদ্য এবং দেবদেবী পূজা ইহা সনাতন ধর্ম্ম বিরুদ্ধ ইহা ভারতের সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন।

রেলগাড়ি হওয়ায় মুসলমানী পরদা নবিসত্ব আর কই থাকে। ঘেরাটোপ বিশিষ্ট পালকি মধ্যে থাকিয়া বড়ঘরের কামিনীর গঙ্গাস্নান উঠিয়া গেল। ইংরাজি শিক্ষা প্রবল, ব্যবসায় বাণিজ্যের আধিক্য, অর্থের আধিক অনুসন্ধান ইত্যাদি কারণে জাতিভেদ সংস্কার দিন দিন হীনবল হইতেছে। এখন খাওয়ায় আর ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই। জাহাজ চড়া সমুদ্র পার হওয়া বা বিলাত গেলে আর জাতি যায় না। মাত্র উদ্বাহে হিন্দুয়ানী আটকায়। ব্রাহ্মরা তাহাও উল্লঙ্ঘন করিয়াছেন। ইহা বলিয়াই হিন্দুধর্ম্মর এককালে লোপ হইল, তাহা আমরা বলি না। কালে কালে ইহা বিবিধ আকার ধারণ করিয়াছে. এখন পুনঃ অভিনব রূপ গ্রহণ করিবেক তাহার বিচিত্র কি। রুগ্ন ও দুর্ব্বলাবস্থায় লোকে একভাবে থাকে, কিন্তু নির্ব্ব্যাধি ও সবল থাকিলে মানুষে নানা খেল্ খেলে। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণেরা শাস্ত্রাধিকারী থাকায়, বিদ্যা কয়েক শ্রেণীর এক চেটিয়া করিয়া রাখিয়াছিলেন। যাহা কিছু নূতন, তাহাদিগের হাত দিয়া না বাহির হইলে সাধারণের গ্রাহ্য হইত না। তাহারা সকল বিষয়ের যাচনদার ছিলেন। এখন এক সুশিক্ষিত অথচ জাতিতে চাসা যত্ন, শ্রম ও অধ্যবসায়

সহকারে বিজ্ঞান শাস্ত্রের উন্নতি জন্য Science association নামক সভা সংস্থাপন এবং তদ্‌নিমিত্ত বহুল অর্থ সংগ্রহ করিয়া কতিপয় বিজ্ঞ ও পণ্ডিতের সাহায্য গ্রহণ করিয়া নানা বিষয়ে শিক্ষা দিতেছেন। এই সভা রূপ জ্ঞান বৃক্ষের এখন অঙ্কুরাবস্থা মাত্র। সময়ে বড় হইয়া যখন ফুলে শোভিত হইয়া ফল দিতে থাকিবেক, তখন কেবল অস্মদ দেশ নহে কিন্তু সমস্ত পৃথ্বীলোক ইহা দ্বারা উপকৃত হইবে এবং সকলে ডাক্তর সরকারকে অশীর্ব্বাদ এবং তিনিও স্বর্গধামে বসিয়া বিপুল অকৃত্রিম আনন্দ সম্ভোগ করিবেন।—আবার বিদ্যার প্রচলন ও উন্নতি জন্য কি রূপ আগ্রহ ও যত্ন, সাধারণ-শিক্ষা, উচ্চ-শিক্ষা, স্ত্রী-শিক্ষা শিল্প-শিক্ষা,—চারি দিকে ব্যাপিয়া পড়িতেছে। শ্রমিদিগের নিমিত্ত নৈশবিদ্যালয় সংস্থাপন এবং নানা প্রকার পুস্তক সংকলন ও বহুল সংবাদ পত্র প্রকাশ দ্বারা সমাজের জ্ঞান বৃদ্ধি হইতেছে। যে স্থলে বহুজন বিশেষ স্ত্রী-পুরুষের একত্র সহবাস তথায় সুনিয়মাদি না থাকিলে বিলক্ষণ অমঙ্গলের সম্ভবনা। এই জন্য বরাহনগরে কারখানায় সহস্র সহস্র ব্যক্তির হিতার্থ শশিপদ বাবু বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন এবং কিয়ৎ পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। জাত্যভিমান পরিত্যাগ করিয়া ভদ্র কুলোদ্ভবেরা দরজির দোকান খোলা অপমান বোধ করেন না। " নত্তক হেজ " ইহা নব্য সম্প্রদায় মধ্যে কেহ কেহ বুঝিতে পারিয়াছেন।

সামান্যতঃ প্রবাদ আছে, যে একটীর স্থানে যিনি শস্যর দুইটী f উৎপাদন করেন, তিনি দেশ হিতৈষী এবং নর জাতির মঙ্গলাকাঙ্ক্ষ রাই ধার্ম্মিক।—ধর্ম্ম চালনাই মনুষ্যের একমাত্র কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ঈশ্বর জ্ঞান জ্ঞান—অপর সকল শাস্ত্রকে বিজ্ঞান কহে; উহারা অর্থকরী বিদ্যা—উহাে চর্চ্চায় আত্মার কোন উপকার নাই। এ সংস্কারটী সম্পূর্ণ ভ্রম মূলক জড় পদার্থ ও চৈতন্য, শরীর ও আত্মা ইহাদিগের পরস্পর বড় নিক সম্বন্ধ। সভ্যতা না বাড়িলে ধর্ম্মেরও শ্রীবৃদ্ধি হয় না। আণ্ডামান ও অষ্ট্রেলিয়ার আদিম বাসী এবং ইউরোপীয় জাতি মধ্যে কত প্রভেদ ধর্ম্ম স্বয়ং ঐ বন্যদিগের উপর কর্ত্তৃত্ব করিলেও বোধ হয় তাহাদিগকে ধার্ম্মিক করিয়া তুলিতে পারেন না। সৃষ্টি সমস্তই ঈশ্বরের। বিশ্ব সম্বন্ধে

যতই অধিক জানা যায় ততই আমাদের শক্তি বাড়ে। তাহার নিয়ম অবগত হওয়ার ক্ষমতা কেবল নরকে দিয়াছেন এবং তদ্‌বিষয়ে সচেষ্ট না হওয়া বিশেষ দোষাবহ। বল দেখি "নির্ব্বোধের প্রবীণ হয়ে ফল কি বাচায়রে"। অনেকের বিশ্বাস যে প্রত্যহ অধিক বার ডাকিলেই জগৎকর্ত্তা তৃপ্ত হন। জপ করা কর্ত্তব্য কর্ম্ম বটে; কিন্তু কেবল মাত্র বিশ্বজনককে স্মরণ করায় আমাদিগের বিহিত কার্য্য সাধন করা হয় না। জন হওয়ার্ড দেশে দেশে জেলের অবস্থা দর্শন এবং ভুক্তভোগী হইয়া বন্দিদের দুরবস্থা সাধারণের গোচর করাইয়া তাহাদের যন্ত্রণা লাঘব করা, পশ্বাদির ন্যায় মানুষ কেনা বেচা নিবাকরণ বিশেষ কাফ্রিদিগের দাসত্ব মোচন নিমিত্ত টম্‌স ক্লার্কসন অনন্যমনা ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া ৫০০০ ক্রোশ ইতস্ততঃ ভ্রমণ এবং ২০ বৎসর কাল প্রায় দিন রাতশ্রম করা—সংকার্য্য কাজ সারিয়া বিদ্যাসাগর স্বয়ং বিনা সাহার্য্যে এক বৎসরাধিক কাল শেষ রাত্র পর্য্যন্ত জাগিয়া বিধবার পুনঃ পরিণয় শাস্ত্র সম্মত সাব্যস্ত করা এবং কার্য্যে তাহা সুসিদ্ধ করণোদ্দেশে অনেকের দ্বারস্থ হওয়া—এবং গোড়াও ব্যলীকদের গালিগালাজ ও ভয় প্রদর্শন ও বহু কাল প্রাণনাশের আশঙ্কা সত্ত্বেও অকুতোভয়ে অভীষ্ট সিদ্ধি হেতু সত্যধিকতর যত্নশীল হওয়া—এই সমস্তই প্রকৃত উপাসনা। এই রূপ মহাত্মাদিগের বিশ্বাস যাহা হউক না কেন বস্তুত ইহারাই ধার্ম্মিক এবং ইহারাই ঈশ্বর প্রিয়।——

ধন ও ধর্ম্ম ইহারা পরস্পর শত্রু ইহা অপর একটী ভ্রমাত্মক সংস্কার। ধনের অপব্যয়ই দোষের। সতের হস্তে ধনদ্বারা ধর্ম্মের বিশেষ আনুকূল্য হয়। ধন সভ্যতার ভিত্তি স্বরূপ। কৃষি বাণিজ্য শিল্প ইহারা ধনাগমের ভিন্ন ভিন্ন পন্থা নৃত্যগোপাল বাবু ইহার একটীর ভার গ্রহণ করিয়াছেন। যদিও লেখকের উক্ত বাবুর সহিত চাক্ষুষ আলাপ নাই কিন্তু যতদূর জ্ঞাত আছেন বোধ হয় অপরাপর দেশহিতৈষী মহোদয়গণের ন্যায় বহু শাস্ত্রজ্ঞ, ধনী, সম্ভ্রান্ত বা উচ্চপদস্থ বা অসামান্য বুদ্ধিজীবী নহেন; কিন্তু একাগ্রতা যত্ন অধ্যবসায় এবং মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন এরূপ প্রতিজ্ঞায় কোন মহাত্মার ন্যূন নন।

অজ্ঞানতা, দরিদ্রতা, স্বার্থপরতা কুসংস্কার, অধর্ম্ম ইহারা পরস্পর সঙ্গের সঙ্গী ভারতরূপ দুর্গকে অধীন করিয়া বহুকাল একাধিপত্য করিয়া আসিতেছেন। এখন উহার চারিদিকে বেড়া আগুন লাগিয়াছে। আর রক্ষা নাই এখন যে পরিমাণে সকলে মিলিয়া আনুকুল্য প্রদান করিব সেই পরিমাণে শীঘ্র শীঘ্র শত্রুর নাশ সম্ভব।

কৃষি বিদ্যা ও কৃষিকার্য্য উন্নতি সম্বন্ধে সাধারণের কি কি কর্ত্তব্য অদ্য তাহা সংক্ষেপে বলিব। ধনী ও ভূস্বামিগণ অর্থ দিয়া আনুকুল্য করুন। অমনি কিছু দিবার আবশ্যকতা নাই। নরসরির গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইলে নানা দেশীয় শাক সবজির বীজ ও উৎকৃষ্ট ফল ফুলের বৃক্ষ বিনা বা স্বল্প মূল্যে পাইবেন। বাজারের দ্রব্য অধিকাংশই বাগানে পাইবেন। যাঁহারা সুস্বাদু সামগ্রী খাইতে ইচ্ছা করেন তাহাদের নিজে উৎপাদন করা বিহিত। এতদভিন্ন প্রজা ও প্রতিবাসী মধ্যে বীজ আদি বিতরণ করিয়া তাহাদের অবস্থা উন্নতি করায় কিয়ৎ পরিমাণে আপনাদের অধিক ধনাগম সম্ভব এবং তাহাদের সুখে আপনারাও সুখী হইতে পারেন। রাইয়তের মধ্যে কৃষিতত্ত্ব বিতরণ করায় তাহাদের অনেক উপকা হয়। শুনিতে পাই স্থানে স্থানে পাঠশালায় কৃষি পুস্তক পাঠ হইয়া — । তথাকার অধ্যক্ষদের এই মাসিক পত্রিকা লওয়া উচিত। রসায়ন ও ...জ্ঞ শাস্ত্রজ্ঞেরা সরল ভাষায় কৃষিবিদ্যা সম্বন্ধে উপদেশ দিতে ...ন। পাঠশালা ও ইস্কুলের শিক্ষকরা ভিন্ন ভিন্ন জিলা বা মহকুমার অ... বাদ প্রণালী এই পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া কৃষকের অনেক উপকার ক... ...তে পারেন, সুবোধ প্রাচীন চাসারা স্বয়ং বা অন্য দ্বারা আপনাদের বহুদ... ...র্শন- যথা জমি চেনা, কোন ভূমিতে কোন ফসল ভাল হয়, কি প্রকার ... কোন আবাদের উপকারী এই সমস্ত প্রকাশিয়া সমাজের হিত সাধন করু...

পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা ইহারা সকল প্রকার জ্ঞানের মূল। ... হইতেই সকল শাস্ত্রের উৎপত্তি ও উন্নতি। ভদ্র ও বিজ্ঞ কৃষিরা আ... আপন কার্য্য সম্বন্ধে পরীক্ষার ভাল মন্দ ফল লিপিবদ্ধ করিয়া প্রে... করিলে সাদরে গৃহীত ও প্রকাশিত হইবেক। কোন বিশেষ য... ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ভূমিতে যথা মেটেল বেলে. লোনা. দোয়াসে; বুন

বা সারিবন্দি করিয়া কম বেশী অন্তর অল্প বা অধিক মাটির নীচে রোপণে এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রকার সার ব্যবহারে শস্যাদির উৎপন্নের বিভিন্নতা জানিতে পারিলে উন্নতি সম্বন্ধে অনেক দূর অগ্রসর হওয়া যায়। এবং শাস্ত্রের সঙ্গে ব্যবহারের মিল হইলে [illegible] থাকে না। অনৈক্য হইলে কোথায় ভুল তাহা নিরূপণে সচেষ্ট হওয়া যায় এবং শীঘ্র বা বিলম্বে প্রকৃত নিয়ম-আবিষ্কৃত হইয়া বিদ্যার উন্নতি সাধন হয়।

[illegible]র মঙ্গল [illegible] জমিদার, রাইয়ত, ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত, বিষ[illegible] শ্রমীর চাসা [illegible]লেরই আনুকূল্য আবশ্যক। কৃষিতত্ত্বে নানা স্থান হইতে প্রেরিত পত্রের সংখ্যা দেখিয়া অনেকেই যে ইহার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বিল[illegible]ণে প্রতিপন্ন হইতেছে। এককালে হঠাৎ যে আমরা পূর্ণ ম[illegible]র [illegible] ইহা প্রত্যাশা করি না। মহানগরীর মনোহর রাজপ্রাসাদ গা[illegible]ল য[illegible]হাস এক মাস বা বৎসরে বিনির্ম্মিত হয় নাই। সকলেই স[illegible]তে [illegible]ক্ষ। এক্ষণে আমাদিগের কর্ত্তব্য যে সকলে একমত হইয়া কা[illegible]মনোবাক্যে জগদীশ্বরের নিকট সর্ব্ব বিধায়ে জাতীয় উন্নতি নিমিত্ত প্রার্থ[illegible] যেন অভীষ্ট সিদ্ধি নিমিত্ত তিনি আমাদিগকে আবশ্যকীয় বল বুদ্ধি [illegible]ক্ষমতা প্রদান করেন।

কৃষিশব্দাম্বুধি।

ধন[illegible]

গ্রহ[illegible] নানা স্থানে নানা প্রকার কথা প্রচলিত। কোন কোন নাই[illegible] এরূপ শব্দ ব্যবহার করে যে, শুনিলে বোধহয় যেন মহে[illegible]ল [illegible]যা নহে, এবং তাহাদের উচ্চারণ পদ্ধতি এরূপ জটিল বুদ্ধি[illegible] যেন তাহা কোন বাঙ্গালীর কণ্ঠনিঃসৃত বলিয়া বোধহয় বি[illegible] প্রথ[illegible] যা যতদিন পর্য্যন্ত উৎকর্ষসহ পরিষ্কৃত হইয়া না,

আসিবে তত দিন ইহার শুভ দেখিতে পাইতেছিনা। বাঙ্গালাদেশের নানাস্থানের কৃষকেরা ও এতার্থ বাচক পদকে নানা প্রকার শব্দে অখ্যাত করেন। স্বভাবতঃ কৃষকের ভাষা শুদ্ধ বাঙ্গালা নহে, দ্বিতীয়তঃ উচ্চারণ [illegible] ও জঘন্য, তৃতীয়তঃ তাহা আবার নিতান্ত অপভ্রংশ। কৃষক সমাজের অধিকাংশ শব্দ শব্দাম্বুধিতে পাওয়া দু[illegible] সুতরাং বিদ্যাসাগরের ন্যায় পণ্ডিত হইলেও কৃষকের সহিত তো[illegible] কথোপকথন হওয়া দুষ্কর। এইজন্য তাহাদের গ্রাম্য [illegible]থা জানা [illegible] আবশ্যক। আমরা বহু পরিশ্রম করিয়া [illegible] জর অনেক গ্রাম্য কথা সংগ্রহ করিয়াছি। তাহা ক্রমে ক্রমে [illegible] স্তত্ত্বে প্র[illegible] করিব। ইহাতে অনেক উপকার লাভের যে সম্ভাবনা [illegible]ছে, ত[illegible] সন্দেহ নাই। আমরা প্রথমে শব্দগুলি প্রকাশ করি, পরি[illegible]শিষ্টে তা[illegible]দের অর্থ লিখিয়া দিব। কৃষিবিদ্যার আলোচনায় বা কৃষিকা[illegible] নিমিত্ত যে সকল শব্দ ব্যবহীত হয়, এই প্রস্তাবে তাহা[illegible]রই উ[illegible] প্রবৃত্ত হইতেছি। এই সকল শব্দ কৃষি-যন্ত্র, ভূমি, গবাদি প্রভৃতি বাচ[illegible]

দানা, এটুন, জাংগী, বীজ (বীচ্), ছালা, আছুড়[illegible], স[illegible] কুটী, বিশ্, কাহণ, পণ, গাঁতী, ফুলন, বাঁশান, নলগাড়ী, আল্, (আলি), বীচুন, রোয়া, বোনা, বাড়ি, দাউলে বিদে, কেতেরা ছিঁচ্, পত্তিত, শুকো, হাজা, নেয়াল, ছি[illegible] মইদেওয়া, গাঁজ, গোঁট্রা, জোল, জোং, জোঙ্গার, কীতে, নাবি[illegible] ঝাড়া, অকুড়া, বাং, গোলা, ঘাই, মরাই, পালুই, মাড়ামাড়া, নিড়ন, ছিঁচ্, সারন, ধুলাচাস, শালকাঠ, আম্‌দো[illegible] আকৃড়োদড়া, খুশী, শোয়াতী, আড়চাল কাষ্ঠ, ফাল, [illegible] মুড়ো, ইশ্, জোয়াল্, চেয়ো, এঁড়ে, দাম্‌ড়া, আঁটরা, জু[illegible] গাই, কড়দরুন, খাশী, কেলে, ভুঁই, ঘোগ্, আড়্, গাড়ি[illegible] টায়েটায়ে, নাবিউপু, মোণাপণা, লগজে, লগা, কাঁপা, গুণ, পালা[illegible]

[ক্রমশঃ]

শ্রীরাজেন্দ্র নাথ দত্ত

কমলা লেবু।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কমলালেবুকে নারাঙ্গী কহা হয়। কমলা ও ঙ্গী অথবা নাগরঙ্গী একই সামগ্রী। নারাঙ্গী প্রাকৃতিক শব্দ। নবু প্রায় ভারতবর্ষের সকল স্থানেই আছে। একারণ কমলা ক দিন হইল এদেশে আসিয়াছে। কিন্তু কখন আসিয়াছে অথবা শই বরাবর ছিল তাহা বলা দুঃসাধ্য।

রাঙ্গী উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বঙ্গদেশের মত শীতকালে হয়। কিন্তু সময়ে অধিকাংশই টক্ হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত নারাঙ্গী বৎস-ধ্যে প্রায় ৮। ৯ মাস পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। বরং ত াহা পাওয়া যায় তাহা অতি অল্প ও আকৃতিতে ছোট মিষ্ট হইয়া থাকে।

নৌয়ের Agri-H Horticultural বাগানে কমলানেবুর হইতে ামে তাহা লিখিত হইল।

সমস্ত কমলানেবুকে ডাক্তার বোনাভিয়া in) সিলেট (Sylhet) নাগপুর (Nagpur) gh) ও মালটা (Malta) এই কয় প্রকারে নাগপুর কমলা অতি উৎকৃষ্ট এজন্য ইহার বিষয় লয়াছেন। আর ডাক্তার বোনাভিয়া বলেন, এস্থানে নেবুও উত্তমরূপে উৎপন্ন হইতে পারে।

সাহেব মালটানেবুকে সর্ব্ব প্রধান বলেন, ও যত প্রকার বাগানে আছে সকলই ফলবান হইয়াছে। মালটানেবু পেক্ষা অধিক ফলে, সুতরাং লাভজনক হইয়াছে। আর যখন সুপক্ক হয় তখন বড় সুগন্ধি হইয়া থাকে। ইহা াগেই খাইবার যোগ্য হয় বলিয়া কাঁচা অবস্থায়ই সেপ্টেম্বর ম বাজারে পাঠান যায় ও বিলক্ষণ দামে বিক্রয় হইয়া থাকে।

যখন এই সব গাছের কোন অংশ দূষিত হয় তখন সেই দূষিত ভাগ সুস্থ ডাঁটা হইতে চাঁচিয়া ফেলা হয়। এ প্রকার করাতে প্রায় সুফল ফলিয়া থাকে।

সিলহেটনেবু আকৃতি, গঠন, ছাল প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকারে সিলহে ন্যায় হইয়াছে।

নাগপুরনেবু (বড় ও ছোট) সিলহেটনেবু হইতে কিছু আছে। সে কেবল জল বাতাস ও জমির জন্য হইয়াছে।

সান্ত্রা আর এক প্রকার নেবু, এও নাগপুর নেবুর সহিত খুব সম্পর্ক রাখে।

ডাক্তার বোনাভিয়া পমেলো (Pammelow) জাতীয় নিম্ন-লিি রের কমলা সকল পরীক্ষার্থে রোপণ করিয়াছেন। যথা ot), সান্ত্রা (Santra), কেওলা (Kewla), মাল্টা (M ড় (Nagpur large), নাগপুর ছোট (Nagpur s (Malta lemon), পমেলো (Pammelow)।

নেবু অত্যন্ত বিস্বাদ, কিন্তু এদেশে বেশ ম্মায় ন্ধ ও মিষ্টতা কিছু মাত্র নাই। অন্য নেবুতে যদিও ঠাচ গঠনাদি কেওলার মত হয় না। ইহাদের সং ন নেবু হইতে পারে, এই ভাবিয়া রিড্‌লি সাহেব মাল রেণু লইয়া কেওলা নেবুর ফুলে ও কেওলা নেবু ফুলের নেবুর ফুলে দিয়াছিলেন; কিন্তু কেবল একটী কেওলা াছে। এস্থলে আমরা পাঠকদিগকে অনুরোধ করি তাঁ এই সব নেবুর পরীক্ষা করেন তা হইলে অতি উৎকৃষ্ট উৎ উৎপাদন করা যায়।

মালতা ও অন্য অন্য নেবুর চারা কিম্বা ফল উক্ত বাগানে টেন্ডেণ্ট সাহেবের নিকট আবেদন করিলে পাওয়া যাইতে পারে

শ্রীহরিদাস

আলাহা

শ্রীযুক্ত কালীময় ঘটক প্রণীত নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি কলিকাতা ...ত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে এবং চীনাবাজার পদ্মচন্দ্র নাথের দোকানে ...ওয়া যায়।

পুস্তক।			মূল্য।
...া চরিতাষ্টক	...	...	॥০
...য় চরিতাষ্টক	...	...	॥০
...য় (প্রথম ভাগ)	...	...	৵০
...ষ প্রবেশ	...	...	৵০
...ষ শিক্ষা	...	...	॥০
...মস্তা	...	...	১
... (কবিতাময় খণ্ডকাব্য)		...	৵০
...-স্বপ্ন (কবিতাময় খণ্ড কাব্য)		...	৵০

মূল্য প্রাপ্তি।

১। শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী-সি, আই, ই, কাসিমবাজার ... ৫০

কৃষিতত্ত্বের উন্নতি জন্য বিশেষ দান।

২। শ্রীমতী .. ঐ ... ঐ ... ২৲

৩। শ্রীযুত বাবু দুর্গাচরণ রক্ষিত-কলিকাতা ... ৩।

৪। শ্রীযুত বাবু দ্বারিকানাথ মজুমদার, রাধানগর পাবনা ২-

৫। শ্রীযুত রায় রাধাগোবিন্দ রায় সাহেব বাহাদুর, দিনাজপুর ২৲

৬। শ্রীযুত রাজা মহেন্দ্র লাল খাঁ বাহাদুর নাড়াজোল (মেদিনীপুর) ... ৩

৭। শ্রীযুত মান্যবর এইচ, এল্ ডেমপিয়ার সাহেব, কলিকাতা ৪

৮। শ্রীযুত বাবু কিনু সিংহ রায়, নবাবগঞ্জ, রংপুর ...

৯। শ্রীযুত বাবু অতুলচরণ মল্লিক, ভাগল পুর ...

শ্রীযুত নবাব আবদুল গণি, সি, এস, আই ঢাকা ... ২৲

শ্রীযুত বাবু চণ্ডীপ্রসন্ন রায় কইগোলা, রংপুর ... ৩।৵

যুত বাবু মোহিনীমোহন দাস ঢাকা ... ২৲

ত বাবু আনন্দকিশোর তরফদার, সেরপুর, বোগরা

ত বাবু ফটিকচন্দ্র বোড়ুয়া কামরূপ, গৌহাটী ...

ত বাবু জলধর সাহা, আমতা, বেলিহাটি ...

যুত মুন্‌সি আলতাফ হোঁশেন, চুয়াডাঙ্গা ...

যুত বাবু এস্, এন, ঠাকুর সি এস্ সুরাট ...

শ্রীযুত বাবু রঘুনাথ দাস ঢাকা ...

। শ্রীযুত বাবু রাস বেহারী বন্দ্যোপাধ্যায় হাইকোর্ট কলিকাতা। ১

২০। শ্রীযুত কুমার প্রমথ ভূষণ দেব রায়, নলডাঙ্গা যশোহর

২১। শ্রীযুত রায় হরিমোহন চূড়ামণি, সবডেপুটি কালেক্টার, খুরদা, কটক

২২। শ্রীযুত বাবু শ্রীরাম মজুমদার মাধবপুর-লালপুর ...

২৩। শ্রীযুত কুমার বৈকুণ্ঠ নাথ দে, বালেশ্বর ..

কৃষিতত্ত্বের পাঠকগণের প্রতি অনুরোধ, কৃষিতত্ত্বে কোন পত্র পূর্ব্বে তাঁহারা একবার উহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংখ্যা গুলি পাঠ ক পুনঃ পুনঃ এক এক বিষয়ের উল্লেখে কোন ফল নাই; বরং অ

ষ্ঠ সংখ্যা।

কৃষিতত্ত্ব।

মাসিক পত্রিকা।

দ্বিতীয় খণ্ড।

আষাঢ় ১২৮৭

পাইকপাড়া নর্শরি হইতে [illegible]ত।

সূচী।

কলিকাতা।

১৬৭ নং, কর্ণোয়ালিস ষ্ট্রীট,—কর প্রেসে

শ্রীঅধর নাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

বিজ্ঞাপন।

কৃষিতত্ত্ব সম্পাদকের বিশেষ উক্তি।

এ দেশীয় শস্যাদির আবাদ বিষয়ক পত্র ও কৃষি বিষয়ক প্রচলিত প্রবাদ সকল যিনি আমাদিগের নিকট প্রেরণ করিবেন, আমরা তাহা সাদরে গ্রহণ ও কৃষিতত্ত্বে প্রকাশ করিব। কৃষি কি উদ্যান কার্য্য সম্বন্ধীয় কোন প্রশ্ন আমাদিগের নিকট পাঠাইলে, আমরা সাধ্যানুসারে কৃষিতত্ত্বে তাহা উত্তর দিবার চেষ্টা করিব।

কৃষিতত্ত্বে প্রকাশিত প্রবন্ধ সকল সম্পাদকের বিনানুমতিতে কেহ পুস্তক বা পত্রিকাকারে প্রকাশ [illegible] রবেন না।

মূল্যের নিয়ম।

		ডাক মাসুল।	মোট।
অগ্রিম বার্ষিক, ...	৲	।৵০	৩।৵০
পশ্চাদ্দেয়, ...	৺॥০	।৵০	৩৸৵০

ডাকের টিকিট পাঠাইলে কি টাকায় এক আনা হিসাবে কমিশ্যন স্বতন্ত্র দিতে হইবে।

এই পত্রিকা প্রতি বাঙ্গালা মাসের মধ্যে বাহির হইবে।

কৃষিতত্ত্বে চাঁদা অগ্রিম দেয়। গ্রাহকগণ মূল্য না পাঠাইলে এক খণ্ডের অধিক পাঠান যাইবে না। এই পত্রিকাতেই গ্রাহকগণের প্রদত্ত মূল্যের প্রাপ্তি স্বীকার করা যাইবেক।

বিজ্ঞাপন।

হরেক রকমের ফল ফুলের ও ২০০ রকম গোলাপের কলম, সুগন্ধি পাতার গাছ, বাটী সাজাইবার টবের গাছ নর্শরিতে পাওয়া যায়, গাছের মূল্যের তালিকা, এবং গাছ ও বীজের জন্য কৃষিতত্ত্ব সম্পাদকের নিকট লিখিতে হইবে।

কৃষি কার্য্যের উপকারিতা।

বহুকাল হইতে বিদেশীয় রাজগণের শাসনাধীনে থাকিয়া, আমাদের মনোঃবৃত্তি এরূপ নিস্তেজ ও অকর্ম্মণ্য হইয়াছে যে, কোন প্রকার স্বাধীন-বৃত্তি দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিতে কোন মতেই প্রবৃত্তি হয় না। একারণ আমরা চাকরীর জন্য এত লালায়িত। আমরা পরিবার প্রতিপালন জন্য অন্য কোন স্বাধীন-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে লজ্জা ও অপমান বোধ করিয়া থাকি। আমরা মনে করি চাকরী দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিলেই সকলের নিকট মান্য গণ্য ও যশস্বী হইব। এক্ষণে চাকরী উপজীবীর সংখ্যা এত অধিক হইয়াছে যে, একটী অল্প বেতনের চাকরী পাওয়াও দুষ্কর। কোন স্থানে একটী ১০কি ১৫ টাকা বেতনের চাকরী খালি হইলে কত আবেদন পত্র উপস্থিত হয়, কিন্তু তাহার মধ্য হইতে এক ব্যক্তি মাত্র সেই কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া থাকে। অনেক ব্যক্তিকেই চাকরী অভাবে বিস্তর ক্লেশ সহ্য করিতে হয়; তথাচ তাঁহা-দের কৃষি, বাণিজ্য দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিতে প্রবৃত্তি হয় না। ইহা যে দেশীয় গণের একটী মহৎ দোষ, বোধহয়, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। আর ইহাও তাঁহাদের ভাবিয়া দেখা উচিত যে, ১০, ১৫৲ কি ২০৲ টাকা বেতনের চাকরীতে কি হইবে? চাকরিটি কিছু স্বগ্রামে পাওয়া যায় না, ভিন্ন স্থানে থাকিয়া চাকরী করিতে গেলে, আজ কাল আহারীয় দ্রব্য যে প্রকার দুর্মূল্য, তাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি ন্যূন্য কল্পে ৮। ১০ টাকার কম আর বাসা খরচ চলে না। বেতনের অধিকাংশ টাকা যদি বাসা খরচেই নিঃশেষিত হয়, তাহা হইলে পরিবার প্রতিপালনেরই বা উপায় কি হইবে; হয়তঃ আবার কাহারো কাহারো বাটীতে ৫। ৭ টী করিয়া পরিবার আছেন, তাঁহাদের ত আর দূরবস্থার পরিসীমা থাকে না। এরূপ অনেক চাকরী উপজীবী ব্যক্তির পরিবারগণকে আমরা অন্নের জন্য লালায়িত হইতে দেখিয়াছি। চাকরীর ত এই প্রকার শোচণীয় অবস্থা, তথাপি কেন লোকের চাকরী

রোগ ছাড়ে না? অন্য কোনপ্রকারেও কি অর্থোপার্জ্জনের উপায় নাই? এ কথার উত্তরে হয়তঃ অনেকেই বলিবেন,—বাণিজ্যের দ্বারা-ও অনায়াসে অর্থোপার্জ্জন করিয়া পরিবার প্রতিপালন করিতে পারা যায়। ইহা স্বীকার্য্য বটে, কিন্তু ইহা কিছু উচ্চ ধরণের ব্যক্তির প্রতিই খাটিতে পারে;—কারণ মূল ধন না হইলে ত আর বাণিজ্য হইতে পারে না। নিঃস্ব ব্যক্তি মূল ধন পায় কোথায়? তাঁহাদের পক্ষে কৃষি-কার্য্য দ্বারাই অর্থোপার্জ্জন করা প্রশস্ত উপায়। কৃষিকার্য্য প্রথমতঃ কিছু মূল ধনের আবশ্যক করে না—ইহাতে কেবল হল চালনে সক্ষম বলদের আবশ্যক করে মাত্র।

আজ কাল দেশের যে প্রকার শোচনীয় অবস্থা, তাহাতে কেবল কৃষকদিগের, হস্তেই কৃষিকার্য্যের ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা কোন মতেই শ্রেয়স্কর নহে। এক্ষণে আর ভারতের সে অবস্থা নাই, দুর্ভিক্ষ ভার-তের নিত্য-সহচরী হইয়া মুখ ব্যাদন করিয়া রহিয়াছে। পূর্ব্বে যে ভার-তের ধন ধান্যে লুব্ধ হইয়া বৈদেশিক রাজগণ বারংবার লুণ্ঠন করিয়া-ও যাহার কিছুমাত্র অনিষ্ট করিতে পারে নাই, আজ সেই ভারত-সন্তানগণ অন্নের জন্য লালায়িত! ইহা কি কম আক্ষেপ ও পরিতাপের বিষয়! অন্যান্য কারণ স্বত্বেও ইহা যে দেশীয়গণের কৃষি বাণিজ্য বিষয়ে অনাদর জন্য ঘটিয়া থাকে, বোধহয় তদ্বিষয়ে কাহারও মত দ্বৈধ হইবে না।

অনেকে বলেন, এক্ষণে ভূমির উর্ব্বরতা-শক্তি হ্রাস হওয়ায়, কৃষি-কার্য্যের দ্বারা আর তাদৃশ শস্য সমুৎপন্ন হয় না; এ কথার আমরা কখনই অনুমোদন করিতে পারি না, এ কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহারা নিতান্ত কৃষিকার্য্যে অনভিজ্ঞ। আমরা অনেক বিজ্ঞ কৃষকের মুখে শুনি-য়াছি "জমি কখন কুঁড়ে নয়, মানুষেই কুঁড়ে"। পূর্ব্বে প্রচুর পরিমাণে শস্য সমুৎপন্ন হইত, এক্ষণে হয় না, কেন হয় না? ইহা তাঁহাদের একবার ভাবিয়া দেখা উচিত। সেটী যে তাঁহাদের দোষেই হয় না, তাহার সন্দেহ নাই; কারণ জমিতে বর্ষে বর্ষে গাছ পালা উৎপন্ন হইলে, জমির উর্ব্বরতা-শক্তি নষ্ট হয় সত্য বটে, কিন্তু তাহাতে বর্ষে বর্ষে উৎকৃষ্ট সার প্রদান করিলে আবার তাহার উর্ব্বরতা-শক্তি

বৃদ্ধি হয়। পূর্ব্বে লোকের কৃষিকার্য্যে যেপ্রকার উৎসাহ ও যত্ন দৃষ্ট হইত, এইক্ষণ আর তাদৃশ উৎসাহ ও যত্ন পরিলক্ষিত হয় না। কোন্ বৃক্ষে কোন্ সার উপযোগী, ইহা কৃষকেরা না জানায়, ও প্রচুর পরিমাণে ক্ষেত্রে সার না দেওয়ায়, তাদৃশ ফল উৎপন্ন হয় না। সে পক্ষে কৃষকদিগের যত্ন থাকা অতীব আবশ্যক।

এতদ্ব্যতীত কৃষিকার্য্যের আরও কয়েকটী প্রতিবন্ধক দৃষ্ট হইয়া থাকে। আমাদের দেব-মাতৃক-দেশ, এক বৎসর যথাসময়ে বৃষ্টি না হইলে, অজন্মা নিবন্ধন দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়া, লক্ষ লক্ষ প্রাণী অনশনে অকালে প্রাণ ত্যাগ করে কোন বৎসর যদি নির্দ্দিষ্ট সময়ে বর্ষা আরম্ভ না হয়, তাহা হইলে কখনই প্রচুর পরিমাণে শস্য সমুৎপন্ন হয় না। বঙ্গবাসী মাত্রেই, প্রায় অন্নভোজী. বলা বাহুল্য যে, প্রচুর পরিমাণে জল না পাইলে, কখনই সুচারুরূপে শস্য জন্মে না: একারণ কোন বৎসর অনাবৃষ্টি হইলে যে, দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইবে, তাহা স্থির নিশ্চয়। দেশের মধ্যে যদি স্থানে স্থানে খাল খনন করা হয়, তাহা হইলে সে পক্ষে কৃষিকার্য্যের অনেকটা সুবিধা হইতে পারে। শুদ্ধ দেশীয় লোকের যত্নে, সে কার্য্য সমাধা হইতে পারে না। ইহাতে দয়ালু-গবর্ণমেণ্টেরও মনোযোগী হওয়া একান্ত আবশ্যক। গবর্ণমেণ্টের, দুর্ভিক্ষে যে অর্থ ব্যয় হয়, তাহা ও পবলিক ওয়ার্ক সেশ ট্যাক্স হইতে যে টাকা আদায় হয়, তাহা যদি স্থানে স্থানে খাল খনন-কার্য্যে ব্যয়িত হয়, তাহা হইলে দেশের অনেক মঙ্গলের সম্ভাবনা। ইহাতে গবর্ণমেণ্টের কৃপাদৃষ্টি—এ-কান্ত প্রার্থণীয়।

উত্তম রূপে ভূমি কর্ষিত না হইলেও কখন সুচারু রূপে শস্য জন্মে না। আমাদের দেশের লাঙ্গলের অবস্থা অত্যন্ত অপকৃষ্ট। এক্ষণে তাদৃশ বলবান বলদের অভাবই তাহার প্রধান কারণ। এখনকার হীন-বীর্য্য বলদের দ্বারা ভূমি কর্ষিত হওয়া কখনও সম্ভবপর নহে। (আধুনিক গবাদির হীনবীর্য্যের কারণ বারান্তরে বিস্তৃতরূপে লিখিবার বাসনা রহিল।) কৃষকেরা ভূমি কর্ষণ প্রণালী বিশিষ্ট রূপে অবগত নহে। ভূমি রীতিমত কর্ষন করিতে, মৃত্তিকা শিথিল হইয়া পড়ে;

সুতরাং বৃক্ষের মূল অনায়াসে মৃত্তিকা, মধ্যে প্রবেশ করিতে সক্ষম হয়, এবং ভূমির রস, কাণ্ড শাখাদিতে সঞ্চারিত হইয়া, বৃক্ষের তেজ বৃদ্ধি করে। কিন্তু ভূমি সকল তাদৃশ কর্ষিতও হয় না, একারণ তাদৃশ ফলও জন্মে না। ইহা ব্যতীত কৃষকদিগের কিয়ৎপরিমাণে কৃষি-বিজ্ঞান জানাও বিশেষ আবশ্যক। কোন রূপ মৃত্তিকায় কোন্ রূপ শস্য, কোন্ রূপ মৃত্তিকায় কোন্ রূপ বৃক্ষ বিশেষ উপযোগী, তাহা অবগত না থাকাতেই কৃষকদিগের এরূপ অবস্থা। তজ্জন্যই পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, শুদ্ধ নিরক্ষর-কৃষকদিগের উপর কৃষিভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে। কৃষকেরা বরাবর যে প্রণালীতে আবাদ করিয়া আসিতেছে, আজও তাহারা সেই প্রণালীতে আবাদ করিতেছে, শুদ্ধ তাহা করিয়া, ঈশ্বরের কৃপার উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবেনা। এক্ষণে নূতন নূতন আবাদ প্রণালী শিক্ষা করা, ক্ষেত্রে লাভকর শস্য বপন করা, কৃষি-বিদ্যা অধ্যয়ন করা বিশেষ আবশ্যক। ইহাতে কৃতবিদ্যগণের যোগদানও একান্ত প্রার্থনীয়।

কৃষকেরা যে সকল ভূমিতে চাষ করিয়া থাকে, তাহার অধিকাংশ ভূমিই প্রায় কোন স্থায়ী করারে বন্দোবস্ত না থাকায়, কৃষকেরা সার দিয়া ভূমির উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য তাদৃশ যত্নবান হয় না। তাহারা জানে সারাদি দিয়া ভূমির উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধিত করিলে, জমিদারেরা হয় জমির রাজস্ব বর্দ্ধিত করিবে, না হয় জমি ছাড়াইয়া লইয়া অন্য কাহাকে বিলি করিবে। ইহা যে ভূমির উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধির একটী মহান্ প্রতিবন্ধক তাহার সন্দেহ নাই। এই ভয়েই তাহারা ভূমির উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধির দিকে বড় একখানা অগ্রসর হয় না। কৃষকদিগকে স্থায়ী করারে পাট্টা দিয়া জমি বিলি না করিলে, কৃষিকার্য্যের উন্নতি কখন সম্ভবপর নহে। জমির উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করিতে হইলে কৃষকদিগকে স্থায়ী করারে জমি দেওয়া বিশেষ আবশ্যক; নতুবা কৃষিকার্য্যের উন্নতি নিতান্ত সুদূরপরাহত।

আমাদের এতদঞ্চল কৃষি প্রধান স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। এখানে চাকরী উপজীবী ও ব্যবসায়ীর সংখ্যা অপেক্ষা কৃষিজীবীর সংখ্যা অনেক

অধিক। এখনকার চাকরী উপজীবী কায়স্থ ব্রাহ্মণেরা ও কৃষাণ রাখিয়া চাষ করিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহাদের বিশেষরূপ তত্ত্বাবধান না থাকায়, লাভবান হইতে পারেন না। এখানকার প্রায় সকল কায়স্থ ব্রাহ্মণেরই সকর বা নিষ্কর কিছু কিছু শস্য ক্ষেত্র আছে। তাঁহাদের মধ্যে যদিও কেহ কেহ চাষ না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনাপন জমি কৃষক দিগকে ভাগজোতে বিলি করিয়া, শস্যাদির অর্দ্ধেক ভাগ গ্রহণ করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে এখানে চাষের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব ছিল, তখন চাকরীর সংখ্যা প্রায়ই ছিল না। কি ভদ্র, কি অভদ্র, সকলেই কৃষিকার্য্যের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। তখনকার ভদ্রলোকেরা চাষ করিয়া, যে প্রকার বিষয়াদি ও ক্রিয়া কাণ্ড করিয়া গিয়াছেন, এখনকার ১৫০ কি ২০০ টাকা বেতনের চাকুরেতও তাহা পারেন কিনা সন্দেহ। তাঁহারা দোল, দুর্গোৎসব, পুষ্করিণী খনন, দেবালয় নির্ম্মাণ, মাতৃ পিতৃ শ্রার্দ্ধ, ব্রাহ্মোণকে ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি প্রদান প্রভৃতি সৎকার্য্যের দ্বারা যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। আধুনিক কয়জন চাকরী উপজীবী ব্যক্তি আপন পারিবারিক ব্যয় সঙ্কুলন করিয়া, ঐ প্রকার সৎকার্য্যে ব্যয় করিতে সক্ষম হন? একথার উত্তরে হয়তঃ অনেকে বলিলেন, তৎকালে ঐ সকল সৎকার্য্য অল্পব্যয়ে, অল্পায়াসে সুসম্পন্ন হইত, অধুনা তদপেক্ষা পাঁচ কি ছয় গুণ অধিক ব্যয় না করিলে আর ঐ সকল কার্য্য সুসম্পন্ন হয় না, একারণ সকলে করিয়া উঠিতে পারেন না, সত্য বটে, কিন্তু এখন যে শস্য বিক্রয় করিয়া একটী টাকা পাওয়া যায়, তখন তাহার ষোল গুণেরও অধিক শস্য বিক্রয় না করিলে, একটী টাকা পাওয়া যাইত না। তখন টাকায় ৭। ৮ মণ চাউল পাওয়া যাইত, এখন ২। ৩ টাকার কম আর একমণ চাউল পাওয়া যায় না। এতদঞ্চলে প্রায়ই ভাল ভাল গ্রামে কৃষিকার্য্যের সুবিধা জন্য গ্রামের উচ্চদিকে এক একটী বিল ছিল। ঐ বিলের দ্বারা ২। ৩ খানি গ্রামের জমির শস্য ঘোর অনাবৃষ্টিতেও প্রচুর পরিমাণে সমুৎপন্ন হইত। এক্ষণে চাকরির সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায়, লোকের কৃষিকার্য্যে আর ততদূর উৎসাহ ও যত্ন দৃষ্ট হয় না, একারণ পূর্ব্বোক্ত বিলের বাঁধগুলি মেরামত না হওয়ায় ভগ্ন হইয়া গিয়াছে।

এক্ষণে ঐ সকল বিলগুলিতে জল না থাকায় কোন বৎসর অনাবৃষ্টি উপস্থিত হইলে ঘোর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। পূর্ব্বে আমাদের এখানকার লোক দুর্ভিক্ষ কাহাকে কহে, জানিত না। সন ১১৭৬ সালের যে দুর্ভিক্ষ-রাক্ষসীর করাল-কবলে এক তৃতীয়াংশ ভারত-সন্তান কবলিত হইয়াছিল, সেই দুর্ভিক্ষ রাক্ষসী এ প্রদেশের কিছুই করিতে সক্ষম হয় নাই। পূর্ব্বের ন্যায় যদি আমাদের এখানকার বিলের বাঁদগুলি মেরামত হয়, তাহা হইলে এ প্রদেশ বাসীগণকে এত কষ্ট সহ্য ও দুর্ভিক্ষের উৎ-পীড়ন সহ্য করিতে হয় না।

আমাদের গ্রামের পশ্চিমাংশে এক মাইল বিস্তৃত "আহার" নামক এক প্রকাণ্ড বিল আছে। ঐ বিলের নামানুসারেই আমাদের গ্রামের নাম "আহার বেলমা" হইয়াছে। ঐ বিলের পূর্ব্বাংশে বরাবর একটী উচ্চ বাঁদ আছে, এক্ষণে ঐ বাঁদটীর জীর্ণ সংস্করণ না হওয়ায়, স্থানে স্থানে ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। বাঁদের পশ্চিমদিকের মাঠের জল পূর্ব্বে ঐ বাঁদে আটক হইয়া থাকিত, এক্ষণে বাঁদের ভগ্ন স্থান দিয়া ঐ জল নির্গত হইয়া যায়। পূর্ব্বে ঐ আহারের জলে ৩। ৪ খানি গ্রামের শস্য ঘোর অনাবৃষ্টিতেও উৎপন্ন হইত। পূর্ব্বে এই আহারের দ্বারা কত উপকার সাধিত হইয়াছে। ইহার আধুনিক অবস্থা দর্শন করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়।

ক্রমশঃ।

১৬ই আষাঢ় ১২৮৭।
আহার বেলমা।

শ্রীরাজনারায়ণ বিশ্বাস।
ডিং রায়না বর্দ্ধমান।

পাবনা অঞ্চলের ধান্য।

অতি আদিম কাল হইতেই যে, ভারতবর্ষ পর্য্যাপ্ত-শস্য-শালিনী বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ, তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। তন্মধ্যে আবার বঙ্গদেশ সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত। বঙ্গদেশে যত প্রকার শস্যাদির বহু-আবাদ হইয়া থাকে, এমন আর কুত্রাপি নয়নগোচর হয় না। বঙ্গের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিলে যে প্রকার নয়ন-তৃপ্তিকর অসংখ্য-শ্যামল-শস্য-পূর্ণ-ক্ষেত্রাদি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, এমত আর কোথাও পরিদৃষ্ট হয় না। বঙ্গের সর্ব্বত্রই অতি উর্ব্বরা মৃত্তিকাতে সংগঠিত। সে যাহাহউক সমস্ত বঙ্গের শস্যশালীতার বিষয়, পর্য্যালোচনা করা, আমাদের অদ্যকার মনোগত অভিপ্রায় নহে। সহৃদয়-পাঠক-বর্গের অবগতির জন্য প্রস্তাবিত বিষয়ের অবতারণ করিতেছি।

বঙ্গদেশের উত্তরপশ্চিম-বিভাগে পাবনা জেলা অবস্থিত। এ অঞ্চ-লের ধান্যের চাষ অতি প্রসিদ্ধ। বহুবিধ ধান্যের আবাদই এ অঞ্চলের কৃষক-মণ্ডলীর প্রধানতম উপজীবিকা। যদিও বাকরগঞ্জ অঞ্চলের "বালাম-চাউল" ভারত-বিখ্যাত বলিয়া পরিঘোষিত হইয়া থাকুক, তথাপি এ অঞ্চলে যেমন বহু প্রকার ধান্যের আবাদ হইয়া থাকে, অন্য কোথাও এত প্রকার ধান্য সমুৎপন্ন হয় না। এখানে বৎসরের মধ্যে দুইবার ধান্যের "ফসল" হইয়া থাকে। চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ এই তিন মাসই ধান্য-বপনের প্রশস্ত সময়। সর্ব্বত্রই প্রধানতঃ দুই প্রকার ধান্যের বিষয় অবগত হওয়া যায়; আশু ধান্য ও আমোন ধান্য। ধান্য-বপন অথবা ধান্য-কর্ত্তণের কোন বিশেষ প্রকার ভেদ নাই। আশুধান্য শ্রাবণ ভাদ্র মাসেই পরিপক্ক হয় এবং তৎসময়েই কৃষকগণ তাহা কর্ত্তন করিয়া গৃহে আনয়ন করিয়া থাকে। আশু ধান্যের বহু প্রকার নাম। যথা———কট্‌কী, কালাবকুরী, কালামাণিক, কালামইল্‌কা, পেঁচে-মইল্‌কা, চোয়ালিয়া, করচামুডী, হুলামাদন, ক্ষুদাবরণ, নরই, বওলা, চাপড়ী, চেটেবোয়ালিয়া, আশউড়িজ্জল, ও খান্দী ইত্যাদি।

আমোন ধান্য কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ এই তিন মাসে পরিপক্ক হয়। কৃষকগণ তৎসময়ে তাহার কর্ত্তন-কার্য্য সমাধা করিয়া, কর্ত্তিত-ধান্য গৃহে আনয়ন করিয়া থাকে। আমোন ধান্যেরও বহু প্রকার ভেদ আছে। যথা——পূবে ভাওয়ালিয়া, ভাওয়ালিয়া, দূত-কলম, বাঁশীরাজ, ঝিঙ্গাসাইল, কাইখে, হিদে, দিঘে, মাণিকদিঘে, সোনাদিঘে, ফুলবেতো, বেতো, ভূরেলটা, বনছেওচ, মুক্তাহার, কালকলসী, বয়রা, রাজামণ্ডল, মালভোগ, পুটেরাজবল, পিত্তিরাজ, কানাইবাঁশী চিত্রা, দলকচু, ওকরঝুলও বকাঝুল ইত্যাদি।

আর এক প্রকার ধান্য আছে, তাহা বঙ্গদেশের প্রায় সর্ব্বত্রই সর্ব্বাংশু জন্মিয়া থাকে। তাহাকে "বোরো ধান্য" কহে। ইহার অপর নাম "ষাটে ধান।" অতি অল্প সময়েই—ইহার চাষ, বপন ও আবাদ হইয়া থাকে।

"বোরো ধানের চাষ,
লাগে দুই মাস।"

এ ধান্য বপনের এমন কোন বিশেষ নির্দ্দিষ্ট সময় নাই। ভূমির উচ্চতা ও নিম্নতানুসারে ধান্য বপন বা রোপণ হইয়া থাকে।

শ্রীতারিণীচরণ সেন।
তাঁতিবন্দ, পাবনা।

প্রেরিত।

এ বৎসর বর্ষা কিছু আগুড়ি দেখা যাইতেছে। বাগান পরিষ্কার রাখা কঠিন। বন জঙ্গল ঘাস থামিয়া রাখা ভার। যাহাদের গাভী আছে তাহাদের বড় সুবিধা, নূতন ঘাস অতিশয় পুষ্টিকর অথচ অনভ্যাস জন্য বাঁধা গরুর কিঞ্চিৎ পেটের পীড়ার সম্ভাবনা। গুল ও জোড় কলম বাঁধিবার প্রশস্ত সময়। ঝারা বাঁধিয়া এখন জল দিবার আবশ্যক নাই। একেবারে ফলবন্ত করার উদ্দেশ্যে পশ্চিম অঞ্চলে ৩। ৪ সনের চারার জোড় কলম বাঁধে এবং বোধ হয় গুড়ি বড় করিবার অভিপ্রায়ে আটী গাছের আগায় বাঁধিয়া থাকে। গাছ প্রায়ই বিশ্রী এবং বাতাসে যখম হয়। দেশীয় মালিরা এ জন্য গত বৎসরের চারা ব্যবহার করে কিন্তু ইহাতেও অনেকের ডাল মিলন হয় না। উত্তর পাড়ার সর্গীয় বাবু রাজকৃষ্ট মুখোপাধ্যায় প্রতি বৎসর পাঁচ সহস্র আমের কলম বিতরণ করিতেন—শুনা যায় যে প্রায় অর্দ্ধেক মারা পড়িত। আমার জনৈক আত্মীয় এই সনের চারা লইয়া ছোট দধীর ছোবায় বসাইয়া আশ্বিন কার্ত্তিকে কলম বাঁধিয়া অগ্রহায়ণে নামাইতেন। ইহার গুড়ি বিলক্ষণ আটীর গাছের ন্যায় লম্বা হয় ও তিনসনে ফলিতেছে। সম্প্রতি প্রয়াগে যে পদ্ধতিতে একজন সাহেব কলম করিতেছেন, তাহা অতি সহজ এবং উহাতে শ্রম বা ব্যয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

আটী সমেত চারা (২০। ২৫ দিনের এবং ১২। ১৬ অঙ্গুলি উচ্চ) তুলিয়া গোড়ায় অল্প মেটেল মাটী দিয়া বিলক্ষণ করিয়া শুষ্ক ঘাস বা বিচালি দিয়া জড়াইয়া ভাল বৃক্ষের এই সনে ডাল সহ জোড় লাগাইয়া উত্তমরূপে সারাল মাটী দিয়া বন্ধন ঢাকিয়া দিবে যেন তাহার মধ্যে বাতাস প্রবেশ করিতে না পারে। গাছের ডাল যে মুখ থাকে চারাও যেন সেই রূপ থাকে। ভারা টব ভাড় কিছুরই দরকার নাই। না পড়ে এজন্য হদ্দ দড়ি দিয়া চারাটা অন্য এক ডালের সঙ্গে বাঁধা যাইতে

পারে। বৃষ্টি না হইলে মধ্যে মধ্যে আটীর চারার গোড়ায় জল দিবে ২। ৩ সপ্তাহে কলম তৈয়ার হয় এবং নামাইয়া ছাপর বিধি। এককালে অনেক কলম প্রস্তুত করিলে এক ২ টার নিমিত্ত বোধ হয় গড়ে এক পয়সা খরচ পড়ে। এরূপ হইলে ফজলি, আলফানসের কলম /০ আনা করিয়া বিক্রয় হইতে পারে এবং কাঙ্গাল দুঃখীরাও কিনিয়া ভদ্রাসনে পুতিয়া এই দেব-দুর্ল্লভফল উদর পূরিয়া ভক্ষণ করিতে সক্ষম হইবেক—

উদ্ভিদ্ বিদ্যা বড়ই উপায়ের বিষয় এবং ইচ্ছা থাকিলেই বিনা অধিক ব্যয় বা কষ্টে সহজে শিখা যাইতে পারে। আমরা সময়ে সময়ে বৃক্ষাদির বিশেষ বিশেষ আশ্চর্য্য গুণ এই পত্রিকায় প্রকাশ করিব।

দিক্ নির্ণয় বৃক্ষ।

আমেরিকায় (Silphium lacinatum) এক প্রকার বৃক্ষ আছে, তাহার পাতা সাদা উত্তর দক্ষিণ মুখো থাকে রাত্রে বা মেঘাচ্ছন্ন দিবসে দিক হারা হইলে, তথাকার লোকেরা উহার পত্র দৃষ্টে ভ্রম সংশোধন করে। ইহা দ্বারা দিগ্ নির্ণয় যন্ত্রের কার্য্য সাধিত হয়।

ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রদেশে ও লঙ্কায় গোলাপের বিলক্ষণ চাষ ও উৎকর্ষতা দেখা যায়, শেষোক্ত দ্বীপে একটী বৃহৎ গোলাপগাছ আছে উর্দ্ধে ১০ হাত এবং উহার পরিধি বা বেড় ৫০ হাতের অধিক এবং এককালে অন্যূন ২ সহস্র পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া পল্লি সুশোভিত ও আমোদিত করিয়া থাকে।

উদ্ধৃত।

রঙ্গপুর জিলায় তামাক চাস ও প্রস্তুত করণের বিবরণ কোন সাহেবের লিখিত।

মৃত্তিকা এবং সার।—উক্ত জিলায় বিশেষতঃ তত্রত্য নগরের নিকটবর্ত্তি স্থানে এবং ঠিক উত্তর পশ্চিম এবং পুর্ব্বভাগস্থ অঞ্চলে যে সকল উচ্চ বালুকাময় প্রান্তর আছে তাহাতে এই প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাহুল্যরূপ চাস হইয়া থাকে। দক্ষিণ ভাগে অত্যল্প পরিমাণে জন্মে এবং তাহা স্থানীয় লোকেরদের ব্যবহারেই শেষ হয়। তামাক চাসের নিমিত্তে উর্ব্বরা বালিয়া মাটী অতিশয় উপযোগী যেহেতু যে পর্য্যন্ত চারা পুর্ণাবস্থা প্রাপ্ত না হয় সে পর্য্যন্ত উক্ত মৃত্তিকা তাহাকে স্নিগ্ধ ও আর্দ্র রাখে পরন্তু গাছ প্রস্তুত ও পাতা সকল পক্ক হইলে তাহা নীরস হইয়া যায়। এই চাসের জন্য ভূমিতে উত্তমরূপে সার মিশ্রিত করা কর্ত্তব্য। সচরাচর গোময় এবং নীল খাগড়ার সার দেওয়া যায় কিন্তু শেষোক্ত পদার্থের বিশেষ আদর আছে কারণ তদ্দ্বারা বহুতর বিস্তীর্ণ বালুকাময় মরুভূমি কৃষিকার্য্যের যোগ্য হইয়াছে। তাহা এইরূপে ব্যবহার হয়, যথা—প্রথমতঃ লাঙ্গল দ্বারা ক্ষেত্র সকল কর্ষিত করিয়া হৌজ হইতে নিক্ষিপ্ত আর্দ্রীভূত নীল খাগড়া সকল লইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তূপাকারে মৃত্তিকার তেজঃ বিবেচনা করিয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অন্তরে রাখিতে হইবেক। পরে ঐ সকল স্তূপের উপরে এক এক চাপড়া মৃত্তিকা দিবেক। অনন্তর কিঞ্চিৎ কালান্তে তাহা পচিয়া উঠিলে হল চালনা করিলে চারা রোপণার্থ মৃত্তিকা প্রস্তুত হইবেক।

চারা উৎপাদনের প্রকরণ।—সচরাচর আগষ্ট মাসের শেষে অথবা সেপ্টেম্বরের প্রথমে বীজ বপন হয়। বীজের কেয়ারী সকল উত্তম মৃত্তিকায় উচ্চ করিয়া সুন্দররূপে নির্ম্মিত করিবে যে তাহাতে কাঠী বা কোন কঠিন দ্রব্য না থাকিতে পায় অপর অতি গভীর স্থানে বীজ বুনিতে

হইবেক। যদি ভারী বৃষ্টি হয়, তবে তাহার ক্ষতিকর উৎপাত হইতে চারা সকলকে রক্ষা করণার্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তৃণাচ্ছাদিত চালা অগ্রে প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হইবেক। কেহ কেহ এরূপ করে যে পর্য্যন্ত চারা সকল ভূমি হইতে উত্থিত না হয় তাবৎ পর্য্যন্ত পাতলা করিয়া পোআলীর ছাউনী দ্বারা আচ্ছাদন দেয়। বীজ বুননের ১৫ বা ২০ দিবস পরে চারা বহির্গত হয়। অপর কেয়ারীতে যখন চারা বৃদ্ধি হইবে তখন তৃণাদি নিড়াইয়া সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিতে এবং বৃষ্টির বিড়ম্বনা হইতেও রক্ষা করিতে হইবে।

চারা রোপণ এবং তদনন্তর যে রূপ বিধান করা আবশ্যক তদ্বিবরণ।—অক্টোবর মাসের প্রথম ক্ষেত্রে চারা লইয়া রোপণ করণের উপযুক্ত কাল। তখন চারাতে ৫টি কিম্বা ৬টি পাতা ধরে। এইরূপ রোপণের কার্য্য ডিসেম্বরের মধ্যভাগে সম্পূর্ণ হয়। তৎপরে যাহা রোপিত হয় তাহাতে উত্তম ফসল জন্মে না যেহেতু সে সময়ে মৃত্তিকা অতিশয় শুষ্ক হয় সুতরাং তাহাতে নবীন বৃক্ষের শিকড় প্রবিষ্ট না হওয়াতে তাহা বৃদ্ধি পায় না। এরূপ দেখা গিয়াছে যে নিম্ন জলাভূমিতে জানুয়ারি মাস পর্য্যন্ত রোয়া হইয়াছে; কিন্তু এ প্রকার ভূমিতে মধ্যম প্রকার তামাকুও জন্মে না। নীলকাঠী এবং গোবরের দ্বারা উক্তমত উত্তমরূপে সার দিয়া ক্ষেত্রে ভাল করিয়া লাঙ্গল দিতে হয়, এবং যে প্রকার শাকাদি জন্মাইবার নিমিত্ত উৎকৃষ্ট রূপে মৃত্তিকার পাটি হইয়া থাকে, তামাকুর ক্ষেত্রেও তদ্রূপ যত্ন করিতে হয়। ২।৩ ফীট অন্তরে চারার শ্রেণী সকল স্থাপন করিবেক এবং প্রতি শ্রেণীতে এক চারা হইতে অপর চারা উক্তরূপ অন্তরে রোপণ করিবেক। যদি মৃত্তিকা শুষ্ক হইয়া যায় তবে যে পর্য্যন্ত শিকড় না নামিবেক তাবৎ পর্য্যন্ত জল দিতে হইবে। রৌদ্র হইতেও চারাসকলকে রক্ষা করা পরামর্শ সিদ্ধ। এ নিমিত্ত কাঁচা কলা গাছের বাকৃড়া এক এক ফুট লম্বা করিয়া কাটিয়া দেয়, তদ্দ্বারা অতি পরিপাটিরূপে সূর্য্যাতপ হইতে কোমল চারা সকল রক্ষিত হইয়া থাকে। এ স্থলে ইহাও বক্তব্য, যে কপি চারা স্থানান্তর করিবার সময়েও উক্ত প্রকারে আচ্ছাদন দিয়া থাকে। পরে চারা সকল বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে

মৃত্তিকা উত্তমরূপে খুসিয়া ও বনগাছ নিড়াইয়া সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার রাখা কর্ত্তব্য, এই কার্য্য সহজে সাধনার্থ একখানা ক্ষুদ্র বিদাকাঠী উভয় শ্রেণীর মধ্য দিয়া উভয় দিগে অর্থাৎ উত্তর হইতে দক্ষিণ এবং পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে সঞ্চালিত হয়। তাহাতে উক্ত যন্ত্র মূল স্পর্শ না করিয়া কিঞ্চিৎ অন্তর দিয়া চলিয়া যায়। এই প্রকরণ পুনঃ পুনঃ করিতে হয়। বিদাকাষ্ঠ দ্বারা যে সকল আগাছা উৎপাটিত না হয় সে সকল পেষণ অথবা নিড়ানী দ্বারা নিরাকৃত হইয়া থাকে। যদি মৃত্তিকায় উপযুক্ত মত সার দেওয়া না হয় তবে খলী ও গোময় একত্র করিয়া তাহার গুঁড়া মূলের চতুষ্পার্শ্বে দিয়া মৃত্তিকায় মিশ্রিত করিয়া দিতে হয়। যে সময়ে চারার বড় বড় পাঁচ ছয় টা পাতা বাহির হয় সেই সময় তাহার বৃদ্ধি নিবারণ নিমিত্ত পুষ্প মঞ্জরী সকল ভাঙ্গিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য, তাহাতে নূতন নূতন ফেঁকড়ী ও পল্লব গজিয়া উঠিবে, সে সমুদায় নির্গত হইবা মাত্র যত্নপূর্ব্বক ভাঙ্গিযা দিতে হইবেক। এরূপ করণের ফল এই যে তদ্দ্বারা অতি দীর্ঘ ও উত্তম গুণশালী পত্র সকল পাওয়া যাইবেক, যেহেতু চারার সমুদায় রস পত্র নিকরেই উত্থিত হয়। উক্ত প্রকরণ সমাপ্ত হইলে চারার নীচে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাতা থাকে, তত্তাবৎ ভাঙ্গিয়া লইয়া কিয়দ্দিবস মৃত্তিকার উপর রাখিয়া শুখাইয়া ছোট ছোট আটী বাঁধিয়া ছাদের নিম্নে ঝুলাইয়া রাখা যায়। এই সকল পাতা দুঃখি লোকেরা হুঁকায় সাজিয়া খায়।

পাতা কাটুনী ও প্রস্তুত করণ। যখন পত্র সকল সুপক্ক অর্থাৎ হরিদ্বর্ণের পরিবর্ত্তে ঈষৎ পীতবর্ণ ও আশু ভঞ্জনীয় হয় এবং তাহার সমুদয়াংশ অসমান তথা কুঞ্চিত হয় তখনি কাটুনীর কর্ম্মারম্ভ হইয়া থাকে। কাটিবার সময় কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বৃক্ষের ছাল সুদ্ধ কাটিয়া লইতে হয়। পরে পত্র সকল কাটা হইলে ভূমির উপর এরূপ নিয়মে বিস্তৃত করিয়া শুখাইতে হইবেক যে তাহারদিগকে নোয়াইলে না ভাঙ্গে অর্থাৎ মড়্মড়িয়া না হয়। অনন্তর সে সকল লইয়া ছায়ায় রাখিবেক। পরন্তু প্রয়োজনানুসারে ২ কি ৪ টা করিয়া পাতা লইয়া আটি বান্ধিয়া বাখারির উপর ছালি গাঁথিয়া পুনশ্চ তত্তাবৎ স্বল্প তৃণাচ্ছাদিত চৌড়া চালের নীচে ঝুলাইয়া

রাখিতে হইবেক তথায় ঈষৎ পিঙ্গলবর্ণ হইলে সে সকল লইয়া এক গৃহের চালের নীচে উর্দ্ধ স্থান হইতে অধোভাগ পর্য্যন্ত একটার পর আর একটা, এইরূপ সারি করিয়া সাজাইতে হইবেক। সেখানে সে সকল উত্তম রূপে শুষ্ক হইলে নামাইয়া লইয়া নানাবিধ আকারে আটিবদ্ধ করে কিন্তু ঐ বিষয়ে এরূপ সতর্কতার আবশ্যক যেন মেঘাচ্ছন্ন দিনে এই কর্ম্ম সম্পন্ন হইতে পারে যেহেতু রৌদ্রের সময় পত্র সকল শুখাইলে ঠুনকা হইয়া উঠিবাতে নষ্ট হয়। এ দেশে পাতা ঘামাইবার ও গাঁজিবার প্রথা নাই কিন্তু এখানে যে সামান্য নিয়মে পাতা নির্দ্দোষ করা যায়, তৎপরিবর্ত্তে কিউবা দেশের প্রচলিত নিয়মাবলম্বন করিলে অত্যুৎকৃষ্ট তামাকু উৎপন্ন হইতে পারে। অপর আটি বাঁধিবার সময় নূতন বিচালীর লঘু আচ্ছাদন ব্যবহার করা যায়।

কৃষি এবং উৎপত্তির পরিমাণ প্রভৃতি। এবিষয়ের পরিমাণ নিশ্চয় রূপে স্থির করা যায় না অনুমান হয় প্রতি বৎসর লক্ষ মোন উৎপন্ন হয়। এতৎ পরিমাণে বিঘা করিয়া অবধারিত হইল! এই জিলায় আনুমানিক তিন লক্ষ বিঘায় তামাকু চাস হয়; তামাকুর সহিত নীল চাসের তুলনা করাতে দেখা গিয়াছে যে স্থলে নীলের চাস এক বিঘা সে স্থলে তামাকুর চাস তিন বিঘা ভূমিতে আছে সুতরাং ঐ জিলায় নীলের চাস এক লক্ষ বিঘায় হইয়া থাকে। সেঁরাজগঞ্জ, পাবনা, কালনা এবং বাঙ্গালা দেশের নিম্ন প্রদেশের যাবতীয় বন্দর ও গঞ্জের মহাজনদিগের হস্তেই রঙ্গপুরীয় তামাকুর ব্যবসা রহিয়াছে, তাহারা বর্ষাকালে বড বড় নৌকা করিয়া আসিয়া ভরপূর বোঝাই লইয়া উপরি উক্ত স্থান সকলে লইয়া যায়। মগেরাও নৌকা করিয়া আসিয়া বহুল পরিমাণে ক্রয় করে। উৎপত্তি এবং অন্যান্য কারণানুসারে ২ টাকা হইতে ৩ টাকা পর্য্যন্ত বাজার দরে প্রত্যেক মোনের মূল্যের ন্যূনাতিরেক হয়। যদবধি ঐ জিলায় নীলের ব্যবসা চলিয়াছে তদবধি নীল খাগডর উর্ব্বরাকরত্ব গুণ বিধায় প্রচুর পরিমাণে সার পাওয়াতে তামাকুর চাস বৃদ্ধি হইয়াছে। প্রজারা এই দ্রব্যের কৃষির নিমিত্ত দিবা রাত্রি পরিশ্রম করে। তাহাতেই তাহারা ভূম্যধিকারি এবং মহাজনদিগের গুরুতর দাবী দিতে সক্ষম হয়। কোন

সময়ে তামাকু এদেশে চলিত হইয়াছে তাহা নিশ্চয় বলা যায় না কিন্তু বাঙ্গালা তামাকু শব্দের সহিত পর্ত্তুগীস তাবাকো শব্দের ঐক্য বিধায় বোধ হয় পর্ত্তুগীস জাতিরাই আনিয়া থাকিবেক। পাতা পাকিবার সময় যদি ঐ জিলায় ভারি শিলা বৃষ্টি হয় তাহা হইলে তামাকুর পত্র আশু ভঙ্গনীয় বিধায় অত্যন্ত ক্ষতি হইয়া থাকে তাহাতে অনেক প্রজার সর্ব্বনাশ হইয়া যায়।

হাতিচোক চাস করিবার বিষয়।

অক্টোবর মাসে উর্ব্বরা ভূমিতে হাতিচোকের বীজ বপন করিতে হইবেক। পরে গাছ এক ফুট উচ্চ হইলে ১৫। ১৬ দিবস অন্তর তিন চারি বার নাড়িয়া রোপণ করণান্তর যে স্থানে গাছ ফলবান হইতে পারে তথায় পুতিতে হইবেক। যখন চারা প্রথমবার মৃত্তিকাতে রোপণ করা হইবেক তখন তাহার মুল পুরাতন সার দ্বারা উত্তমরূপে আচ্ছাদিত করিয়া তাহার উপরে মৃত্তিকা প্রক্ষেপ দ্বারা রক্ষের চতুর্দ্দিকে কতকদূর পর্য্যন্ত মৃত্তিকাস্তুপ এক ফুট উচ্চ করিয়া দিতে হইবেক অর্থাৎ রক্ষের উচ্চতানুসারে ঐ ঢিবি প্রস্তুত করিতে হইবেক। উক্ত স্তূপের চতুর্দ্দিকে জল থাকিবার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জল প্রণালী কাটিয়া দিতে হইবেক এবং তাহাতে প্রতি দিবস প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে প্রচুর জল সেচন করিতে হইবেক।

উক্ত মত কার্য্য করিলে মার্চ্চ মাসের মধ্যভাগ হইতে মে মাসের আরম্ভ পর্য্যন্ত চারি পাঁচ দিবসানন্তর বারো বা ষোলটি করিয়া হাতিচোকের ফল প্রাপ্ত হইবেক।

আঙ্গুর গাছ রোপণের বিষয়।

কলিকাতাস্ত এগ্রিকলচুরেল সুসাইটির মিসেলেনি হইতে উদ্ধৃত করিয়া কতকগুলি মহোপকারী কৃষি সম্পর্কীয় বিষয় আমরা প্রকাশ করিতে মানস করিলাম, ঐ সকল বিষয় দেশস্থ সাধারণদিগকে জানাইবার জন্য তাহা সুসাইটি হইতে প্রকাশিত হইয়াছে; পাঠকগণ তাহা পাঠ করিয়া বিষেয় সন্তুষ্ট ও উপকৃত হইবেন তাহার আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। এবারে আঙ্গুরের বিষয় প্রকাশ করিলাম। এই সুস্বাদু ফলের বিবরণ কোন সাহেবের লিখিত।

ইং ১৮২৯ শালে দানাপুরে একখানি ক্ষুদ্র তালুক অধিকার করিলে তাহার মধ্যে একটী আঙ্গুরের ক্ষেত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলাম; ঐ ক্ষেত উত্তর দক্ষিণে লম্বা এবং পূর্ব্ব পশ্চিমে খোলা, আর দীর্ঘ ১০০ ফিট, প্রস্থে ১৫ ফিট, ও উচ্চে ৭ ফিট ছিল। তাহার পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে আট আট টা করিয়া গাছ ছিল কিন্তু ঐ সকল গাছ অধিক বড় ছিল না। উক্ত বৎসরে ঐ ক্ষেত্রে আঙ্গুর ফল উৎপন্ন হইয়াছিল কি না নিশ্চয় বলিতে পারি না কিন্তু যদি ফল হইয়া থাকে তবে অত্যল্প ফলিয়া থাকিবেক কেননা সে সময় ঐ সকল গাছের বয়ঃক্রম দুই বৎসরের অধিক হয় নাই। উক্ত বৎসরের নবেম্বর মাসে ঐ সকল গাছ জাফরি হইতে নামাইলাম পরে ডগা ছাঁটিয়া ও পাতা কাটিয়া দিয়া কতকগুলা জাফরির উপরে কতকগুলা শাশে বিস্তীর্ণ করিয়া দিলাম। তাহার পর গাছের গোড়া খুঁড়িয়া শিকড় সকল বাহির করিয়া দিলাম। এরূপ করিবার তাৎপর্য্য এই যে ঐ সময় শীত ঋতু না হইলেও ঐ সকল গাছে শীত ঋতুর কার্য্য হইবে অর্থাৎ রাত্রিতে শিশির লাগিয়া গোড়া সকল শীতল থাকিবে তাহাতে গাছের রস ক্রমে শিকড়ের নীচে পতিত হইয়া সে সময় গাছের বৃদ্ধি স্থগিত রাখিবে এবং তৎকালে এই প্রকারে বৃদ্ধি স্থগিত থাকিলে পরে বসন্তকালে ঐ সকল গাছ আপাদমস্তক বলবান হইয়া উঠিবে।

ক্রমশঃ

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

গ্রাহকগণের মধ্যে যাঁহারা কৃষিতত্ত্বের গত সনের মূল্য গত পৌষ ন্ত প্রেরণ করেন নাই, আমরা আর তাঁহাদিগকে পত্রিকা পাঠাইতে ত হইলাম। অগ্রিম মূল্য না দিয়া যাঁহারা পত্রিকার গ্রাহক হইবেন াদের দুই সংখ্যার অধিক পাঠান যাইবে না। যাঁহারা দ্বিতীয় খণ্ডের এ পর্য্যন্ত পাঠান নাই, তাঁহারা অবিলম্বে তাহা প্রেরণ করিয়া বাধিত বেন। আমরা সকলকে গত মাঘ ও ফাল্গুনের সংখ্যা দিয়াছি। কৃষি-ত ্রর সামান্য চাঁদা আমরা বারে২ লইতে প্রস্তুত নহি, সকলকে তাহা এক কালে পাঠাইয়া দিতে অনুরোধ করি। ভরসা করি, উপরিউক্ত নিয়মানু-সারে গ্রাহকগণ কার্য্য করিতে কোন মতে ত্রুটি করিবেন না। পত্রিকার মূল্য টীকিট না পাঠাইয়া কলিকাতা পোষ্টাপিসে মনি অর্ডার করিয়া ামার নামে পাঠাইয়া দিবেন।

শ্রীনৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায়।

পাইকপাড়া নর্শরি, কলিকাতা।

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু	তেজচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ভগলপুর	...	৫৲
" "	নিলকান্ত বসু পুরি	...	৩।৶৴
" "	উজাগির লাল নোয়াখালি	..	।০
" "	চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় পাটকেবাড়ি বহরমপুর	..	২৲
" "	তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ডেঃমেজিষ্ট্রেট্‌ বনগ্রাম		৪৲
" "	আশুতোষ গোহ পাতয়া চট্টগ্রাম	...	৫৲
" "	অভয়ানন্দ রায় চাঁদসড়ক কৃষ্ণনগর	...	১॥০
" "	শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় ভগলপুর	..	২৲
" "	ভূপেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী মদেপুরা	...	১॥৶৴
" "	বেহারিলাল পাইন কলিকাতা	...	৩।৶০
" "	বেহারিলাল রায় জমীদার বরিসাল	...	২৲
" "	ফটিকচন্দ্র বড়ুয়া কামরূপ গোহাটি	...	১॥০
" "	মধুসূদন মল্লিক অগ্রদ্বীপ পাটুলি	...	৩।৶০
" "	খজ্যেশ্বর বসু দেবগড়	...	১॥০
" "	ভবানিনাথ রায় পোতাজিয়া পাবনা	...	৫৲
" "	তেজনারায়ন ভগলপুর	...	৪৲
" "	মহেন্দ্রনাথ পণ্ডিত বর্দ্ধমান	...	১॥০
" "	যোগেশচন্দ্র রায় হুগলি কালেজ	...	২৲
" "	রমণীমোহন রায় চৌধুরী বাহাদুর তুঁষভাণ্ডার রংপুর		২৲
" "	অম্বিকাচরণ চট্টোপাধ্যায়	...	১॥০
" "	মহারাজা বাহাদুর ত্রিপুরা	...	১॥৶০
" "	ডাক্তার রামদাস সেন বহরমপুর	.	৩।৶০
" "	সুরেশচন্দ্র মুস্তোফি গোবরাপাড়া কুঁচবেহার		২৲
" "	কালিমোহন সেন দিনাজপুর	...	৩।৶০
" "	চণ্ডিচরণ মিত্র হলকার সিটি ইণ্ডোর	...	৫৲
" "	তিনকড়ি দত্ত কলিকাতা	...	৩॥০
" "	সেক ইসমাইল চৌধুরী	...	১॥০
" "	তিলকরাম চৌধুরী লক্ষ্মীপুর গোয়ালপাড়া	...	২৲
"	গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কলিকাতা	...	৩।৶০

৭ ম সংখ্যা।

কৃষিতত্ত্ব।

মাসিক পত্রিকা।

দ্বিতীয় খণ্ড।

শ্রাবণ ১২৮৭

পাইকপাড়া নর্শরি হইতে প্রকাশিত।

সূচী।

কলিকাতা।

১৬৭ নং, কর্ণোয়ালিস ষ্ট্রীট্,—কর প্রেসে

শ্রীঅধর নাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

নানা বিঘ্ন বশতঃ নিয়মিত রূপে আমরা কৃষিতত্ত্ব বাহির করিতে পারি নাই। এখন হইতে কৃষিতত্ত্ব নিয়মিতরূপে গ্রাহকগণের নিকট প্রেরিত হইবে। গত ভাদ্র হইতে অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত চারি মাসের কৃষিতত্ত্ব একসঙ্গে অতি সত্বরই বাহির হইবে। মাসে মাসে পৃথক পৃথক খণ্ডে বাহির হইতে আরও বিলম্ব হইতে পারে এজন্য গত চারি মাসের কৃষিতত্ত্ব একসঙ্গে মুদ্রিত করা হইল। পৌষ মাস হইতে প্রতি মাসে নিয়মিত রূপে গ্রাহকগণ কৃষিতত্ত্ব প্রাপ্ত হইবেন।

কৃষিতত্ত্বের জীবন যে গ্রাহক গণের চাঁদার উপর নির্ভর করিতেছে, তাহা বলা বাহুল্য। আমরা আশা করি যাঁহাদিগের নিকট মূল্য বাকী আছে, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্ব স্ব দেয় মূল্য সত্বর প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন।

কৃষিতত্ত্বের মূল্য টিকিট না পাঠাইয়া আমার নামে কলিকাতা পোষ্ট অফিসে মনি অর্ডার পাঠাইয়া দিবেন। টিকিট পাঠাইলে কি টাকায় এক আনা হিসাবে কমিসন স্বতন্ত্র দিতে হইবে।

গত কয়েক মাস নিয়মিত রূপে কৃষিতত্ত্ব বাহির না হওয়ায় কেহ এরূপ মনেও করিবেন না, যে কৃষিতত্ত্বের জীবন শেষ হইল। আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি পাইকপাড়া নর্শরির জীবন বর্ত্তমান থাকিতে কৃষিতত্ত্বের জীবনী শক্তি কখনই বিনষ্ট হইবে না।

শ্রীনৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায়
পাইক পাড়া নর্শরি
কলিকাতা।

কৃষিতত্ত্বের নিয়মাবলী।

	মূল্য।	ডাক মাশুল।	মোট।
অগ্রিম বার্ষিক, ...	৩৲	।৵০	৩।৵০
পশ্চাদ্দেয়, ...	৩॥০	।৵০	৩৸৵০

এই পত্রিকা প্রতি বাঙ্গালা মাসের মধ্যে বাহির হইবে।

কৃষিতত্ত্বে চাঁদা অগ্রিম দেয়। গ্রাহকগণ মূল্য না পাঠাইলে এক খণ্ডের অধিক পাঠান যাইবে না। এই পত্রিকাতেই গ্রাহকগণের প্রদত্ত মূল্যের প্রাপ্তি স্বীকার করা যাইবেক।

আঙ্গুরগাছ রোপণের বিষয়।

—০ঃ০—

(গত প্রকাশের পর)

আমি ঐ অভিপ্রায়ে সমুদায় ডিসেম্বর এবং জানুয়ারির কএক দিন পর্য্যন্ত ঐ সকল শিকড় খোলা রাখিলাম পরে মাছ গুড় এবং ভাঁটির কাল মাটি একত্র করিয়া সার প্রস্তুত করত ঐ সকল শিকড়ের চতুর্দ্দিকে দিলাম এবং তাহার উপর মাটি চাপা দিয়া কতক দিন তদবস্থায় রাখিলাম। ঐ সকল গাছে কখন্ ফুল ধরিয়াছিল আমি অনুপস্থিত থাকাতে জানিতে পারি নাই, কিন্তু ১৮৩০ সালের ফিব্রুয়ারি মাসের মধ্যে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলাম গাছসকল অতিশয় তেজাল এবং অতি স্থূলকণাক্রান্ত হইয়াছে। তাহার পরে মার্চ মাসের শেষে সারণ হইতে আসিয়া দেখিলাম সকল গাছে মূল অবধি অগ্র পর্য্যন্ত ফল ধরিয়াছে, এত অধিক থোলো আঙ্গুর হইয়াছিল যে ঐ জেলার সন্নিকটে কোন আঙ্গুর গাছে তদ্রূপ অধিক হইতে কেহ কখন দেখে নাই। ঐ সকল গাছ অধিক ঘন হওয়াতে ডাল পালা কাটিয়া পাতলা করিয়া দিলাম, কিন্তু ফলের থোলো একটাও কাটিলাম না, ঐ কাটা ডাল পালায় তিনটা ঝুড়ি পরিপূর্ণ হইয়াছিল। মালী কহিল যৎকালে ঐ সকল গাছে ফল ধরে তখন সে উত্তমরূপে জল দিয়াছিল, দুই দিন অন্তর অধিক জল দিয়া প্লাবিত করিত। মে মাসের শেষে পুনর্ব্বার ঐ সকল গাছ দেখিলাম, তখন ফল সকল পাকিবার উন্মুখ হইয়াছিল সে সময় আঙ্গুরক্ষেত্রের পরম শোভা হইয়াছিল। মালির হিসাব মতে তাহাতে তিন হাজারের অধিক থোলো ফল জন্মিয়াছিল ফলতঃ ঐ গাছের জাফরি ফলের ভারে নত হইয়া পড়িয়াছিল। ঐ সকল আঙ্গুর সাদা অথবা সামান্য জাতীয় ছিল। আমার ইচ্ছা হইল এই চাসে যে ফল দর্শিল এতদ্বিষয়ের বিবরণ এগ্রিকলচুরেল সোসাইটীর সুগোচর করি, কিন্তু ডাক্তার চার্লস হণ্টর

সাহেব অধিক ফল দেখিয়া আশ্চর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক আমাকে নিবারণ করত বলিলেন এই সকল গাছের প্রতি সমধিক বল প্রকাশ দ্বারা এ বৎসর এত ফল হইয়াছে আগামীতে এতাদৃক্ অধিক ফল হওয়া সুকঠিন। তদনন্তর প্রতিজ্ঞা করিলাম ক্রমিক তিন বৎসর পরীক্ষা করিয়া দেখিব অতএব ১৮৩১ সালের নবেম্বর মাসে তৎপূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় চাস আরম্ভ করিলাম। প্রথমতঃ গাছের শিকড় খুলিয়া দিয়া ধোয়াইয়া দিলাম তৎপরে কসাইখানা হইতে রক্তের সার আনিয়া এবং মরা জন্তু বিশেষতঃ কুকুর মেষ ইত্যাদির মৃতদেহ যাহা পাইলাম সার করিয়া ঐ সকল গাছের গোড়ায় দিলাম, পরে পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় ঐ সকল শিকড়ে বাতাস লাগিবার নিমিত্ত সেসকল খোলা রাখিলাম এবং পুর্ব্ব বৎসরের ন্যায় নিয়মিত সময় পর্য্যন্ত তদবস্থই রহিল। কিন্তু তখন আঙ্গুর জন্মিবার সময় ছিল না এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফলে এক প্রকার রোগ ধরিল তাহাতে প্রায় অর্দ্ধেক ফল নষ্ট হইয়া গেল, তথাপি নিকটবর্ত্তি আঙ্গুর ক্ষেত্রের ফলের সহিত তুলনা করিলে আমার ক্ষেত্রে অধিক ফসল হইল অর্থাৎ ১৭০০ শত থোলোর অধিক ফল জন্মিয়াছিল এবং সকল ফল সুগঠন ও সুস্বাদ হইয়াছিল। উক্ত বৎসরে আমি আঙ্গুরের ক্ষেত্র বৃদ্ধি করিলাম এবং কানস্টানসীয়া দেশের আটটী আঙ্গুরের গাছ এক এক দিকে চারি চারিটী করিয়া দুই দিকে পুতিয়া দিলাম। ঐ কএকটী গাছ শারন হইনে আনাইয়াছিলাম তখন ঐ সকলের বয়ঃক্রম বারো মাস এবং সে সকল কাটী কলম হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। নবেম্বর মাসে ঐ সকল গাছ জাফরি হইতে নামাইলাম এবং ডগা ও পাতা ছাঁটিয়া দিয়া পুনর্ব্বার জাফরিতে বিস্তীর্ণ করিয়া দিলাম, আর যতদূর পর্য্যন্ত খুলিয়া দিলে গাছের পক্ষে কোন হানি না হয় ততদূর গোড়া খুলিয়া দিলাম, পরে শিকড় ধুইয়া দিয়া অধিক মাছের সার দিলাম ও তাহার দুর্গন্ধ নিবারণ নিমিত্ত উপরে মাটি চাপা দিলাম। যদিও অধিক শীত এবং বায়ু অত্যন্ত শীতল হইয়াছিল তথাচ গাছের গোড়া অধিক খুঁড়িয়া দিতে পারা গেল না ফলতঃ এত অধিক শীত হইয়াছিল যে ফেব্রুয়ারি মাস অতীত হইয়া গেল তথাপি গাছ গজাইবার

কোন চিহ্ন দৃষ্ট হয় নাই এবং ৮ই বা ৯ই এপ্রেলের পূর্ব্ব ঐ সকল গাছে কুঁড়িও ধরে নাই, কিন্তু ১৫ই এপ্রেলের পরে গাছ সকল একেবারে কুঁড়িতে পরিপূর্ণ হইল। ঐ সময়ে হঠাৎ এক পশলা গুরুতর শিলাবৃষ্টি হওয়াতে গাছের পক্ষে অতিশয় ক্ষতি হইল তৎকালে ফল ধরিয়াছিল। অপর আঙ্গুর ক্ষেত্রের উপরি ভাগের এবং পশ্চিমাংশ হইতে ঝড় আসাতে ঐ দিকের গাছের বিস্তর হানি হইল, অধিক আঙ্গুরের থোলো এবং গাছের ফেঁকড়ী ভাঙ্গিয়া গেল, আগামি বৎসরের জন্য যে সকল বীজ চারা হইতে পারিত তাহারও অধিকাংশ বিনষ্ট হইল। কিন্তু সেই সকল নষ্ট চারা তাজা থাকাতে আগামি বৎসরে যদি তাহা হইতে গাছ হয় এই আশ্বাসে সে সকলের প্রতিপালন করা গেল। ঝড় বৃষ্টির প্রতিবন্ধকতায় ঐ বারে কেবল ক্ষেত্রের পূর্ব্ব ভাগের ফল প্রাপ্ত হইলাম এবং তাহা ৮৬৫ থোলো হইয়াছিল। কানষ্টানসীয়া দেশের আট টা গাছের মধ্যে কেবল দুইটা ফলবান্ হইয়াছিল একটার প্রধান ডালে ১৮ থোলো এবং অন্যটাতে ৭ থোলো ফল হয়। কিন্তু তৎকালে ঐ কএকটী গাছ ৩।।০ সাড়ে তিন ফিটের অধিক উচ্চ হয় না।

যাহা হউক তিন বৎসর চাস করাতে যে প্রকার ফল হইল তাহা গড় করিলে প্রত্যেক বৎসর ১৫২১ থোলো জন্মিয়াছিল, অতএব নিকটবর্ত্তি আঙ্গুর ক্ষেত্রের ফসলের সহিত তুলনা এবং গাছের বয়সও জমির নূতনতা বিবেচনা করাতে সপ্রমাণ হইল যে প্রথমতঃ 'আঙ্গুর গাছের শিকড় খুলিয়া দেওয়া', ধৌত করা, এবং যত কালে গাছের রস নীচে নামিয়া গাছের গজান রহিত করে তাবৎ সময় ঐ সকল শিকড়ে বাতাস পাইতে দেওয়া অত্যন্ত আবশ্যক, পরে উত্তমরূপে সার প্রস্তুত করিয়া গোড়ায় দেওয়া এবং বসন্ত ঋতুর প্রাক্কালেই মাটি দিয়া গোড়া ঢাকিয়া দেওয়া ও শেষে গাছের ডাল জাফরির উপর বিস্তৃত করিয়া দেওয়া আঙ্গুর চাসের পক্ষে অতিশয় উপকারক। জাফরির উপর বিস্তীর্ণ করিয়া দেওনের তাৎপর্য্য এই যে তাহাতে সর্ব্বত্র সমানরূপে আলো ও উত্তাপ পাইবে। আঙ্গুরের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার সময়েই পূবে বাতাস হইতে গাছ রক্ষার উপায় করা অত্যন্ত আবশ্যক কারণ ঐ বাতাসে ফলের

রোগ আনে, সেই রোগের চিহ্ন এই আঙ্গুরের গাত্রে এবং পত্রে লোহার রঙ্গের কাল কাল বিন্দু হয় তাহাতে তৎক্ষণাৎ পাতা শুকাইয়া যায় এবং ফলে ঐ রূপ দাগ হইলে তাহা আর বৃদ্ধিশীল হয় না বরঞ্চ রোগ না ধরা ফল যেমন বাড়িতে থাকে উহারা তেমনি বিবর্ণ মটরের ন্যায় হইয়া ক্রমে শুষ্ক হইয়া যায়। দানাপুরে উত্তম আঙ্গুর গাছ নাই, যদি কেপ হইতে কিছু আনাইতে পারি, ইচ্ছা আছে গ্লাসে ঢাকিয়া রাখিয়া উক্ত প্রকারে চাস করিব তাহাতে মার্চ এপ্রেল এবং মে মাসে ফল হইতে পারিবে এবং এক্ষণে জলে যে প্রকার নষ্ট হয় বৎসর বৎসর তদ্রূপ বিনষ্ট হইতে পারিবেক না।

তামাকু।

শ্রীযুত এচ রেহলিং সাহেবের লিখিত রঙ্গপুর জিলায় তামাকু চাস ও প্রস্তুত করণের বিবরণ।

মৃত্তিকা এবং সার।—উক্ত জিলায় বিশেষতঃ তত্রত্য নগরের নিকটবর্ত্তি স্থানে এবং তাহার ঠিক উত্তর পশ্চিম এবং পূর্ব্বভাগস্থ অঞ্চলে যে সকল উচ্চ বালুকাময় প্রান্তর আছে তাহাতে এই প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাহুল্যরূপ চাস হইয়া থাকে। দক্ষিণ ভাগে অত্যল্প পরিমাণে জন্মে এবং তাহা স্থানীয় লোকেরদের ব্যবহারেই শেষ হয়। তামাকু চাসের নিমিত্তে

উর্ব্বরা বালিয়া মাটী অতিশয় উপযোগী যেহেতু যে পর্য্যন্ত চারা পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত না হয় সে পর্য্যন্ত উক্ত মৃত্তিকা তাহাকে স্নিগ্ধ ও আর্দ্র রাখে পরন্তু গাছ প্রস্তুত ও পাতা সকল পক্ক হইলে তাহা নীরস হইয়া যায়। এই চাসের জন্য ভূমিতে উত্তমরূপে সার মিশ্রিত করা কর্ত্তব্য। সচরাচর গোময় এবং নীল খাগড়ার সার দেওয়া যায় কিন্তু শেষোক্ত পদার্থের বিশেষ আদর আছে কারণ তদ্দারা বহুতর বিস্তীর্ণ বালুকাময় মরুভূমি কৃষি কার্য্যের যোগ্য হইয়াছে। তাহা এই রূপে ব্যবহার হয়, যথা—প্রথমতঃ লাঙ্গল দ্বারা ক্ষেত্র সকল কর্ষিত করিয়া হৌজ হইতে নিক্ষিপ্ত আর্দ্রীভূত নীল খাগড়া সকল লইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তূপাকারে মৃত্তিকার তেজঃ বিবেচনা করিয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অন্তরে রাখিতে হইবেক। পরে ঐ সকল স্তূপের উপরে এক এক চাপড়া মৃত্তিকা দিবেক। অনন্তর কিঞ্চিৎ কালান্তে তাহা পচিয়া উঠিলে হল চালনা করিলে চারা রোপনার্থ মৃত্তিকা প্রস্তুত হইবেক।

চারা উৎপাদনের প্রকরণ।—সচরাচর আগষ্ট মাসের শেষে অথবা সেপ্টেম্বরের প্রথমে বীজ বপন হয়। বীজের কেয়ারী সকল উত্তম মৃত্তিকায় উচ্চ করিয়া সুন্দররূপে নির্ম্মিত করিবে যে তাহাতে কাঠী বা কোন কঠিন দ্রব্য না থাকিতে পায় অপর অতি গভীর স্থানে বীজ বুনিতে হইবেক। যদি ভারি বৃষ্টি হয়, তবে তাহার ক্ষতিকর উৎপাত হইতে চারা সকলকে রক্ষা করণার্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তৃণাচ্ছাদিত চালা অগ্রে প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হইবেক। কেহ কেহ এরূপ করে যে পর্য্যন্ত চারা সকল ভূমি হইতে উত্থিত না হয় তাবৎ পর্য্যন্ত পাতলা করিয়া পোআলীর ছাউনি দ্বারা আচ্ছাদন দেয়। বীজ বুননের ১৫ বা ২০ দিবস পরে চারা বহির্গত হয়। অপর কেয়ারীতে যখন চারা বৃদ্ধি হইবে তখন তৃণাদি নিড়াইয়া সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিতে হইবে এবং বৃষ্টির বিড়ম্বনা হইতে ও রক্ষা করিতে হইবে।

চারা রোপণ এবং তদনন্তর যে রূপ বিধান করা আবশ্যক তদ্বিবরণ।—অক্টোবর মাসের প্রথম ক্ষেত্রে চারা লইয়া রোপণ করণের উপযুক্ত কাল। তখন চারাতে ৫টি কিম্বা ৬টি পাতা ধরে। এইরূপ রোপণের কার্য-ডিসেম্বরের মধ্যভাগে সম্পূর্ণ হয়। তৎপরে যাহা রোপিত হয়

তাহাতে উত্তম ফসল জন্মে না যেহেতু সে সময়ে মৃত্তিকা অতিশয় শুষ্ক হয় সুতরাং তাহাতে নবীন বৃক্ষের শিকড় প্রবিষ্ট না হওয়াতে তাহা বৃদ্ধি পায় না। এরূপ দেখা গিয়াছে যে নিম্ন জলাভূমিতে জানুয়ারি মাস পর্য্যন্ত রোয়া হইয়াছে; কিন্তু এ প্রকার ভূমিতে মধ্যম প্রকার তামাকু ও জন্মে না। নীলকাঠী এবং গোবরের দ্বারা উক্তমত উত্তমরূপে সার দিয়া ক্ষেত্রে ভাল করিয়া লাঙ্গল দিতে হয়, এবং যে প্রকার শাকাদি জন্মাইবার নিমিত্ত উৎকৃষ্টরূপে মৃত্তিকার পাইট হইয়া থাকে, তামাকুর ক্ষেত্রেও তদ্রূপ যত্ন করিতে হয়। ২ ৩ ফীট অন্তরে চারার শ্রেণী সকল স্থাপন করিবেক এবং প্রতি শ্রেণীতে এক চারা হইতে অপর চারা উক্তরূপ অন্তরে রোপণ করিবেক। যদি মৃত্তিকা শুষ্ক হইয়া যায় তবে যে পর্য্যন্ত শিকড় না নামিবেক তাবৎ পর্য্যন্ত জল দিতে হইবে। রৌদ্র হইতে ও চারাসকলকে রক্ষা করা পরামর্শ সিদ্ধ। এ নিমিত্ত কাঁচা কলা গাছের বাকৃড়া এক এক ফুট লম্বা করিয়া কাটিয়া দেয়, তদ্দ্বারা অতি পরিপাটীরূপে সূর্য্যাতপ হইতে কোমল চারা সকল রক্ষিত হইয়া থাকে। এ স্থলে ইহাও কর্ত্তব্য, যে কপি চারা স্থানান্তর করিবার সময়েও উক্ত প্রকারে আচ্ছাদন দিয়া থাকে। পরে চারা সকল বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে মৃত্তিলা উত্তমরূপে খুসিয়া ও বনগাছ নিড়াইয়া সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার রাখা কর্ত্তব্য, এই কার্য্য সহজে সাধনার্থ এক খানা ক্ষুদ্র বিদাকাঠী উভয় শ্রেণীর মধ্য দিয়া উভয় দিগে অর্থাৎ উত্তর হইতে দক্ষিণ এবং পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে সঞ্চালিত হয়। তাহাতে উক্ত যন্ত্র মূল স্পর্শ না করিয়া কিঞ্চিৎ অন্তর দিয়া চলিয়া যায়। এই প্রকরণ পুনঃ পুনঃ করিতে হয়। বিদাকাষ্ঠ দ্বারা যে সকল আগাছা উৎপাটিত না হয় সে সকল পেষণ অথবা নিড়ানী দ্বারা নিরাকৃত হইয়া থাকে। যদি মৃত্তিকায় উপযুক্ত মত সার দেওয়া না হয় তবে খলী ও গোময় একত্র করিয়া তাহার গুঁড়া মূলের চতুষ্পার্শে দিয়া মৃত্তিকায় মিশ্রিত করিয়া দিতে হয়। যে সময়ে চারায় বড় বড় পাঁচ ছয় টা পাতা বাহির হয় সেই সময় তাহার বৃদ্ধি নিবারণ নিমিত্ত পুষ্প মঞ্জরী সকল ভাঙ্গিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য, তাহাতে নূতন নূতন ফেঁকৃড়ি ও পল্লব গজিয়া উঠিবে, সে সমুদায় নির্গত হইবা মাত্র যত্ন পূর্ব্বক ভাঙ্গিয়া দিতে হইবেক। এরূপ করণের ফল এই

যে তদ্দ্বারা অতি দীর্ঘ ও উত্তম গুণ শালি পত্র সকল পাওয়া যাইবেক, যেহেতু চারার সমুদায় রস পত্র নিকরেই উত্থিত হয়। উক্ত প্রকরণ সমাপ্ত হইলে চারার নীচে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাতা থাকে, তত্তাবৎ ভাঙ্গিয়া লইয়া কিয়দ্দিবস মৃত্তিকার উপর রাখিয়া শুখাইয়া ছোট ছোট আটী বাঁধিয়া ছাদের নিম্নে ঝুলাইয়া রাখা যায়। এই সকল পাতা দুঃখি লোকেরা হুঁকায় সাজিয়া খায়।

পাতা কাটুনী ও প্রস্তুত করণ। যখন পত্র সকল সুপক্ক অর্থাৎ হরিদ্বর্ণের পরিবর্ত্তে ঈষৎ পীত বর্ণ ও আশু ভঙ্গনীয় হয় এবং তাহার সমুদায়াংশ অসমান তথা কুঞ্চিত তখনি কাটুনীর কর্ম্মারম্ভ হইয়া থাকে। কাটিবার সময় কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বৃক্ষের ছাল সুদ্ধ কাটিয়া লইতে হয়। পরে পত্র সকল কাটা হইলে ভূমির উপর এরূপ নিয়মে বিস্তৃত করিয়া শুখাইতে হইবেক যে তাহারদিগকে নোয়াইলে না ভাঙ্গে অর্থাৎ মড়্-মড়িয়া না হয়। অনন্তর সে সকল লইয়া ছায়ায় রাখিবেক। পরন্তু প্রয়োজনানুসারে দুই কি চারি টা করিয়া পাতা লইয়া আটি বান্ধিয়া বাখারির উপর হালি গাঁথিয়া পুনশ্চ তত্তাবৎ স্বল্প তৃণাচ্ছাদিত চৌড়া চালের নীচে ঝুলাইয়া রাখিতে হইবেক তথায় ঈষৎ পিঙ্গলবর্ণ হইলে সে সকল লইয়া এক গৃহের চালের নীচে উর্দ্ধ স্থান হইতে অধোভাগ পর্য্যন্ত একটার পর আর একটা, এইরূপে সারি করিয়া সাজাইতে হইবেক। সেখানে সে সকল উত্তম রূপে শুষ্ক হইলে নামাইয়া লইয়া নানাবিধ আকারে আটিবন্ধ করে কিন্তু ঐ বিষয়ে এরূপ সতর্কতার আবশ্যক যেন মেঘাচ্ছন্ন দিনে এই কর্ম্ম সম্পন্ন হইতে পারে যেহেতু রৌদ্রের সময় পত্র সকল শুখাইয়া ঠুনকা হইয়া উঠিবাতে নষ্ট হয়। এ দেশে পাতা ঘামাই-বার ও গাঁজিবার প্রথা নাই কিন্তু এখানে যে সামান্য নিয়মে পাতা নির্দ্দোষ করা যায়, তৎপরিবর্ত্তে কিউবা দেশের প্রচলিত নিয়মাবলম্বন করিলে অত্যুৎকৃষ্ট তামাকু উৎপন্ন হইতে পারে। অপর আটি বাঁধিবার সময় নূতন বিচালীর লঘু আচ্ছাদন ব্যবহার করা যায়।

কৃষি এবং উৎপত্তির পরিমাণ প্রভৃতি। এবিষয়ের পরিমাণ নিশ্চয় রূপে স্থির করা যায় না। অনুমান হয় প্রতি বৎসর লক্ষ মোন উৎপন্ন হয়।

এতৎ পরিমাণ বিঘা করিয়া অবধারিত হইল। এই জিলায় আনুমানিক তিন লক্ষ বিঘায় তামাকু চাস হয়; তামাকুর সহিত নীল চাসের তুলনা করাতে দেখা গিয়াছে যে স্থলে নীলের চাস এক বিঘা সে স্থলে তামাকুর চাস তিন বিঘা ভূমিতে আছে সুতরাং ঐ জিলায় নীলের চাস এক লক্ষ বিঘায় হইয়া থাকে। সেরাজগঞ্জ, পাবনা, কালনা এবং বাঙ্গালা দেশের নিম্ন প্রদেশের যাবতীয় বন্দর ও গঞ্জের মহাজনদিগের হস্তেই রঙ্গপুরীয় তামাকুর ব্যবসা রহিয়াছে. তাহারা বর্ষাকালে বড় বড় নৌকা করিয়া আসিয়া ভরপূর বোঝাই লইয়া উপরি উক্ত স্থান সকলে লইয়া যায়। মগেরাও নৌকা করিয়া আসিয়া বহুল পরিমাণে ক্রয় করে। উৎপাত্ত এবং অন্যান্য কারণানুসারে ২ টাকা হইতে ৩ টাকা পর্য্যন্ত বাজার দরে প্রত্যেক মোনের মূল্যের ন্যূনাতিরেক হয়। যদবধি ঐ জিলায় নীলের ব্যবসা চলিযাছে তদবধি নীল খাগড়ার উর্ব্বরাকরত্ব গুণ বিধায় প্রচুর পরিমাণে স্যার পাওয়াতে তামাকুর চাস বৃদ্ধি হইয়্যাছে। প্রজারা এই দ্রব্যের কৃষির নিমিত্ত দিবা রাত্রি পরিশ্রম করে। তাহাতেই তাহারা ভূম্যধিকারি এবং মহাজনদিগের গুরুতর দাবী দিতে সক্ষম হয়। কোন্ সময়ে তামাকু এদেশে চলিত হইয়াছে তাহা নিশ্চয় বলা যায় না কিন্তু বাঙ্গালা তামাকু শব্দের সহিত পর্ত্তুগীস তাবাকা শব্দের ঐক্য বিধায় বোধ হয় পর্ত্তুগীস জাতিরাই আনিয়া থাকিবেক। পাতা পাকিবার সময় যদি ঐ জিলায় ভারি শিলা বৃষ্টি হয় তাহা হইলে তামাকুর পত্র আশু ভঞ্জনীয় বিধায় অত্যন্ত ক্ষতি হইয়া থাকে তাহাতে অনেক প্রজার সর্ব্বনাশ হইয়া যায়।

মেং রেলিং সাহেব রংপুরে তামাকের চাষ আবাদ করিয়া বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন এবং তিনি যে যে সুপ্রণালী এবং চাষের উপায় অবলম্বন করিয়া কৃতকার্য্য হয়েন তাহা অতি সঙ্গত বলিয়া বোধ হওয়াতে সর্ব্ব সাধারণকে অবগত করিবার জন্য উক্ত সাহেবের পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করা গেল; যে সকল লোকে হিংলি তামাকের আবাদ করিয়া থাকেন, তাঁহারা মেং রেলিং সাহেবের প্রণালী কতদূর সঙ্গত বুঝিতে পারিবেন।

কুসুম ফুল।

কুসুম ফুলের মনোহর রং ও ইহার বীজোৎপন্ন তৈল অনেকেই অবগত আছেন। কিন্তু ইহার চাসাদি কি প্রকারে সম্পন্ন হয় ইহা জানিতে আপনকার কৃষিতত্ত্বের অনেক পাঠক আগ্রহ প্রকাশ করিতে পারেন। পূর্ব্ব বাঙ্গালা অঞ্চলে ইহার চাস কি প্রকারে হয় তাহার সংক্ষেপ বিবরণ নিম্নে দিতেছি।

ফরিদপুর, ঢাকা, বরিশাল প্রভৃতি জেলায় কুসুম ফুলের চাস হয়। তত্তৎ প্রদেশ নিম্ন ভূমি ও বহুল নদী বিশিষ্ট হওয়াতে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ ভাগ হইতে ঐ ঐ স্থানে নদীর ও বৃষ্টির জল সংগৃহীত হইতে থাকে। এই জল কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত জমির উপর থাকিয়া জমি সকলে 'পলি' মাটি প্রক্ষেপ করে। পলিমাটী পতন জন্য জমির উর্ব্বরতা ও রসালতা অতিশয় বৃদ্ধি হয়। এবং একারণ বশতঃ ক্ষেত্র মধ্যে সাবাদি প্রদান কিম্বা কুসুম ফুল কিম্বা অপরাপর এবম্প্রকার ফসলোৎপাদন জন্য মধ্যে মধ্যে জল সেচন করিতে হয় না। অগ্রহায়ণ মাসের আরম্ভে যখন ভূমির মৃত্তিকা কর্দ্দম ন্যায় থাকে, কৃষকেরা ঐ সকল জমিতে মটর কলাই ছড়াইয়া দেয়, কিম্বা পৌষ মাসের মাঝা মাঝি সময়ে কুসুম ফুলের চাস জন্য মৃত্তিকা শুকাইতে জমি ফেলিয়া রাখে। পলিমাটীর জন্য লাঙ্গল করণের ক্লেশ হয় না। ৩।৪ টি লাঙ্গলের পর মই দ্বারা জমি সমান করিয়া তাহাতে বীজ বপন ভিন্ন জমিতে অন্য কোন পাট করিতে হয় না। কএক দিবসের মধ্যে অঙ্কুর উৎপন্ন হইয়া চারা দেখা দেয়। সমুদায় মাঘমাসে বৃক্ষ পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হয়। বৃক্ষ শোণ বৃক্ষের ন্যায় বড় হয়। যখন ইহার ফুল ফুটিতে থাকে তখন ইহার রঙ্গ শ্বেতাভ রক্তবর্ণ, কিন্তু ক্রমশঃ গাঢ় লোহিত বর্ণে পরিণত হয়। কুসুম ফুল শোভিত ক্ষেত্র অপেক্ষা সুন্দরতর ক্ষেত্র অতি বিরল। ফাল্গুনের শেষভাগে যখন কুসুম ফুল সকল বিশেষ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তখন গাছে ফল ভাগটি রাখিয়া পুষ্প ভাগটি হস্ত দ্বারা ছিড়িয়া গৃহে আনা হয়। এবং যত দিবস ফলাভ্যন্তরস্থ বীজ সকল না পাকিয়া উঠে ততদিবস

ছিন্ন-পুষ্প-গাছ জমিতে দাঁড়াইয়া থাকে। বীজ পাকিলে গাছগুলি উৎপাটন কিম্বা কর্ত্তন করিয়া গৃহে রৌদ্রে শুষ্ক হইতে দেওয়া হয়। পরে মটর কলাইয়ের গাছ হইতে কলাই বহিষ্করণের ন্যায় কুসুম ফুলের বীজ পৃথক্ করিতে হয়।

উপরে বলা হইয়াছে যে কৃষকেরা কুসুম ফুল সকল ছিড়িয়া গৃহে আনে। তাহারা বড় বড় পরমার উপর ফুল রাখিয়া জল দিয়া ধৌত করে। পরে মধ্যে মধ্যে ফুলে জল প্রক্ষেপ করিতে করিতে পদ দ্বারা মাড়াইয়া দলিতে থাকে। উত্তমরূপ দলা হইলে ছোট ছোট 'আস্‌কে' পিষ্টকের ন্যায় দলিত ফুলের পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া রৌদ্রে শুখাইতে দেয়। এই শুষ্ক গোলাকার পিষ্টক খণ্ড বিক্রীত হইয়া থাকে।

ডাঁটাগুলি জ্বালানি কাষ্ঠ স্বরূপ ব্যবহার করে। দুঃখী কৃষকেরা বীজ হইতে তৈল বাহির করিয়া জ্বালানি তৈল প্রস্তুত করে। তাহারা বীজ হইতে তৈল বহিষ্করণের এক অতি সহজ উপায় অবলম্বন করে। বীজ সকল রৌদ্রে কিম্বা অগ্নির উত্তাপে শুষ্ক করিয়া ঢেঁকি দ্বারা চূর্ণ করে। পরে হাঁড়িতে প্রায় জল পূর্ণ করিয়া অগ্নির উত্তাপ দ্বারা জল গরম করিতে থাকে। ইতিমধ্যে চূর্ণীকৃত বীজ কণা উত্তপ্ত জলে ফেলিয়া দেয়। কিঞ্চিৎক্ষণ পরে বীজকণা হইতে তৈল বহির্গত হইয়া জলোপরি ভাসিতে থাকে। তখন সামান্য কাটি দ্বারা সেই ভাসমান তৈল পাত্রান্তর করিলেই ব্যবহারোপযোগী তৈল প্রস্তুত হইল।

তৈল জ্বলন-ব্যতীত বহুবিধ রোগোপশমে লাগে। বাত ও পক্ষাঘাত রোগেই ইহার বিশেষ ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। বীজের রেচক শক্তি আছে। টিয়া প্রভৃতি পক্ষীরা এই বীজ ভক্ষণ করিতে ভাল বাসে, এবং কখন কখন বীজ সকল ভাজিয়া লোকে ভক্ষণ করিয়া থাকে। ইহার আস্বাদ কিঞ্চিৎ তীব্র।

কুসুম ফুলের পিষ্টক খণ্ড (কৃষকেরা 'চেপটা' বা 'চাপটা' কহিয়া থাকে) সময়ে সময়ে মনকরা ৫০৲। ৬০৲ টাকা মুল্যে বিক্রীত হয় এক বিঘা জমিতে প্রায় ১০। ১২ সের ফুলের পিষ্টক হয়। এতদ্দেশে বস্ত্ররঞ্জণ জন্য উক্ত পিষ্টক খণ্ড বিশেষ সমাদৃত হয়। কিন্তু বিলাতে ঐ

ফুল হইতে নির্যাস বাহির করিয়া বিবি দিগের মুখে মাখিবার এক প্রকার গোলাপী রঞ্জ প্রস্তুত করে। অনেকে কুসুম ফুলের রঙ্গকে ভ্রম বশতঃ জাফ্রান্ বলিয়া মনে করেন; বলা বাহুল্য যে তাহা বাস্তবিক নহে। এই সামান্য পরিশ্রম জাত উদ্ভিদ সভ্য সমাজভুক্ত লোকদিগের কত উপকার সাধন করে!

শ্রীযোগেশ চন্দ্র রায়।
হুগলি কালেজ।

গো জাতির উন্নতি।

ভূমি কর্ষণ কৃষি কার্য্যের একটি প্রধান অঙ্গ। উত্তম রূপে ভূমি কর্ষিত না হইলে, সুচারুরূপে কখন শস্য জন্মাইতে পারে না। আমাদের দেশে যে প্রণালীতে ভূমি কর্ষিত হয়, তাহার অবস্থা অতীব শোচনীয়। কৃষকেরা দেশীয় লাঙ্গলের দ্বারা ভূমির উপরকার মৃত্তিকার অতি সামান্য অংশ খনন করিয়া বীজাদি বপণ করিয়া থাকে। অন্যান্য কারণ স্বত্ত্বে, ইহা যে, শস্য জন্মিবার একটী মহান প্রতিবন্ধক, বোধ হয় তদ্বিষয়ে কাহারও মত দ্বৈধ নাই। এক্ষণে ইংলণ্ড প্রভৃতি সুসভ্য দেশে বিজ্ঞানের বহুল উন্নতি হওয়ায়, তত্তদ্দেশীয় কৃষকেরা বিজ্ঞান বলে, অতি অল্প পরিশ্রমে, ও অল্পায়াসে প্রচুর শস্য প্রাপ্ত হইতেছেন; আমাদের দেশে অনেক পরিশ্রম করিয়াও তদুপযুক্ত ফসল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আমাদের দেশের ভূমি স্বভাবতঃ যে প্রকার উর্ব্বরা, তাহাতে যদি উল্লিখিত দেশের ন্যায় বৈজ্ঞানিক প্রনালীতে কৃষি কার্য্য প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা হইলে অল্পায়াসে অল্প পরিশ্রমে যে ইউ-রোপ অপেক্ষা অধিকতর ফল লাভ করিতে পারা যায়, সন্দেহ নাই।

ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে যে লাঙ্গল ব্যবহৃত হয়, এবং উত্তর পশ্চিম প্রদেশে যে লাঙ্গলের আবিষ্কার হইয়াছে, তাহা যদি আমাদের দেশের সর্ব্ব স্থানে প্রচলিত হয়, তাহা হইলে অনেকটা সুফসলের আশা আছে। কিন্তু সে প্রকার লাঙ্গল যে সমস্ত কৃষকে ব্যবহার করিতে সক্ষম হইবে, তাহা বলা যায় না। আমাদের দেশীয় লাঙ্গল অপেক্ষা সে লাঙ্গল অত্যন্ত মুল্যবান।

তাহা সাধারণে ক্রয় করিতে কখনই সক্ষম হইবে না। যদিও একবার কষ্টে স্বষ্টে ক্রয় করিতে সক্ষম হয়, তাহা হইলেও দৈবাৎ কখন ভগ্ন হইলে, বা মেরামত করিবার আবশ্যক হইলে, হয়ত মেরামত অভাবে তাহা সম্পূর্ণ কার্য্যের অনুপযুক্ত হইবে। যত দিন না সকল স্থানের কারিকরেরা উক্ত প্রকারের লাঙ্গল নির্ম্মাণ করিতে ও মেরামত করিতে না শিখিবে, এবং সুলভ মূল্যে বিক্রীত না হইবে, ততদিন তদ্দ্বারা উপকারের প্রত্যাশা করা এক প্রকার অসম্ভব। ঐ সকল লাঙ্গল দেশীয় লোকের দ্বারা অল্পায়াসে প্রস্তুত ও সুলভ মূল্যে বিক্রীত হইতে এখনও অনেক সময় সাপেক্ষ।

দেশীয় লাঙ্গলের উন্নতি করিতে হইলে, অগ্রে হাল বাহক পশুগণের উন্নতি করা বিশেষ আবশ্যক। হাল বাহক পশু বলবান না হইলে, তাহাদের দ্বারা উত্তম রূপে ভূমি কর্ষিত হইবে না, উত্তম রূপে ভূমি কর্ষণ করিতে হইলে, খুব বলবান পশুর আবশ্যক করে, কিন্তু অমাদেব দেশে সে প্রকার পশুর নিতান্ত অসম্ভব। দেশীয় লাঙ্গল গো, অশ্ব ও মহিষ এই তিন প্রকার পশুর দ্বারা পালিত হইতে পারে। অশ্ব ও মহিষ আমাদের দেশে এত অভাব যে, তদ্দ্বারা সর্ব্ব সাধারণের হল চালনা হওয়া সু কঠিন। বিশেষতঃ এই উষ্ণ প্রধান দেশে অশ্ব ও মহিষের দ্বারা হল চালিত হইতে পারে না—বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রচণ্ড রৌদ্রের সময় অশ্ব ও মহিষের দ্বারা হল চালনা করিলে, তাহারা উন্মত্তের ন্যায় হইয়া পড়ে। আমাদের দেশের কোন স্থানেই প্রায় অশ্বের দ্বারা হল চালনা করিতে দেখা যায় নাই। যদিও মহিষের দ্বারা স্থানে স্থানে হল চালনা হইয়া থাকে, তাহা ও অতি অল্প স্থানেই দৃষ্ট হয়। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসের দারুণ রৌদ্রের সময় মহিষের দ্বারা মোটেই হল চালিত হইতে পারে না। যদিও বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে মহিষের দ্বারা লাঙ্গল করিতে হয়, তবে রাত্রি ৩। ৪ টার সময় যাইয়া বেলা ৭। ৮ টার সময় ছাড়িয়া দিতে হয়। বর্ষা কালে মহিষের দ্বারা হল চালনার কতকটা সুবিধা হইতে পারে—তাহাও আবার সকল দিনে নহে। কারণ প্রখর রৌদ্রে তাহাদের শরীর উত্তপ্ত হইলে, তাহারা উন্মত্তের ন্যায় হইয়া জলাশয়াভিমুখে প্রধাবিত হয়, এবং জলাশয়ে নামিয়া পড়িয়া থাকে। মহিষ ও অশ্ব আমাদের দেশে এত অল্প যে, তদ্দ্বারা সর্ব্ব সাধারণের কৃষি

বিষয়ে কোন উপকারে আইসে না। প্রণিধান করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীত হইবে, গো জাতিই আমাদের দেশের প্রকৃত হল চালনের উপযোগী। গো জাতির উন্নতি পক্ষে সর্ব্ব সাধারণের দৃষ্টি থাকা একান্ত প্রার্থনীয়। দুর্ব্বল গরুর দ্বারা উত্তম রূপে হল চালিত হইতে পারে না। আমাদের দেশে গো জাতির এত অবনতি হইয়াছে যে, অন্য কোন দেশে তদ্রূপ হইয়াছে কি না সন্দেহ। বর্ষা কালে হল চালক দুর্ব্বল গরুর দুরবস্থা দৃষ্টি করিলে পাষাণ হৃদয়ও দ্রবীভূত হয়! কৃষকদিগের গরুর প্রতি বিকৃতি স্বরে তাড়না; যষ্ঠি প্রহার এবং গরু গুলির আর্ত্তনাদ ইত্যাদি শ্রবণ বা দর্শন করিলে, কাহার না মনে কারুণ্য রসের সঞ্চার হয়! গো জাতির যে এত অবনতি, সে কাহার দোষে? তাহা কি আমাদের দোষে নহে? প্রাচীন আর্য্যেরা গো জাতির উপকারিতা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন, তাঁহারা গো জাতির প্রতিপালন, সেবা সুশ্রুষা এবং গো জাতির ভাবি বংশের উন্নতি প্রতি তাঁহাদের বিলক্ষণ মনোযোগ ছিল। তাঁহাদের ঐ সকল নিয়মাবলী যদি কালে কালে লোপ না হইত, তাহা হইলে কি গো জাতির এত হীনাবস্থা হইত?

আমাদিগের দেশের গো জাতির বর্ত্তমান অবস্থা অতি শোচনীয়। অধিকাংশ গরু অতি দুর্ব্বল ও খর্ব্বাকৃতি। পূর্ব্বে যেমন দুগ্ধবতী গাভী পাওয়া যাইত, এখন আর সে রূপ পাওয়া যায় না। যে সকল কারণে গো জাতির এরূপ অবনতি হইয়াছে, তাহা দূর করিয়া, যদি এখন হইতে গো জাতির উন্নতি সাধনে চেষ্টা না করা যায়, তাহা হইলে যে ক্রমে ক্রমে তাহাদের আরও অবনতি হইবে, তাহার সন্দেহ নাই।

ইংলণ্ডের লোক নিজ যত্নে গো জাতির এরূপ উন্নতি করিয়াছেন যে, শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়। তথাকার এক একটী ভাল গরু ১৬।১৭ হাজার টাকা মূল্যে বিক্রয় হয়। আমাদের দেশের লোকে হয়ত ইহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিবেন না, কিন্তু বস্তুতঃ ইহা কাল্পনিক কথা নহে। ১৮৬২ খৃঃ অব্দে প্রকাশ্য নীলামে এই রূপ উচ্চ দরে অনেক গরু বিক্রয় হইয়াছে। ১০।১২ হাজার টাকা মূল্যের গরু সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। তথাকার অনেক সমৃদ্ধিশালী লোকেও গরুর ব্যবসা করিয়া থাকেন

যত্ন করিলে আমাদের দেশের গরুর অবস্থাও অনেক উন্নত করিতে পারা যায়। ভারতবর্ষের মধ্যে মহীসূর, সিন্ধু, গুজরাট, হরিয়ানা এবং নাগোরে অতি উত্তম গরু প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই স্থানের গরুর মূল্য সচরাচর দেড়শত টাকা হইতে তিনশত টাকা পর্য্যন্ত যাইয়া থাকে। তবে অত্যুৎকৃষ্ট গরু ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক মূল্যে বিক্রয় হয়। ভাল ভাল গাভী সকল পূর্ণাবস্থায় পনর সের হইতে বিশ সের পর্য্যন্ত দুগ্ধ দিয়া থাকে। ১০। ১২ সের দুগ্ধ অধিকাংশ গাভীরই হইয়া থাকে।

গো জাতির উন্নতি সাধনার্থ গবর্ণমেণ্ট উত্তর পশ্চিম প্রদেশে হিসার নামক স্থানে অনেক দিন হইল, একটী গো শালা স্থাপন করিয়াছেন, এবং উল্লিখিত নানা স্থান হইতে উৎকৃষ্ট বৃষ ও গাভী আনাইয়া যে গো বংশের উৎপন্ন করাইয়াছেন, তাহা সর্ব্বত্র অতি উত্তম গো জাতি বলিয়া সমাদৃত ও প্রশংসিত হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট যে মূল্যে এই রূপ গরু এদেশে ক্রয় করিতে পারিতেন, তদপেক্ষা অল্প ব্যয়ে নিজ গো শালা হইতে এই সকল গরু প্রাপ্ত হইতেছেন। এদেশে ক্রমে ক্রমে সাধারণ গো জাতির অবস্থা উন্নত হয়, এই অভিপ্রায়ে গবর্ণমেণ্ট প্রতি বৎসর দুইশত ষাঁড় বিনা মূল্যে বিতরণ করিয়া থাকেন। যাঁহাদের গরু আছে, এবং যাঁহারা গো বংশের উন্নতি করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা আবেদন করিলেই এক একটী ষাঁড় প্রাপ্ত হইতে পারেন। এই রূপে যদি বঙ্গদেশীয় তরুণ বয়স্ক, সুস্থ ও সবল কায় গাভী হইতে শঙ্কর বর্ণ অর্থাৎ দোয়াশীলে গরু উৎপন্ন করা যায়, তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে আমাদিগের গো জাতির উন্নতি হইতে পারে, তাহার কোন সন্দেহ নাই।

আমাদের দেশের প্রাচীন কালের মুণি ঋষিরা গো জাতির ভাবি বংশের উন্নতি ও প্রতিপালন করিতে বিলক্ষণ পারক ছিলেন। তাঁহারা গো জাতিকে দেবতা বিশেষ নির্দ্দেশ করিয়া, ভক্তির সহিত সেবা শুশ্রূষা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। গরুর প্রতি অন্যায়াচরণ করিলে, কি গো জাতির সেবার ক্রটী করিলে কিম্বা গো জাতির অপমৃত্যু ঘটিলে দণ্ড স্বরূপ প্রায়শ্চিত্তের বিধান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা গো জাতির ভাবি বংশের উন্নতি সাধন জন্যই বোধ হয়, বৃষোৎসর্গের বিধান করিয়াছেন। বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধে একটী সবল (পুং) গো বৎসের পশ্চাদ্দিকের পদের

উপরি ভাগ চিহ্নিত করিয়া, স্বাধীন ভাবে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। বৃষটী ইচ্ছামত আহার বিহার করিয়া, বিলক্ষণ হৃষ্ট পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইয়া উঠে, তদ্দ্বারা গো জাতির সন্তানোৎপত্তি হইলে; গো বংশের অনেক উন্নতি হইতে পারে। যদিও এখন বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ প্রচলিত আছে, কিন্তু পূর্ব্বে বৃষের দ্বারা যেরূপ উপকার সাধিত হইত, এক্ষণে আর সে প্রকার হয় না;—কারণ বৃষ স্বেচ্ছামত সাধারণের ফসল নষ্ট করায়, তাহারা বিরক্ত হইয়া সহরে বৃষটী ছাড়িয়া দিয়া আইসে। সহরের মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃক বৃষটী ধৃত হইয়া, ময়লার গাড়ি বহন কার্য্যে নিযুক্ত হয়। সহরের প্রায় অধিকাংশ ময়লার গাড়ির বহন কার্য্য পূর্ব্বোক্ত বৃষের দ্বারা সম্পাদিত হইতে দেখা যায়। এক্ষণে গ্রামের দুর্ব্বল গরু দ্বারা গো জাতির সন্তান উৎপত্তি হওয়ায়, গো জাতির এত অবনতি হইয়াছে। আমাদের দেশে যদি ২। ৪টী বলবান (পুং) গোবৎস জন্মে, তবে তদ্দ্বারা ও প্রায় গো জাতির সন্তান জন্মে না, কারণ বলবান গরু জন্মিলেই, তাহার অধিকাংশই শৈশব কালে অথবা কিঞ্চিৎ বয়ঃ প্রাপ্ত হইলে কিম্বা যৌবন কালে মুষ্কোচ্ছেদন করিয়া দেওয়া হয়। ইহাতে তদ্দ্বারা ও সন্তানোৎপত্তির ব্যাঘাত জন্মে।

পয়স্বিনী গাভীর প্রায় সমস্ত দুগ্ধই দোহন করিয়া লওয়ায়, তাহার বৎসেরা উদর পুরিয়া দুগ্ধ পান করিতে না পাইয়া ক্রমশঃ দুর্ব্বল ও হীন বীর্য্য হইয়া পড়ে। এই রূপ শৈশব কালে উদর পুরিয়া দুগ্ধ পান করিতে না পাওয়ায় ও যে গো জাতির হীন বীর্য্যের একটী প্রধান কারণ, তাহার সন্দেহ নাই। ইহা আমরা অনেক স্থলে দৃষ্ট করিয়াছি, অনেক গো বৎস এই রূপ অনশনে হীন বীর্য্য ও ক্ষীণ কায় হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। আমাদের দেশে এই রূপ নানা প্রকারে গো জাতির অবনতির কারণ দেখিতে পাওয়া যায়। গো জাতির প্রতি আমাদের পুর্ব্বাপেক্ষা ভক্তির হ্রাস হওয়ায়, এই মহৎ অনিষ্ট হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের শাস্ত্রকারেরা গো জাতির প্রতি ভক্তির সহিত সেবা শুশ্রুষা করিতে পরামর্শ দিয়া, কিরূপ দূরদর্শীতার কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, তাহা আমরা একবার ভাবিয়াও দেখি না। তাঁহাদের প্রত্যেক কার্য্যই মঙ্গলময়, আমরা সেই মঙ্গলময় কার্য্যের অবহেলা করিয়া পদে পদে বিপদে পতিত হই, তথাপি

আমরা তাঁহাদের উপদেশ প্রতিপালন করি না, বরং তাঁহাদিগকে কুসংস্কার বিশিষ্ট বলিয়া গালি প্রদান করি।

কেবল মাত্র উত্তম গো বংশ উৎপন্ন করাইতে পারিলে কিম্বা অন্য স্থান হইতে উৎকৃষ্ট গরু আমদানি করিলেই যে গো জাতির সর্ব্বাংশে উন্নতি হইবে, এমত নহে। গো জাতির উন্নতি করিতে হইলে, তাহাদিগের প্রচুর পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য প্রাপ্তির উপায় করা আবশ্যক। লোকে কথায় বলে " গাইয়ের মুখে দুধ। " কিন্তু আক্ষেপ এই, এদেশে গোচারণ ভূমি যথেষ্ট পরিমাণে নাই, পূর্ব্বে যাহাও ছিল, ক্রমে ক্রমে তাহার ও হ্রাস হইয়াছে ও হইতেছে। গো জাতির উন্নতি করিতে হইলে, গোচারণ ভূমির বন্দোবস্ত করিয়া তাহাতে নানা প্রকার উত্তম ঘাস জন্মাইবার উপায় করা আবশ্যক।

আর একটী বিষয় এই, দেশের গো শালা সকল অতি কদর্য্য। গো জাতির উন্নতি করিতে হইলে, গোশালা ভাল করিয়া নির্ম্মাণ করা, বিশেষ আবশ্যক। গোশালা অতিশয় শুষ্ক ও পরিষ্কৃত না হইলে এবং প্রচুর পরিমাণে বায়ু সঞ্চালনের উপায় না থাকিলে, বাত প্রভৃতি নানা রোগ জন্মিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। দুঃখের বিষয় এই, আমাদের দেশে গোশালা প্রস্তুত কবিবার কালে ইহার প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি রাখা হয় না। অনেক স্থলে আর্দ্র ভূমিতে গোশালা প্রস্তুত হয় এবং মল মূত্র নিঃসারণের নিমিত্ত পয়োনালা প্রভৃতি না থাকায় ভূমির আর্দ্রতা আরও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বিলাতের লোকে এই বিষয়ে বিশেষ সাবধান, তাঁহারা কখন ও আর্দ্র ভূমিতে গোশালা প্রস্তুত করেন না। গোশালার দক্ষিণ দিক খোলা থাকা আবশ্যক এবং গৃহে বায়ু সঞ্চালনের উপযোগী অনেক গুলি প্রশস্ত দ্বার রাখা কর্ত্তব্য। বস্তুতঃ মনুষ্যের গৃহ নির্ম্মাণ পক্ষে যেরূপ সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যক, এ স্থলেও সেই রূপ সাবধান হওয়া উচিত। গোশালা নির্ম্মাণ পক্ষে যাঁহাদের অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারা বলেন যে, গরু সকলকে একত্র না রাখিয়া, গোশালায় স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠ নির্ম্মাণ করিয়া, তাহার এক এক প্রকোষ্ঠে এক একটী গরু রাখা ভাল।

[শ্রীরাজনারায়ণ বিশ্বাস। (জ্ঞান বিকাশিনী সভার সম্পাদক।)]

OPINION OF THE PRESS.

We notice with unfeigned pleasure the appearance of the first number of a Bengali monthly journal, called the *Krishi Tatwâ*, or Agricultural Researches, published by Babu Nittya Gopal Chatterjie, of the Paikparah Nursery.

The usefulness of a work of this kind can hardly be exaggerated, inasmuch as it tends to popularize, while elevating, a craft which has come to be looked down upon, simply because its real importance has never, till within the last few years, begun to be appreciated. We sincerely wish Babu Nittya Gopal Chatterji's venture the success he himself can desire for his rightly directed public spirit, and for the sake of our educated youth, who might in following up an improved system of agriculture, strike out a new line, or rather reopen an old neglected line, for the employment of their energies and the scientific information they acquire at our public colleges and schools.

Indian Mirror, February 1, 1879.

We have received a monthly Journal named *Krishi Tatwa*, probably coming from the hand of energetic promoter of the Pikeparah Nursery. We have taken a cursory glance only of the contents of the book and we are satisfied by perusal of the same that it deserves the liberal support and patronage of the public. The articles are well chosen.

National Paper, January 19, 1879,

Extract from the Hindu Patriot of the 25*th January*, 1879.

We acknowledged last week the receipt of the *Krishi Tatwa*, a Journal devoted to agriculture. The number is no cirterion, but it is a good number, the proprietor of the Pikeparah Nursery is the projector of the periodical.

"Krishi Tattwa" is a monthly Bengali journal, devoted, as its name indicates, to the science and art of agriculture. It is in the charge of a pratical agriculturist and horticulturist

who is well known in the country. Babu Netto Gopal Chatterjee has made agriculture a subject of live-long study, and the journal coming out of his hands will, we dare say, prove of immense benefit to an agricultural country, like ours. The paternal Government as well as the public should lend a helping hand to an enterprize like this.

Amrita Bazar Patrica. the 20th February, 1879.

এরূপ প্রয়োজনীয় পত্রিকার সম্পূর্ণ অভাব আছে। সুবিখ্যাত পাইকপাড়া নর্শরির অধ্যক্ষ বাবু নৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায় সেই অভাব মোচনে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। এদেশে অধিকাংশ লোক মূলধন বিহীন। সুতরাং বাণিজ্য দ্বারায় অর্থোপার্জ্জন করা সাধারণের পক্ষে দুর্ঘট। চাকরি ক্রমেই দুষ্প্রাপ্য ও ক্লেশকর হইয়া উঠিয়াছে। তজ্জন্য ক্রমেই সর্ব্ব সাধারণের ক্লেশ বৃদ্ধি হইতেছে। এমন স্থলে দেশের কিছু উৎপন্ন বৃদ্ধি হওয়া ভিন্ন উপায়ন্তর নাই। অতএব আমরা ভরসা করি সকলেই এখন কৃষি কার্য্যে মনোযোগ করিবেন এবং কৃষি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নৃত্যগোপাল বাবুর কৃষিতত্ত্ব অবলম্বন করিয়া কৃষি কার্য্যের উন্নতি বিধানে যত্নবান হইবেন। স্বদেশ হিতৈষী জমীদারগণ এবং প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্টের এখন এদেশীয় কৃষির উন্নতি পক্ষে মনোযোগ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। অতএব তাঁহারা কৃষি তত্ত্বের প্রকাশককে উৎসাহ দান করিতে আরম্ভ করুণ।

আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৪ ফাল্গুণ, ১২৮৫ সাল।

An Extract from " **Bundur** *" of the month of Choitro.*

"কৃষিতত্ত্ব। মাসিক পত্রিকা। পাইকপাড়া নর্শারি হইতে প্রকাশিত।"

আমরা দুর্ভাগ্যবশতঃ এই পত্রিকাখানির প্রথম সংখ্যা দেখিতে পাই নাই। কিন্তু ইহার দ্বিতীয় সংখ্যা মাত্র পড়িয়াই আমরা নিরতিশয় প্রীতিলাভ করিলাম। আমাদিগের বিবেচনায় ইহার কলেবর পরিবর্দ্ধিত হওয়া কর্ত্তব্য, এবং বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রই এইরূপ প্রয়োজনোপযোগী সাময়িক পত্রিকার আদর হওয়া উচিত।

---

৮ ম হইতে ১২ শ সংখ্যা।

কৃষিতত্ত্ব।

মাসিক পত্রিকা।

দ্বিতীয় খণ্ড।

" কৃষির্ধন্যা কৃষির্মেধ্যা জন্তূনাং জীবনং কৃষিঃ "।

ভাদ্র হইতে পৌষ ১২৮৭

পাইকপাড়া নর্শরি হইতে প্রকাশিত।

সূচী।

কলিকাতা।

১৬৭ নং, কর্ণোয়ালিস ষ্ট্রীট,—কর প্রেসে

শ্রীঅধর নাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

আমি কয়েক মাস হইতে বিশেষরূপ অসুস্থ ছিলাম। তজ্জন্য কৃষিতত্ত্ব নিয়মিত রূপে প্রকাশ করিতে পারি নাই। অধিকন্তু আমার তত্ত্বাবধারণের ত্রুটিবশতঃ প্রকাশিত কৃষিতত্ত্বের অনেক স্থলে কোন কোন বিষয়ের ভুল ঘটিয়াছে। ঈশ্বর কৃপায় আমি সুস্থ হইয়া কৃষিতত্ত্ব সম্বন্ধে যেরূপ সুবন্দোবস্ত করিয়াছি, আশা করি ভবিষ্যতে আর কোন প্রকার গোলযোগ ঘটিবে না। গত কয়েক মাসের কৃষিতত্ত্বের যে যে স্থানে ভ্রম প্রমাদ আছে, তাহা সংশোধন করিয়া অবিলম্বে গ্রাহকগণের নিকট প্রেরিত হইবে।

সন ১২৮৬ সালের মাঘ হইতে ৮৭ সালের পৌষ পর্য্যন্ত কৃষিতত্ত্বের দ্বাদশ সংখ্যা সমাপ্ত হইল। মাঘ মাস হইতে পুনরায় নূতন সংখ্যা বাহির হইবে। গত বৎসরের দ্বাদশ সংখ্যার সূচীপত্র শীঘ্র গ্রাহকগণ প্রাপ্ত হইবেন। আমরা গ্রাহকগণের নিকট এক বৎসরের জন্য যে ঋণী ছিলাম, তাহা হইতে বিমুক্ত হইলাম। এক্ষণে গ্রাহকগণের নিকট এই প্রার্থনা যাঁহাদিগের নিকট গত বৎসরের মূল্য পাওনা আছে, তাঁহারা স্ব স্ব দেয় এবং বর্ত্তমান সনের অগ্রিম মুল্য—৩৵০ আনা সত্বর প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন। এই সামান্য বিষয়ের জন্য গ্রাহকগণের নিকট বারম্বার পত্র লেখা যারপর নাই লজ্জার বিষয়।

.ারু শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন গত কয়েক মাস কৃষিতত্ত্ব নিয়মি রূপে প্রকাশিত না হওয়ায় কেহ যেন স্বপ্নেও না ভাবেন কৃষিতত্ত্বের জী শেষ হইল। আমরা দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত বলিতে পারি, পাইক পা নর্ণরির জীবন থাকিতে কৃষিতত্ত্বের জীবনী শক্তি কোন ক্রমেই বিনষ্ট হই না। এখন হইতে নিয়মিত রূপে কৃষিতত্ত্ব গ্রাহকগণের নিকট প্রেরিত হইবে

কৃষিতত্ত্বের মূল্য টিকিট না পাঠাইয়া আমার নামে কলিকাতা পো অফিসে মণি অর্ডার পাঠাইয়া দিবেন। টিকিট পাঠাইলে কি টাকায় আনা হিসাবে কমিসন স্বতন্ত্র দিতে হইবে।

কৃষির উন্নতি সাধন।

কৃষি কার্য্যের উন্নতি করিতে হইলে, দেখা উচিত ইহার মূলে কোন্ কোন বিষয়ের অভাব রহিয়াছে। এবং কি কি উপায় অবলম্বন করিলে সেই সকল অভাব বিমোচন করিতে পারা যায়। পূর্ব্ব অপেক্ষা এখন যে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি অনেকাংশে হ্রাস হইয়া আসিতেছে, তাহা সকলেই দেখিতেছেন। এতদ্দেশে কৃষির অবনতি সম্বন্ধে ভারত বর্ষীয় এগ্রিকল্‌চার সোসাইটীর কার্য্য বিবরণ পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে যেরূপ মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে, সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে তাহা প্রকটিত হইল।

ভারত বর্ষেয় কৃষি কার্য্যের প্রধান দোষ এই যে কৃষকেরা ভূমিতে উত্তম রূপে সার দেয় না। গোবর প্রায় জ্বালানিতে ব্যবহার করিয়া থাকে। গোবরের সহিত খড় ও বিচালী মিশ্রিত করিয়া যে সার প্রস্তুত করিতে হয় তদ্বিষয়ে অনেকে চিন্তাই করে না। ভূমিতে যে খড় ও বিচালী উৎপন্ন হয়, তাহা প্রায় বিক্রয় করিয়া থাকে; গবাদি উত্তম রূপ রাখিবার জন্য কেহই তাহা গো শালায় বিছাইয়া দেয় না। কৃষি ব্যবহার্য্য পশু দিগের খাদ্যের জন্য কোন বিশেষ ঘাস উৎপাদনের রীতি এদেশে প্রচলিত নাই। আমাদিগের বিবেচনায় দেশ মধ্যে গিনি ঘাসের চাস আরম্ভ হইলে, গবাদি পশুর খাদ্যের কোন অভাব থাকে না। গোরু বলবান ও তেজস্কর হইলে কেবল যে কৃষি কার্য্যের উপকারে আসিবে এরূপ নহে; দুগ্ধ ঘৃত প্রভৃতি উপাদেয় দ্রব্য ও প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতে থাকিবে। উক্ত সোসাইটী ইহাও ব্যক্ত করিয়াছেন, ইয়ুরোপীয় বলদ সমূহ যদিও এত দ্দেশীয় বলদ অপেক্ষা আকারে বৃহৎ; কিন্তু যদি এ দেশে গবাদির খাদ্যের ভালরূপ ব্যবস্থা করা যায়, তবে ঐ সকল বলদ অপেক্ষা দেশীয় গোরু দ্বারায় সুন্দররূপ কাজ চলিতে পারে। গ্রীষ্ম কালে প্রখর রৌদ্রের সময় দেশীয় গোরু যেরূপ পরিশ্রম ও কষ্ট সহ্য করিতে পারে, ইয়ুরোপীয় গো সকল কোন অংশেই উহাদিগের সম কক্ষ হইতে পারে না। এ দেশের বায়ু এ দেশীয় পশুদিগেরই উপযুক্ত।

কৃষক দিগের মধ্যে শিক্ষিত লোক কেহই নাই। তাহারা পরম্পরাগত প্রণালী অনুসারে চাস করিয়া আসিতেছে, সুতরাং কৃষিকার্য্যের উন্নতি সম্বন্ধে কোন রূপ নূতন তত্ত্ব তাহাদিগের দ্বারা প্রকাশিত হইবার কোন সম্ভবই নাই। প্রকাশ হওয়া দূরে থাকুক, কোন নূতন প্রণালীর কথা বলিলে হয় তো অনেকে বুঝিয়া উঠিতেই সমর্থ হয় না। ইয়ুরোপ আমেরিকা প্রভৃতি দেশে শিক্ষিত সম্প্রদায় যে রূপ কৃষিকার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছেন, যতদিন পর্য্যন্ত এ দেশে কৃতবিদ্য লোক সকল ইহাতে প্রবেশ না করিবেন ততদিন ইহার উন্নতির কোন আশা করা যাইতে পারে না।

অনেকের মনে এই অন্ধ বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে যে স্বহস্তে হল চালনা না করিলে কৃষি কার্য্য চলিতে পারে না। সুতরাং ভদ্র লোক দ্বারা উহা কখনই অবলম্বিত হইতে পারে না। যাঁহাদিগের মনে এই কুসংস্কার আবদ্ধ আছে, তাঁহাদিগের একবার দেখা উচিত, এতদ্দেশে যে সকল নীলকর, চাকর সাহেবেরা চাস আবাদ করিতেছেন, তাঁহারা কি স্বহস্তে হল চালনা করিয়া থাকেন! কোম্পানির বাগানে যে সকল মহা মহোপাধ্যায়ী পণ্ডিতগণ কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধন জন্য মস্তিষ্ক আলোড়িত করিতেছেন, তাহারা কি সকলেই অভদ্র শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত? নির্দ্দোষ, নির্দ্দোষ আমোদজনক কৃষিকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া পরপদলেহন, দাসত্ব বৃত্তিই কি আমাদের ভদ্রতা রক্ষণের এক মাত্র অবলম্বনীয়? দেশের লোকের কি বিপরীত বুদ্ধি যাহা স্বাধীন, নির্দ্দোষ, লাভজনক তাহা ভদ্রলোকের পরিত্যজ্য আর যাহাতে মান হানি, জীবন বিক্রয়, পরমায়ু শেষ সেই ঘৃণিত, লাঞ্ছিত কাপুরুষোচিত হীন দাসত্ব বৃত্তিই কি ভদ্র লোকের যোগ্য, ভদ্র লোকের উপাস্য দেবতা, ভদ্র লোকের মাথার মণি শিরোধার্য্য! সভ্যতা সূর্য্য যখন ভারত আকাশে সমুদিত ছিল, ভদ্রতার জীবন্ত বীজমন্ত্র যখন ভারতবাসীদিগের অস্থিতে অস্থিতে খোদিত ছিল, পুরুষত্ব অমূল্য রত্ন যখন আর্য্য ঋষিদিগের হৃদয় ভাণ্ডারে পরিপূর্ণ ছিল, তখন ভারতবাসী আর্য্যগণ কৃষিকার্য্যে ও উদ্ভিদ্‌তত্ত্বে মনোনিবেশ করিতে অপমান জ্ঞান করিতেন না। উদ্ভিদজগতে প্রবেশ করিয়া তাঁহারা কত পরিশ্রম, কত যত্ন, কত অধ্যবসায় প্রকাশ করিয়াগিয়াছেন,

তাহা "কৃষি পরাশর", কৃত্যরত্নাকর, অগ্নিপুরাণ, মনুসংহিতা, ব্রহ্মপুরাণ, অমরকোষ অভিধানের বনপর্ব্ব এবং আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রীয় উদ্ভিদদিগের গুণ নির্ব্বাচন দেখিলেই হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে।

কএক বৎসর হইতে দেখা যাইতেছে রাজপুরুষগণ কৃষির উন্নতি সংকল্পে মধ্যে মধ্যে স্থানে স্থানে দুই একটী কৃষি প্রদর্শিনী মেলা সংস্থাপন করিয়া কৃষকদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু যে প্রণালীতে মেলা হইয়া থাকে তদ্দ্বারা উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ না হইয়া তদ্‌পরিবর্ত্তে কতকগুলি টাকার শ্রাদ্ধ করা হইয়া থাকে। সুশিক্ষা ব্যতীত কোন বিষয় মার্জ্জিত বা উন্নতি-বর্দ্ধক হইতে পারে না। অতএব অগ্রে কৃষি প্রদর্শিনী মেলা না করিয়া কৃষি শিক্ষোপযোগী বিদ্যালয় সকল দেশ মধ্যে সংস্থাপিত হওয়া আবশ্যক। ঐ সকল বিদ্যালয়ের সঙ্গে এক একটী কৃষি ক্ষেত্র সংযোজিত করিয়া ছাত্রদিগকে শিক্ষা দান করিলে অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে। শিক্ষাদানার্থে বৎসর বৎসর রাজকোষ হইতে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়িত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু সমধিক দুঃখের বিষয় এই যে জীবিকা নির্ব্বাহের ভিত্তিস্বরূপ যে কৃষি তদ্বিষয়ে কিছুই ব্যয় হয় না বলিলেও বড় অত্যুক্তি হয় না। দেশমধ্যে কোন বিষয়ের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে হইলে তাহা রাজার উৎসাহের উপর নির্ভর করে। আজ যদি রাজপুরুষগণ কৃষির উন্নতি জন্য বড় বড় পদ, নানা প্রকার বৃত্তির সৃষ্টি করেন, কাল দেখিতে পাইবে, বঙ্গবাসীগণ সভ্যতা, ভদ্রতা, জাত্যাভিমান প্রভৃতি যে সকল আপত্তি করেন, তাহার মস্তকে পদাঘাত পূর্ব্বক সেই কৃষিকেই মহাগৌরব জ্ঞান করিয়া পঙ্গপালের ন্যায় কৃষি কৃষি করিয়া ধাবিত হইবেন। জীবনাপেক্ষা গৌরব কর যে ধর্ম্ম সেই ধর্ম্মের বন্ধন ছিন্ন করিয়া আর্য্যসন্তানগণ যখন স্বহস্তে শবচ্ছেদ প্রভৃতি নানা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন যে উৎসাহ ও সম্মান পাইলে শিক্ষিতগণ কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন না ইহা কোন মতে বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। দেশীয় ভ্রাতৃগণের কেমন একটা সংক্রামক রোগ হইয়া উঠিয়াছে যে আপনাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম আপনারা নির্ব্বাচন করিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত না হইয়া অন্যের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকেন এই যে

চারিটী উদরান্নের নিমিত্ত হা অন্ন যো অন্ন করিয়া গোলামী করিতেছেন, আত্মীয় স্বজন পরিবারবর্গের ক্লেশ দেখিয়া দিবানিশি চক্ষের জলে পৃথিবী সিক্ত করিতেছেন, দারিদ্র দশার দীপ্তশিখায় শরীরের এক একখানি অস্থি ভস্ম করিতেছেন, তাহাও ভাল তত্রাপি কৃষিকার্য্যে মন দিবেন না। আমরা চক্ষের উপর দেখিতেছি সভ্যতাভিমানী বাবু ভায়ারা ছেকড়া ঘোঁড়ার ন্যায় আট্‌টার মধ্যে চারিটি দানা পাণি খাইয়া দাসত্বের ভার মস্তকে লইয়া প্রভুর সেবার জন্য ছুটিতেছেন। সমস্ত দিবস আফিসে গায়ের রক্ত জল করিতেছেন, এই সকল আরামের উপর আবার প্রভুর অমৃতবর্ষী গালি খাইয়া জীবন যাপন করিতেছেন, তাহাও ভাল তত্রাপি স্বাধীন কৃষিতে বাঙ্গালি প্রবৃত্ত হইবেন না যত্দিন পর্য্যন্ত এই রোগের প্রতীকার না হইতেছে ততদিন দেশের মঙ্গলের আশা দূরাশা মাত্র! এই রোগ নিবারণের একটী ঔষধ আছে; আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বঙ্গবাসিগণ স্বয়ং কোন কার্য্য করিতে ইচ্ছুক নহেন, রাজপুরুষগণ যত দিন না ইহাতে উৎসাহ প্রদান করিবেন ততদিন আমরা সহস্র চীৎকার করিলেও কিছু হইবে না। অতএব হে অভীষ্ট দেব গৌরাঙ্গ পুরুষ! তুমি একবার এই হতভাগ্যদিগের কর্ণে কৃষিকার্য্যে অনুরক্তি রূপ মুলমন্ত্র প্রদান কর।

কৃষি সম্বন্ধে ভূত পূর্ব্ব গবর্ণর জেনরল মৃত মহাত্মা উইলিয়ম বেণ্টিক মহোদয় যেরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, আবশ্যক বোধে তাহা আমরা এস্থলে উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম। ১৮৩৫ সালের ৮ই এপ্রেল তারিখে ৭৫ সংখ্যক পত্র দ্বারা ভারতবর্ষীয় এগ্রিকলচার সোসাইটীর মেম্বরদিগকে লিখিয়াছিলেন, "ভারতবর্ষে আগমনের পূর্ব্বে অনেক বৎসরাবধি আমি কৃষিকার্য্যে অনুরক্ত ছিলাম। কিন্তু সমধিক দুঃখের বিষয় এই এখানে আসিয়া নানা প্রকার কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় আপনাদিগকে বিশেষ সাহায্য করিতে পারি নাই; এই সাহায্য দানে ত্রুটি বশতঃ কেবল যে গবর্ণমেণ্টের ক্ষতি হইয়াছে এরূপ নহে, তদ্বারা কৃষিকার্য্যে অভিজ্ঞতা লাভ সম্বন্ধে আমার নিজেরও প্রভূত অনিষ্ট হইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষে অন্যান্য বিদ্যার চর্চ্চা যেরূপ সংকীর্ণ

কৃষিবিদ্যার অনুশীলনও তদ্রূপ দেখিয়া আমি যারপর নাই দুঃখিত হইলাম। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই যে দরিদ্রতা, অপকৃষ্টতা, ও অপমানিতা দৃষ্ট হয় তাহার একমাত্র কারণ দেশমধ্যে, ঐ সকল বিদ্যার সম্যক আলোচনা না হওয়া। আমার এই বিশ্বাস ইংলণ্ডে যেমন বিদ্যোন্নতি দ্বারা কৃষির শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে, এতদ্দেশেও সেই রূপ সুনিয়ম অবলম্বিত হইলে কৃষির উৎকর্ষ সংসিদ্ধ হইবে। যদ্যপি ভারতবর্ষে আমার আর কিছুকাল থাকা হইত, তবে মানস ছিল পশ্চিম, মধ্য এবং বঙ্গদেশে কৃষি শিক্ষার্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্যান সকল প্রস্তুত করাইয়া তাহাতে কৃষি ও নানা ফসলের উপদেশ এবং কার্য্যপ্রণালী শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা সকল ধার্য্য করিতাম। ঐ সকল উদ্যান দ্বারা এক একটী পাঠশালার ন্যায় কার্য্য সাধিত হইত এবং তথা হইতে উত্তম উত্তম বৃক্ষের কলম ও বীজ সর্ব্বত্র বিতরণ করিয়া দেশমধ্যে কৃষির প্রচার করিতাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই কার্য্যটী প্রজা সাধারণের বিদ্যাশিক্ষার মুখ্য অঙ্গ স্বরূপ জ্ঞান করিয়া গবর্ণমেণ্ট বৎসর বৎসর ইহাতে অর্থব্যয় করিলে প্রভূত উপকার হইতে পারে। এদেশের ভূমি, কৃষি, জমীদার এবং প্রজাদিগের উন্নতি করিবার জ্ঞান ও উপায় গবর্ণমেণ্টের হস্তে ন্যস্ত আছে। যদ্যপি প্রজাদিগের উপকারার্থে না হউক, তথাপি ইহাও মনে করা উচিত যে প্রজাদিগের সুখ ও উন্নতিতে গবর্ণমেণ্টের লাভালাভ নির্ভর করিতেছে, অতএব এ জন্যও কৃষি-কার্য্যে মনোযোগী হওয়া গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

বেনিলা মসলা।

আমরা অদ্য পাঠকবর্গকে একটী নূতন উপাদেয় গাছের পরিচয় দিব। বিশ্বরচয়িতা পরমেশ্বর কত স্থানে কত অদ্ভুদ্ রমণীয় বৃক্ষ লতা, গুল্ম সৃষ্টি করিয়া অপার দয়ার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অবগত হইলে মনে অনির্ব্বচনীয় আনন্দরস সঞ্চারিত হয়; এবং বিশ্ব শ্রষ্টার শিল্প-নৈপুণ্য

ও মহিমা দেখিয়া তাঁহার প্রতি ভক্তি প্রবাহ স্বতঃই প্রবাহিত হইতে থাকে। পরমেশ্বর উদ্ভিদ্ জগতে যে কত বিচিত্র ব্যাপার প্রদর্শন করিয়াছেন, তদ্বিষয় আলোচনা না করিলে সে সুখের মধুরতা অনুভব করিতে পারা যায় না। উদ্ভিজ্জ তত্ত্ব সামান্য বিষয় বলিয়া যাঁহাদিগের বিশ্বাস, তাঁহাদিগের পক্ষে যে একটী নির্ম্মল সুখের ভাণ্ডার চিররুদ্ধ তাহা বলা বাহুল্য।

পাঠক তুমি নানা প্রকার মসলা উপভোগ করিয়াছ; আজ তোমার ভোগ বিলা-সিতা চরিতার্থ করিবার জন্য এই বেনিলা মসলার তত্ত্ব তোমার গোচর করব। কএক বৎসর অতীত হইল, আমেরিকা মহাদেশ হইতে বেনিলার চারা এদেশে আনীত হয়। দক্ষিণ আমেরিকার অনেক স্থানে এই গাছ স্বতঃই জন্মিয়া থাকে। উদ্ভিদ্ বিদ্যা বিশারদ পণ্ডিতেরা এই চারাকে "বেনিলা আরমেটীকা" অথবা "বেনিলা প্লেন সোলিয়া" এই নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। বেনিলার ফল বা সুঁটী দ্বারাই খাদ্যদ্রব্য সুগন্ধীকৃত হইয়া থাকে। এই ফল বা সুঁটী দশ ইঞ্চ পর্য্যন্ত লম্বা হয়। গাছ হইতে যখন ফল তোলা যায় তখন উহা হরিদ্রাবর্ণ থাকে, পরে কৃষ্ণবর্ণ হয়। বেনিলা ফলের উপরিভাগ কোঁকড়ান, গর্ভ বালুকার ন্যায় প্রচুর বীজে পরিপূর্ণ। ফল ছাড়াইয়া উক্ত বীজ প্রস্তুত করিয়া তদ্বারা খাদ্য দ্রব্য সুবাসিত ও সুমিষ্ট করিতে হয়। মিষ্ট সুরা, বরফের কুল্‌পী, মিঠাই প্রভৃতি মিষ্ট দ্রব্য ইহা দ্বারা সুবাসিত করা হইয়া থাকে।

বেনিলার ফল সুপক্ক হইলে, গাছ হইতে তুলিতে হয়। ফল তুলিয়া তাহা শুষ্ক করিবার জন্য কএক ঘণ্টা রৌদ্রে রাখিতে হয়। ফল হইতে রস বাহির হইলে পশমি কাপড়ে জড়াইয়া দিতে হয়, এইরূপ করিলে ফলের ঘাম মরিয়া যায়। ঘাম মরিলে পর দিন একবার রৌদ্রে দিয়া তুলিয়া রাখিলেই ব্যবহারোপযোগী হইয়া থাকে।

বেনিলা গাছের ডাল লতানিয়া হয়। এক একটী ডাল ২০ ফিটের অধিকও লম্বা হইয়া থাকে, যে সকল বৃক্ষের ছাল খসখসে তাহার নিকট বেনিলা গাছ রোপণ করিতে হয়, এরূপ স্থানে রোপণ করিবার কারণ এই যে বেনিলার লম্বা ডাল বৃক্ষের গায়ে উত্তমরূপ জড়িত হইয়া থাকিতে

পারে, এবং কলম করিবারও উত্তম সুবিধা হইয়া থাকে। সোসাইটীর বাগানে মেং মেক্‌মোরি সাহেব বেনিলার আবাদ করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। তিনি যে প্রণালীতে বেনিলা রোপণের ব্যবস্থা দিয়াছেন তাহা আমরা এস্থলে প্রকাশ করিতেছি।

"বেনিলার স্বভাব এই যে বাহিরে খোলা জায়গায় থাকিলে ঐ গাছের প্রত্যেক গাঁইট হইতে শিকড় বাহির হয়, ইহাতে যে সকল লোকের চাস কর্ম্ম ব্যবসা নহে, তাহারাও দেখিবা মাত্র বুঝিতে পারে ছায়া যুক্ত স্থানে ঐ গাছ রোপণ করিলে ভাল হয়। পরন্তু যদি খোলা জায়গায় রোপণ করা যায় এবং গোড়া হইতে জল বাহির করিবার পথ থাকে তাহা হইলেও ঐ গাছ অতিশয় তেজাল হইতে পারে। যে স্থানে ভাল রূপ বাতাস লাগে এরূপ স্থানে রোপণ করিলে আরও ভাল হয়। গাছের লতানিয়া স্বভাব প্রযুক্ত তাহার নিকট এবড়ো ছাল ওয়ালা গাছ, অথবা বাঁশ পুঁতিয়া কিম্বা মাচা করিয়া দিতে হয় তাহাতে গাছের উপর ছায়া হইয়া থাকে। চুণ মাখা রাবিশ অথবা পুরাতন শুর্‌কী, কিম্বা ঐ প্রকার পোড়া মাটিতে চারিভাগের এক ভাগপচা পাতার সার মিশাইয়া মাটি তৈয়ার করিতে হয়। ঐ রূপ তৈযারী মাটি চৌক করিয়া তাহার উপরে রাশীকৃত করিয়া দিতে হয়, এরূপ করিয়া দিলে গাছে জল দেওয়া হইলে তাহা গড়াইয়া বাহির হইয়া পড়িতে পারে। পরন্তু বেনিলা রোপণের নিমিত্ত যে চৌকা করিতে হইবে তাহা তিন ফিট চৌড়া দুই ফিট উচ্চ হওয়া আবশ্যক। ঐ প্রকার জায়গায় গাছ রোপণ করিলে নূতন শিকড় বাহির হইয়া ভাল রূপে বসিতে পারে। গাছ বাড়িতে আরম্ভ হইলে নিকটস্থ বৃক্ষে, বা বাঁসে কিম্বা মাচায় তাহার ডগা বাঁধিয়া দিতে হইবে। বেনিলা গ্রীষ্ম কালে রোপণ করিয়া সপ্তাহ পর্য্যন্ত তাহাতে জল দিতে হয়। জল না দিলে গাছ ভাল করিয়া বাড়িয়া উঠিতে পারে না। যে সময় বেনিলার ফল বা শুঁটির নীচের বীচি হরিদ্রা বর্ণ হইবে সেই সময়েই ফল তুলিতে হয়। সকল বীচি হরিদ্রাবর্ণ হইবার অপেক্ষায় অধিক দিন গাছে রাখিলে, ফল অথবা শুঁটি ফাটিয়া পড়িবে তাহাতে গন্ধ নির্গত হওয়াতে ঐ সকল ফলে ভালরূপ কার্য্য দর্শে না।

উপসংহার কালে আমাদের বক্তব্য এতদ্দেশীয় কৃষি অনুরাগী ব্যক্তিগণ আপন আপন উদ্যানে এই মনোহর বেনিলা মসলার চাস আরম্ভ করিয়া দেশ মধ্যে ইহার বহুল আবাদ প্রচার করুণ। বেনিলা দ্বারা যে কেবল উদ্যানের শোভা সম্পাদিত হয় এমত নহে, প্রত্যুতঃ উহা বিক্রয় দ্বারা ধনাগমেরও একটী পথ পরিষ্কৃত হইয়া আইসে। আমেরিকা হইতে বৎসর বৎসর এই বহুমূল্যকর উৎকৃষ্ট মসলা ইয়ুরোপ ও ভারতবর্ষে বিক্রয়ার্থ আসিয়া থাকে। পরাধীন দাসত্ব পাদুকাধারী স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণ ধনাগমের এই সকল শত সহস্র উপায় থাকিতেও তাহাতে যে বিমুখ হইয়া চাকুরির জন্য লালায়িত হইয়া না না প্রকার লাঞ্ছনা ভোগ করেন, ইহা আক্ষেপের বিষয়।

কদলী বৃক্ষ।

" আট হাত অন্তর, এক হাত বাই
কলা পোঁতগে চাসা ভাই ;
কলা পুঁতে না কেটো পাত
তাইতে কাপড় তাইতে ভাত।"

কলা গাছ দ্বারা যে কত উপকার হয় তাহা কাহাকেও বুঝাইবার জন্য অধিক আয়াস পাইতে হয় না। ইহার উপকারিতা সকলেই যে এক বাক্যে স্বীকার করিবেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী অনুসারে কলার আবাদ হইয়া থাকে।

কলাগাছ রোপণ করিবার পূর্ব্বে ভূমির অবস্থার প্রতি একবার দৃষ্টি করা আবশ্যক; অর্থৎ কি প্রকার জমিতে গাছ পুঁতিলে সতেজ ও ফলবান্ হয়। অনেকে কহেন দোআঁশ মৃত্তিকাই কলা গাছ রোপণের উপযুক্ত ভূমি। প্রথমতঃ জমি লাঙ্গলদ্বারা উত্তমরূপ কর্ষণ করিতে হয়, তদনন্তর

মই দিয়া ঐ কর্ষিত ভুমির মৃত্তিকা সমান করিয়া লইতে হয়। এইরূপে জমি প্রস্তুত হইলে, আট হাত অন্তর এক হাত গভীর গর্ত্তে গাছ পুঁতিতে হইবে। গাছ সকল পুঁতিবার পুর্ব্বে এক দিন তুলিয়া রাখা আবশ্যক। সচরাচর বৈশাখ ও কার্ত্তিক মাসেই কলাগাছ পুঁতিয়া থাকে। বর্ষাকালেও কেহ কেহ কলার আবাদ করিয়া থাকেন। কিন্তু অনেকের মতে কার্ত্তিক মাসই গাছ পুঁতিবার প্রশস্ত সময়; কারণ বর্ষাতে গাছ পুঁতিলে গাছ পচিয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে। ছয় মাসের মধ্যেই কলা গাছে ফল ধরিতে আরম্ভ করে। অনেকে গাছ পুতিয়া কিছুদিন পরে গাছের গোড়া কাটিয়া দিয়া থাকেন। গাছের গোড়া কাটিয়া দিলে গাছগুলি ছোট ছোট আকারে হয়, চারা গাছের ফল দেখিতে অতি সুন্দর। গাছের গোড়া কাটিয়া দিলে একটী বিশেষ অনিষ্ট এই যে গাছ বাড়িয়া ফল ধরিতে অধিক সময় লাগে। সর্ব্বদা গাছের পাতা কাটিলে গাছ নিস্তেজ হইয়া যায় এবং ফল ধরিতে বিলম্ব হইয়া পড়ে। গাছের তলা পরিষ্কার রাখা ও মধ্যে মধ্যে খুঁড়িয়া দেওয়া উচিত। অনেকে দেখিয়াছেন, কোন কোন গাছের পাকা কলায় অনেক কাল কাল দাগ থাকে; উহাকে মশা খাওয়া কহে। বাস্তবিক মশা দাগের কারণ নহে। যে সকল গাছের তলায় তৃণ জন্মে উত্তম রূপ পাইট না হয়, সেই সকল গাছের কলায় ঐ রূপ দাগ হইয়া থাকে।

কলাগাছ পুঁতিলে কিছুদিন পরে ঐ গাছের মূল হইতে বিস্তর (তেউড) চারা জন্মিয়া থাকে। মূল গাছে ফল ধরিলে ঐ ফল সুপক্ক হইলেই গাছের গোড়া কাটা আবশ্যক। অনন্তর কিছুদিন অতীত হইলে, যখন মৃত্তিকা সংযুক্ত ঐ মূল পচিতে আরম্ভ হয়, তখন তাহা তুলিয়া ফেলা উচিত। মূল তোলা হইলে ঝাড়ে অধিক গাছ রাখা কর্ত্তব্য নহে। প্রত্যেক ঝাড়ে দুইটী করিয়া চারা রাখা আবশ্যক। ঝাড় ঘন হইলে গাছের ফলন অল্প হয় ও শীঘ্র গাছ সকল নিস্তেজ হইয়া পড়ে এবং ফল ছোট আকারে হইতে থাকে। কলা বাগানে আম কাঁঠালের চারা লাগাইলে অতি সহজেই উত্তম বাগান তৈয়ার হইয়া উঠে। বাগানে সর্ব্বদা পাইট করিলে উভয় প্রকার গাছেরই উপকার হইয়া থাকে।

কেহ কেহ কলা বাগানে বেগুণের চাস করিয়া থাকেন, তাহাতে উদ্যান স্বামীর লাভ ভিন্ন অনিষ্টের কোন কারণ দেখা যায় না।

কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে কলাগাছ দ্বারা বিস্তর লাভ হয়। যাহাদিগের কলার আবাদ আছে, তাহারা পাতা, থোড়, মোচা, কলা বিক্রয় দ্বারা বিলক্ষণ লাভ করিয়া থাকে। গৃহস্থ মাত্রেরই বাড়ীতে কলাগাছ থাকা অতীব আবশ্যক; বাড়ীতে গাছ থাকিলে যে কত সুখ তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। গাছের ফল হাতে করিয়া বিতরণ করায় যে একটী অনির্ব্বচনীয় আনন্দ, তাহাতে বঞ্চিত থাকা নিতান্ত দুঃখের বিষয়।

কলা নানা জাতীয়; তন্মধ্যে এই কএকটী প্রধান। পিনাং, কাবেলী, রামকেলী, মর্ত্তমান, কানাইবাঁশী, মোহনবাঁশী, চাঁপা, চিনিচাঁপা, কাঁঠালী, অনুপান ইত্যাদি। ইহাদিগের মধ্যে পিনাং অতীব উৎকৃষ্ট কলা। ইহার সুঘ্রাণ ও সুমিষ্টতার পরিচয় যিনি একবার পাইয়াছেন, তিনি কখনই তাহা ভুলিতে পারিবেন না। এমন কি সুস্বাদু ও সুমিষ্টতা জন্য ইহার খোসা ফেলিয়া দিতেও কষ্ট বোধ হয়। কলাতে যে দেবতা তুষ্ট যিনি ইহার আস্বাদন পাইয়াছেন, তিনিই তাহার অর্থ বুঝিতে পারেন। এ কলার গাছ পিনাং হইতে বহু যত্নে ও বহু ব্যয়ে পাইকপাড়া নর্শরিতে আনীত হইয়াছে। কাবেলী ও রামকেলী পিনাংঙ্গের নিম্নেই আসন পাইবার যোগ্য। ইহাদিগের মধুরতা ও সৌন্দর্য্য এবং বৃহৎ আকার, দর্শন করিলে হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হয়।

সোণা মুখী।

সোণামুখী অনেকেই দেখিয়াছেন, কিন্তু কি প্রকারে ইহার আবাদ করিতে হয়, কোন্ প্রকার ভূমি ইহা রোপণের উপযুক্ত তদ্বিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে অনেকেই নিরুত্তর থাকেন। আমরা সর্ব্বদা যে সকল দ্রব্য ব্যবহার করিয়া থাকি, তদ্ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ থাকা নিতান্ত দুঃখের

বিষয়। ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি সুসভ্য জনপদে কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধন জন্য যেরূপ চেষ্টা হইতেছে, তাহা পাঠ করিলে আশ্চর্য্য বোধ হয়। ঐ সকল সুসভ্য দেশের কত শত কৃতবিদ্য যুবক কৃষির উন্নতি সংসাধন জন্য জীবন উৎসর্গ করিতেছেন। তাঁহাদের চেষ্টা ও যত্নে কত নূতন নূতন বৃক্ষ, লতা, নানা প্রকার শস্য এদেশে আনীত হইয়াছে, এবং ভারত বাসী জন সাধারণ যাহাতে কৃষিকার্য্যে মনোনিবেশ করেন তজ্জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিতেছেন। কৃষিকার্য্যের শ্রীবৃদ্ধি ও দেশ মধ্যে বহুল প্রচার জন্য তাঁহারা সময়ে সময়ে যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়া থাকেন, তাহা পাঠ করিলে সাধারণের উপকার হইবে এই বিশ্বাসে অদ্য বোম্বাই প্রেসিডেন্সির কোম্পানির বাগানের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ডাক্তার গিবসন সাহেবের লিখিত সোণামুখীর চাস বিষয়ক প্রস্তাব অবলম্বন করিয়া এই প্রস্তাব লিখিত হইল।

কোন্ প্রকার জমিতে সোণামুখীর উত্তম আবাদ হয় তদ্বিষয়ে কৃষি-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত দিগের নানা প্রকার মত ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। ডাক্তার ওয়াইট বলিয়াছেন অধিক কঙ্করময় চর ভূমিতে আবাদ করিলে যথেষ্ঠ সোণামুখী উৎপন্ন হইতে পারে। কাল মৃত্তিকায় সময় বিশেষে অর্থাৎ বর্ষা কালে গাছ বড় বাড়ে না।

ঢালু অর্থাৎ গড়ানিয়া ভূমিতে সোণামুখীর চাস করিলে উত্তম আবাদ হইতে পারে। ঐ প্রকার ভূমি চাসের উপর্যুক্ত তাহার কারণ এই যে বৃষ্টির জল গাছের গোড়ায় জমিয়া গাছ নষ্ট করিতে পারে না। সোণা-মুখীর গাছের গোড়ায় জল সঞ্চিত হইলে গাছের বিশেষ অনিষ্ঠ সাধন করিয়া থাকে। এজন্য তদ্বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকা আবশ্যক। উপরে লিখিত ভূমি নির্ব্বাচন করিয়া তাহাতে দুই তিন বার উত্তমরূপে লাঙ্গল দিয়া কর্ষণ করিতে হইবে। সোণামুখীর জমিতে যত অধিক পরিমাণে সার দেওয়া যাইতে পারে, ততই উপকার। যদি ঐ জমিতে পূর্ব্ব বৎসরের ফসলের পচা গোড়া থাকে তবে জমির উর্ব্বরতা শক্তি সমধিক বৃদ্ধি পায়।

রোপণ প্রণালী।

রোপণ প্রণালী—বর্ষার প্রারম্ভে সোণামুখীর বীজ রোপণ করিলে, শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি হইয়া সেপ্টেম্বর মাসে প্রথম কাটিবার যোগ্য হয়। সোণামুখীর বীজ রোপণ সম্বন্ধে নানা স্থানে নানা প্রকার উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে এই প্রণালীটী উৎকৃষ্ট বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে, অর্থাৎ চারিটা ফাঁপা বাঁশ পৃথক পৃথক দণ্ডায়মান করিয়া শিরোভাগ একত্রে বদ্ধ করিতে হয়, ঐ বংশ চতুষ্টয় ক্ষেত্রের আলগা মাটির উপর চাপিয়া বসাইলে একবারে চারিটা করিয়া গর্ত্ত হয়, ঐ সকল গর্ত্তে বীজ বপন করিলে বপন কার্য্যের বিশেষ সুবিধা হইতে পারে। ধান্যাদির ন্যায় সোনামুখীর বীজ ঘন করিয়া বপন করা উচিত, কারণ সকল বীজ হইতেই যে চারা বাহির হইবে এরূপ প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। রোপিত বীজের কতক অংশ নষ্ট হইয়া অবশিষ্ট যে পাতলা চারা বাহির হয় তদ্বারা অভিষ্টসিদ্ধ হইতে পারে। বর্ষাকালে অন্যূন তিনবার এবং অন্যান্য ঋতুতে চারিবার খুঁড়িয়া দিলেই যথেষ্ট হয়। গাছের গোড়া ভাল করিয়া খুঁড়া হইলে চারা সকল অল্প দিনের মধ্যে বাড়িয়া উঠে, এবং বর্ষার অবসান হইবামাত্র আগষ্ট মাসের শেষে অথবা সেপ্টেম্বরের প্রথমে একবার পাতা কাটা যাইতে পারে। এক প্রকার পোকা সেপ্টেম্বর মাসের কিছু পূর্ব্বে বা পরে পাতায় প্রবেশ করিয়া বিশেষরূপ অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে। এজন্য সর্ব্বদা সতর্ক থাকা উচিত, পোকা লাগিবার পূর্ব্বে পাতা কাটিলে কোন অনিষ্ট হইতে পারে না।

ডাক্তার রয়েল কহেন, গোড়া সহিত চারা কাটিয়া গেলে, পুনর্ব্বার ভূমিতে লাঙ্গল দিলেই চারা শীঘ্র বাড়িয়া উঠে। ডিসেম্বর মাসের পূর্ব্বে চারা কাটা উচিত নহে। কিন্তু কখন কখন দেখাযায় ভূমি—ও সময়ের গুণে ডিসেম্বর ও মে মাসের শেষে দুই তিনবার কাটিয়া আশানুরূপ ফল লাভ করা গিয়াছে। রয়েল সাহেব এক খণ্ড কঙ্করময় ভূমিতে পূর্ব্ব বৎসরের বোনা বীজের গাছ হইতে দ্বিতীয় ফসল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তৃতীয় বৎসরেও আর একটা ফসল পাইবেন এরূপ আশা করেন।

গাছ কাটা শেষ হইলে, ঐ সকল গাছ পরিষ্কৃত স্থানে রাখিয়া শুষ্ক

করিতে হইবে। এইস্থানে ৩৬ ঘণ্টার অধিক রাখিবার আবশ্যকতা নাই; রাত্রিকালে কোন প্রকার আচ্ছাদন দ্বারা উহা ঢাকিয়া রাখিতে হইবে, কারণ শিশির লাগিলে পাতাসকল কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায়। এইরূপে উত্তম শুষ্ক হইলে যষ্টি দ্বারা ডাল পালা হইতে পাতা সকল ঝরাইতে হইবে। এই উপায়ে যদি সকল পাতা ঝরিয়া না পড়ে তবে অন্য কোন প্রকারে ডাল পালা হইতে ঐ সকল পাতা বাচিয়া লইতে হইবে। প্রথমবার যষ্টির আঘাতে যে সকল পাতা ঝরিয়া পড়ে, তাহাদিগকে কুলায় করিয়া ঝাড়িতে হইবে, এইরূপ করিলে ক্ষুদ্র ও একানিয়া পাতা সকল পৃথক হইবে এবং জোড়া পাতা সকল কুলার নিম্নে পড়িয়া যাইবে। পাতা সকল কুলায় ঝাড়া হইলে, জোড়া পাতা পৃথক হইয়া আসিলে ঐ সকল পাতার শির ছাড়াইতে হইবে, শির বিহীন পাতা কা জর উপযুক্ত হইয়া থাকে। একজন স্ত্রীলোক গড়পড়্তা /৩ সের পাতার শির ছাড়াইতে পারে। এইরূপ শির শূন্য পরিষ্কৃত সোনামুখীর পাতা ঔষধের উপযুক্ত হইয়া থাকে। ডাক্তার ওয়াইটন সাহেব কহেন সূর্য্যকিরণে সোণামুখীর পাতা শুষ্ক করিলে গুণের কোন বৈলক্ষণ্য হইতে পারে না। গিবসন সাহেব ইহাও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, মেঘের সময় তিনি কতকগুলি সোণামুখীর পাতা বাতাসে শুকাইয়া ছিলেন, আর কতকগুলি পাতা কটাহে রাখিয়া শুষ্ক করিয়াছিলেন, তাহাতে পাতা সকল কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায়। এজন্য ওয়াইট্ সাহেবের প্রদর্শিত প্রণালীই উৎকৃষ্ট বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। কেহ কেহ গ্রীষ্মকালে উত্তাপ জন্য সোণামুখীর ক্ষেতে ৫।৬ বার জল দিয়া থাকেন। অনেক স্থলে দেখা গিযাছে ঐ জল দেওযার কোন প্রয়োজন হয় না কারণ শিকড় বিস্তৃত হইলে তদ্বারা ভূমির রস আকর্ষণ করিয়া গাছ সকল সতেজ হইতে থাকে। মেষের বিষ্ঠার সার দেওয়া ভূমিতে অতি উৎকৃষ্ট সোণামুখীর গাছ জন্মিয়া থাকে।

প্রত্যেক বিঘার অন্যূন প্রতি বৎসর ছয়মণ করিয়া সোণামুখীর পাতা পাওয়া যাইতে পারে। ডাক্তর ওয়াইট সাহেব কহেন দেড়ফিট্ অন্তর গর্ত্ত করিয়া বীজ রোপণ করিলে চারা উত্তম হইতে পারে।

গোলাপ।

প্রস্ফুটিত পুষ্পসন্দর্শন করিলে কাহার না হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হয়? কি বালক, কি যুবা, কি বৃদ্ধ, কি স্ত্রী, কি সভ্য কি অসভ্য জগতে এমত মনুষ্য নাই, যিনি পুষ্পের সৌন্দর্য্যে বিমোহিত না হয়েন। নিতান্ত শোক দুঃখে যাহার হৃদয় ঘনবিষাদে আচ্ছন্ন, সংসারত্যাগী সর্ব্বসুখ বর্জ্জিত যে উদাসীন, সৌন্দর্য্যপ্রিয় ভোগ বিলাসিতার শেখর আরোহী যে নবীন যুবা, পলিত চর্ম্ম, সংসার বিদায় উন্মুখ যে স্থবীর, ভগবদভক্ত ঈশ্বর পরায়ণ যে প্রেমিক পুষ্প দেখিলে কাহার না মন আকৃষ্ট হইয়া থাকে? রূপ রস গন্ধ স্পর্শ একত্রে সমাবেশ এমন রমনীয় পদার্থ সংসারে আর কিছুই নাই। অশেষ সৌন্দর্য্যের আধার পরমেশ্বরের পূর্ণ সৌন্দর্য্য পুষ্পেতে বিকসিত রহিয়াছে, ঈশ্বরের কি অসীম দয়া! কি ধন কুবের, কি শাকান্ন ভোজী পর্ণ কুটীর বাসী দরিদ্র ইচ্ছা করিলে, যত্ন করিলে সকলেই এই সুখের ভাণ্ডারের দ্বার উদ্ঘাটন করিতে পারেন। স্বহস্তে রোপিত পালিত পুষ্পের পুষ্পোদ্গম অবলোকন করিলে মনে বচনাতীত সুখের উৎস উৎসারিত হইয়া থাকে। পাঠক ঐ দেখ এই সুখের ভিখারিণী হইয়া আশ্রমবাসিনী, রাজাধিরাজ চক্রবর্ত্তী দুষ্মন্ত মহিষী শকুন্তলা অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদার সহিত পূর্ণ কলস কক্ষে লইয়া ঈষৎ বঙ্কিম ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া পুষ্পের আলবালে জল সেচন করিতেছেন, এ দিকে দেখ ইন্দ্রের অমরাবতীস্থিত নন্দন কাননের পারিজাত জন্য সত্যভমা স্বর্ণসিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া ধরাশায়িনী হইয়াছেন। সম্মুখে ঐ দেখ, ঈশ্বর ভক্ত যোগী ধ্যানস্তিমিত লোচনে ভক্তির সহিত পুষ্পাঞ্জলি ইষ্টদেবের চরণে অর্পণ করিতেছেন। হে পুষ্প সংসার মধ্যে তুমিই ধন্য!

পাঠক! চিরপরিচিত পুষ্প লইয়া তোমার নিকট যে এত বাচলতা প্রকাশ করিতেছি তজ্জন্য তুমি বিরক্ত হইতে পার। কিন্তু আজ তোমাকে একটী অসাধারণ পুষ্প দেখাইয়া তোমার সমুদায় বিরক্তিভাব দূর করিব। শীর্ষলিখিত গোলাপ এই শব্দ পাঠ করিয়া ইহা মনে ভাবিও না যে সামান্য গোলাপের পরিচয় দিয়া তোমার মূল্যবান সময় অপহরণ করিব।

আমাদের দেশে সকলেই গোলাপ ফুল দেখিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু গোলাপ যে কত প্রকার, কোন্ প্রকার গোলাপ কি নিয়মে রোপণ করিতে হয় তাহা অনেকে অবগত নহেন। গোলাপ নানা জাতীয়; তন্মধ্যে মণ্টিক্রুস্ট, মেরিরেডি, প্রেসিডেণ্টম্যাস্, গ্লো আর দি ডুসার, সাইমন্ সেন্‌জিন, লাফ্রাঙ্ক, এফিক্‌ডি নেস্‌ম্যাস, পেলিটিন্‌ডি কিন্‌ক্লিং এবং জি এস্তি বেতেল ইত্যাদি প্রধান। আমরা মণ্টিকৃষ্টের বিষয় উল্লেখ করিয়া আমাদের প্রস্তাব শেষ করিব। অন্যান্য গোলাপের বিষয় ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করিয়া পাঠকবর্গের ঔৎসুক্য পরিতার্থ করিব।

এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যত প্রকার গোলাপ প্রকাশিত হইয়াছে, মণ্টিক্রুষ্টের ন্যায় উৎকৃষ্ট গোলাপ আর দেখা যায় না। এই গোলাপের যে কত সৌন্দর্য্য, কত সৌরভের মাধুরী তাহা যিনি একবার দর্শন কিম্বা আঘ্রাণ না করিয়াছেন, তাঁহাকে ইহার পরিচয় দিয়া বুঝান বড় কঠিন ব্যাপার। বিশ্বপতি যেন অকাতরে সমুদায় সৌন্দর্য্য, সমুদায় পরিমল ইহাতে ঢালিয়া দিয়াছেন। উৎকৃষ্ট মকমলের ন্যায় দল সকল স্তবকে স্তবকে গ্রথিত হইয়া মণ্টিক্রুষ্ট একটী অপূর্ব্বশ্রী ধারণ করিয়া যেন জগতের চক্ষুকে আকর্ষণ করিতেছে। ইহার দল সকল বাস্তবিকই মকমলের ন্যায় অতি সুকোমল। উৎকৃষ্ট সাটিন বা মকমল হইতে যেমন চাকচিক্য বাহির হইয়া থাকে, ইহার প্রত্যেক দল হইতেই ঐ রূপ চাকচিক্য নিয়ত বাহির হইতেছে। প্রস্ফুটিত মণ্টিক্রুষ্টে সূর্য্যের কিরণ পতিত হইলে যে কি রমণীয় হয় তাহা ব্যক্ত করা যায় না। মণ্টিক্রুষ্ট বহুদল বিশিষ্ট পুষ্প; উহার প্রত্যেক দলের নিম্ন-প্রদেশ গাঢ় লাল; উপরিভাগ হইতে নানা মনোহর বর্ণের আভা বহির্গত হইতে থাকে। সকল ঋতুতেই মণ্টিক্রুষ্ট প্রস্ফুটিত হয়। কিন্তু পৌষ হইতে জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত প্রচুর পুষ্প ফুটিতে আরম্ভ হইতে দেখা যায়। বর্ষার সময় অল্প পরিমাণে পুষ্প ফুটিয়া থাকে। মণ্টিক্রুষ্টের গাছ অত্যন্ত ঝাড়াল। গাছের সমুদায় শাখা প্রশাখা হইতে যখন প্রচুর পুষ্প বহির্গত হয়, তখন উদ্যানের অতি চমৎকার শোভা হইয়া উঠে। এক একটী ফুল, গাছে অনেক দিন পর্য্যন্ত শোভা বিতরণ করে।

অন্যান্য গোলাপের ন্যায় মণ্টিক্রুষ্টেরও কলম করিতে হয়। একবার

একটী গাছ বাগানে তৈয়ার করিতে পারিলে, তাহা হইতে বিস্তর কলম হইতে পারে। উচ্চ অর্থাৎ টিকলো ভূমিতেই গোলাপ গাছ ভাল হইয়া থাকে। যেস্থলে জল জমে অর্থাৎ নাবাল জমিতে গাছ পুঁতিলে জল বসিয়া শীঘ্রই গাছ নষ্ট হইয়া যায়। গোলাপ ক্ষেতে খুদেনুলীর গাছ জন্মিলে গোলাপ গাছের বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। খুদেনুলীর গাছ থাকিলে অতিরিক্ত আর্দ্র জণিত মৃত্তিকায় গাছের কোন অপকার করিতে পারে না। গোড়ায় গোবরের সার দিলে গাছের তেজ বৃদ্ধি ও পুষ্টি-সাধন হয়। যত প্রকার সার আছে তন্মধ্যে গোবরের সারই গোলাপ মাত্রেরই উপকারী। কেহ কেহ এরূপ ব্যবস্থা দিয়া থাকেন; একটা পাত্রে গোবর গুলিয়া রাখিতে হয়; এবং ঐ গোবর মিশ্রিত জল থিতাইলে, বোমায় করিয়া গাছে দিলে শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া উঠে। বোমা না থাকিলে তাহার পরিবর্ত্তে একটা হাঁড়ির তলায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র করিয়া তদ্বারা জল দিলেও চলিতে পারে। অনেক গাছে কলসীতে করিয়া জল ঢালিয়া দেওয়া অপেক্ষা বোমায় করিয়া জল দিলে উপকার হইতে পারে! যে কোন গাছের চারার অবস্থায় বোমায় জল দেওয়াই প্রশস্ত। বোমায় জল দিলে চারা হেলিয়া নড়িবার কিম্বা শিকড় বাহির হইবার কোন আশঙ্কা থাকে না। কার্ত্তিক মাসে গোলাপ গাছ মাত্রেরই গোড়া খুঁড়িয়া শিকড়ে বাতাস ও রৌদ্র লাগান আবশ্যক। ৫।৭ দিনপর্য্যন্ত গোড়া আল্‌গা রাখিলেই যথেষ্ট। তাহার পর গোবরের সার দিয়া ঐ আল্‌গা গোড়া ঢাকিয়া উত্তমরূপে চাপিয়া দিতে হয়। সচরাচর বর্ষা কালে গোলাপ গাছের ডালপালা নষ্ট হইতে আরম্ভ হইয়া থাকে। যে সকল ডাল শুষ্ক বা নিস্তেজ হইয়া উঠে, সেই সকল ডাল বাছিয়া বাছিয়া কাটিয়া দিতে হয়। বৎসরের মধ্যে একবার ডাল কাটিয়া দিলে চলিতে পারে। বিলাতী এবং ভাল ভাল গোলাপ সমূহের পাইট কার্ত্তিক মাসের মধ্যে সারা আবশ্যক। কেবল মান্দ্রাজী, কেপ প্রভৃতি কএক জাতীয় গোলাপের পাইট বর্ষাকালে করিতে হয়। অধিকাংশ গোলাপ শীতকালে প্রস্ফুটিত হয় না।

(ক্রমশঃ)

---o---

গিনি ঘাস।

কি সহর কি পল্লীগ্রাম কোন স্থানে এখন পূর্ব্বের ন্যায় পতিত জমি দেখিতে পাওয়া যায় না। পূর্ব্বে অনেক জমিতে আবাদ হইত না, ঐ সকল পতিত ভূমিতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ঘাস উৎপন্ন হইয়া গবাদি পশুর খাদ্যোপযোগী তৃণ সংকুলান হইত। পতিত ভূমি না থাকায় গবাদি পশুর খাদ্য দিন দিন অতি দুর্মূল্য হইয়া উঠিতেছে। পূর্ব্বের ন্যায় হৃষ্ট পুষ্ট বলীবর্দ্ধ কিম্বা দুগ্ধবতী গাভী এখন আর দেখিতে পাওয়া যায় না। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের ন্যায় আমাদের দেশে কল দ্বারা ভূমি কর্ষিত হয় না। ভূমি কর্ষণ প্রভৃতি কার্য্য গবাদি পশুর উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং যাহাতে ঐ সকল পশু হৃষ্টপুষ্ট বলবান থাকে তদপক্ষে বিহিত বিধানে সচেষ্টিত থাকা একান্ত আবশ্যক। প্রাণী-মাত্রেরই বলাবল যে অধিকাংশ খাদ্যের উপর নির্ভর করে, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। অতএব যাহাতে কৃষিকার্য্যের উপযোগী পশুদিগের খাদ্য দেশমধ্যে সচ্ছল হয়, তদ্বিষয়ে মনোযোগী হওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। আমাদের বিবেচনায় এদেশে গিনি ঘাসেব চাস আরম্ভ হইলে ঐ অভাব পরিপূরণ এবং আয়েরও একটী পথ প্রকাশিত হইতে পারে। দক্ষিণ আমেরিকায় গিনি নামে একটী দেশ আছে, তথায় এই ঘাস উৎপন্ন হয় বলিয়া সেই দেশের নামানুসারে উহাকে গিনিঘাস কহিয়া থাকে।

দুই প্রকারে গিনিঘাসের চাস হইয়া থাকে। ডাঁটা কাটিয়া রোপণ অথবা বীজ বপণ দুই উপায়ে ঘাস জন্মাইতে পারে। ডাঁটা রোপণ অপেক্ষা বীজ বপণ প্রণালীই উৎকৃষ্ট, বিশেষতঃ বিদেশে চাস জন্য বীজ প্রেরণ পক্ষে এই উপায়টীই সুবিধাজনক। শ্রীযুক্ত উইলিয়ম কর হরি সাহেব ডাঁটা রোপণ করিয়া বহুকাল হইতে ইহার চাস করিয়া আসিতে ছিলেন; তাঁহার বিশ্বাস ছিল বীজ বপণ অপেক্ষা ডাঁটা রোপণ প্রণালীই উৎকৃষ্ট। অনন্তর ভারতবর্ষীয় এগ্রিকলচার সোসাইটীর ভূত

পূর্ব্ব সদস্য মেং মেকৃমোরি সাহেব তাঁহার সে বিশ্বাস দূর করেন। আমরা পাঠকবর্গের অবগতির জন্য এস্থলে উপরি উক্ত দুইটী প্রণালীই বিবৃত করিলাম।

যে ভূমি জল প্লাবিত না হয়, অথবা অন্যস্থানের জল আসিয়া তাহাতে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে না পারে, এরূপ ভূমি নির্ব্বাচন করিয়া তাহাতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সার দিতে হইবে; এইরূপ জমি তৈয়ার হইলে চারি পাঁচ অঙ্গুলি গাঁইট রাখিয়া ঐ পরিমিত স্থান অন্তর ইক্ষু রোপণের ন্যায় ডাঁটা সকল পুঁতিতে হইবে। যদি অনাবৃষ্টির সময় ডাঁটা রোপিত হয় তবে একবার তাহাতে জল দিলেই সপ্তাহের মধ্যে গাছ লাগিয়া যাইবে। পাতলা করিয়া ডাঁটা পুঁতিলে মধ্যে মধ্যে অন্যান্য ঘাস জন্মিয়া তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। প্রতি বৎসর এক জমিতে চাস না করিয়া দুই বৎসর অন্তর ভিন্ন ভিন্ন ভূমিতে চাস করিলে অধিক তৃণ জন্মিয়া থাকে। বৎসর বৎসর চারি পাঁচবার কাটিয়া লইয়া জমিতে জল দিলে পুনরায় কাটিবার উপযুক্ত হয়। ভাল জমিতে চাস করিলে পনর দিন অন্তর প্রচুর পরিমাণে ঘাস কাটিতে পারা যায়। একবিঘা জমিতে প্রায় ১১০০ শত মণ ঘাস সংগৃহীত হইতে পারে।

দ্বিতীয় প্রণালী অর্থাৎ বীজ বপণ করিবার নিয়ম। প্রাতঃকালে রৌদ্র না লাগে এমত একটী স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া তাহার মাটি উত্তমরূপ গুঁড়া করিয়া ঐ জমিতে প্রচুর পরিমাণে বীজ বপণ করিতে হইবে। বীজ বুনা হইলে গুঁড়া মাটি তাহার উপর ছড়াইয়া দিয়া বীজ সকল ঢাকিতে হইবে; রৌদ্র অধিক হইলে ক্ষেত্রে জল না দিয়া দরমা কিম্বা অন্য কোন আচ্ছাদন দ্বারা তাহা ঢাকিয়া রাখা আবশ্যক। অনন্তর চারা সকল তিন অঙ্গুলি পরিমাণে বর্দ্ধিত হইলে, অতি সাবধানে অর্থাৎ গোড়া কাটা না যায় এরূপ করিয়া মাটিশুদ্ধ তুলিয়া অন্য জমিতে দুই ফিট অন্তর রোপণ করিতে হইবে। প্রতি মাসেই গিনির বীজ বপণ করিতে পারা যায়। এই ঘাসের বিশেষ গুণ এই যে ইহা আহার করিলে পশুদিগের অত্যন্ত কান্তিপুষ্টি হয় এবং গবাদি পশুর দুগ্ধ মাখন প্রভৃতি অতি সুস্বাদু হইয়া থাকে। আমাদিগের এই অনুরোধ এতদ্দেশীয় জমিদারগণ

আপন আপন জমিদারীতে এই নূতন ঘাসের আবাদ আরম্ভ করিয়া পশুদিগের উপকার সংসাধন করুন।

পান।

" শতেক চাসে মূলা
তার অর্দ্ধেক তুলা ;
তার অর্দ্ধেক ধান
বিনা চাসে পান। "

ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই পানের আদর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার চাসে লাভ মন্দ নহে; ৩।৪ বিঘা জমিতে পানের চাস থাকিলে একটী গৃহস্থের জীবিকা নির্ব্বাহের সংস্থান হইতে পারে। অতএব এই লাভ জনক চাসে সকলেরই মন দেওয়া উচিত। আমাদের দেশের লোক সকল কেমন কুসংস্কার বিশিষ্ট যে অনেকেই পানের চাসে বিমুখ; তাঁহারা কহিয়া থাকেন বারুই জাতি ভিন্ন অন্যান্য জাতীয় লোকদিগকে ইহার চাস আবাদ করিতে নাই। এই অমূলক সংস্কারের কারণ যে কি তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। যখন ব্রাহ্মণদিগকে পলাণ্ডু রোপণ করিতে দেখা যায়, তখন পানের চাষ যে দোষজনক ইহা কোন মতেই স্বীকার করিতে পারা যায় না।

পান নানা জাতীয় দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে মণ্ডলঘেটে ও মঘাই পানই উৎকৃষ্ট। অতি যত্নের সহিত পানের চাস করিতে হয়। নিম্ন ভূমি অর্থাৎ যে জমিতে জল দাঁড়ায় এরূপ স্থানে পানের চাস করিলে গোড়ায় জল জমিয়া পানের লতা সকল পচিয়া যায়। এজন্য টিকোল ভুমি ঢালু করিয়া ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে হয়। দো আঁশ মৃত্তিকায় উৎকৃষ্ট পান হইয়া থাকে। পানের ক্ষেত্র উত্তমরূপ প্রস্তুত হইলে লম্বা করিয়া

দাঁড়া বাঁধিতে হয়, অনন্তর ঐ দাঁড়ায় ফাল্গুন কিম্বা চৈত্র মাসে পানের মূল কিম্বা ডগা রোপণ করিয়া দিতে হয়। পানের ক্ষেত্র সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিতে হয়। খৈলের সার পানের বড় উপকারী। গাছে সর্ব্বদা জল দেওয়া এবং পাতা ও ডগা সকল গোছাইয়া দেওয়া আবশ্যক। লতা উঠিবার জন্য দাঁড়ার ধারে জাফরী করিয়া দিতে হয়। অধিক রৌদ্রে, কিম্বা ঝটিকায় পানের অনিষ্ট হইয়া থাকে, এজন্য নানা প্রকার ক্ষুদ্র জাতীয় গাছ ক্ষেতের চতুর্দ্দিকে রোপণ করিয়া দেওয়া উচিত। ক্ষেত্রের উপরিভাগে খড়ি, খাঁকড়া, কেশে প্রভৃতির ঝাঁপ বাঁধিয়া ঢাকিয়া দিলে ঐ সকল হইতে গাছ রক্ষা পাইয়া থাকে। পাকা পান ব্যবহার যোগ্য, এই নিমিত্ত লতার ডগার পান না তুলিয়া গোড়া হইতে তুলিলে ভাল হয়।

সাধারণে পানের ক্ষেত্রকে বরজ কহে। পানের বরজে আম্র কাঁঠা-লের উত্তম বাগান তৈয়ার হইয়া থাকে। ঐ সকল গাছ তৈয়ার করিতে হইলে কোন রূপ কষ্ট পাইতে হয় না। পানের পাইটে তাহাদিগের পাইট হইয়া থাকে। ৪।৫ বৎসরের মধ্যেই বরজে আম কাঁঠালের চারা প্রস্তুত হইয়া উঠে। অনেক স্থানে এরূপও দেখা যায়। ভূস্বামী স্বতন্ত্র খাজনা না লইয়া পানের আবাদ কারীর সহিত এরূপ বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন যে ৪।৫ বৎসরের জন্য বিনা খাজনায় পানের চাস করিবে, কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যে ক্ষেত্রে এই পরিমাণে আম কাঁঠালের চারা তৈয়ার করিয়া দিতে হইবে। এরূপ বন্দোবস্তে আবাদকারী ও ভূস্বামী কাহারও কোন ক্ষতি হয় না অথচ অনায়াসে ব্যয়সাধ্য একটী উৎকৃষ্ট ফলের বাগান তৈয়ার হইয়া থাকে। অন্যান্য কৃষির ন্যায় পানের ক্ষেতে অধিক চাস দিতে হয় না। বোধ হয় এই জন্যই " বিনা চাসে পান " দেশ মধ্যে এই প্রবাদ বাক্য প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।

ওল ।

ওল একটী উৎকৃষ্ট তরকারী। ইহা যেমন সুস্বাদু ও সেইরূপ উপকারী। অনেক রোগে ওল পথ্য ও ঔষধের কার্য্য করিয়া থাকে। বিশেষতঃ ইহার সারকতা গুণ থাকাতে অর্শ রোগের একটী মহৎ ঔষধ।

বালুকা যুক্ত এঁটেল মৃত্তিকায় উৎকৃষ্ট ওল হইয়া থাকে। প্রথমতঃ জমি উত্তমরূপ খনন করিয়া মৃত্তিকা প্রস্তুত করিতে হয়। অনন্তর ঐ খনিত মৃত্তিকায় গোবর ও খোইলের সার দিয়া মাটি সকল গুঁড় কবিতে হইবে। এইরূপে মাটি প্রস্তুত হইলে, ক্ষেত্রে এক এক হস্ত ব্যবধান করিয়া আলী বা দাঁড়া বাঁধিতে হইবে ঐ সকল দাঁড়ার উপরে ১৫।১৬ অঙ্গুল অন্তর ওলের মুখী, বা বেঁজি (ইহাকে গাঁইটও কহে) পুঁতিতে হইবে। ফাল্গুন বা চৈত্র মাসে ওল পুঁতিতে হয়। বেঁজি হইতে গাছ বাহির হইলে মধ্যে মধ্যে গোড়া খুঁড়িয়া দেওয়া আবশ্যক ওল কচু প্রভৃতি উদ্ভিদের মূলের মৃত্তিকা শিথিল হইলে কাণ্ড সকল অনায়াসে বৃদ্ধি হইতে পারে। এক বৎসরের ওল খাদ্যের উপযোগী হয়। কিন্তু উহার আকার তত বড় হয়না। এজন্য অনেকে গাছ মরিয়া গেলে ওল তুলিয়া রাখে, এবং রোপণের সময় উপস্থিত হইলে, উহা পূর্ব্ব প্রণালী অনুসারে ক্ষেত্রে রোপণ করিয়া থাকে, এই নিয়মে তিন চারি বৎসর ওল রাখিতে পারিলে তাহা অতি বৃহৎ হইয়া উঠে। মৃত্তিকার দোষে অনেক স্থলের ওলে মুখ ধরিয়া থাকে। আর্দ্র কিম্বা ছায়া যুক্ত স্থানে ওল পুঁতিলে সেই ওলে ঐ দোষ ঘটে। এজন্য উত্তম রৌদ্র লাগে এরূপ স্থানে নীরস মৃত্তিকায় ওল পুঁতিলে তাহা অতি উত্তম হইয়া থাকে। যে সকল ওলে মুখ ধরিয়া থাকে, সেই সকল ওল তেঁতুল পাতা অথবা কলার পাতার ডাঁটা সহিত সিদ্ধ করিয়া তরকারী করিলে মুখ ধরার আশঙ্কা থাকে না। ওল রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া নীরস হইলে তদ্বারা তরকারী রন্ধন করাও মন্দ নহে।